গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

THE RENAISSANCE TO MILITANT NATIONALISM IN INDIA

SOCIALISM, DEMOCRACY AND NATIONALISM IN INDIA

THE WESTERN IMPACT ON INDIAN POLITICS (1885-1919)

SOCIALISM AND COMMUNISM IN INDIA

স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন

শঙ্কর ঘোষ

সা হি ত্য স ং স দ্
কলিকাতা ৯

প্রকাশকের নিবেদন

'বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে'। শাসনক্ষমতা এল ইংরেজের হাতে; ভারত স্বাধীনতা হারাল।

স্বাধীনতা কেবল শাসনব্যবস্থার কোন রূপভেদ নয়, জীবন-যাপনের পথও বটে। স্বাধীনতায় প্রকাশ পায় জাতীয় চরিত্র।

সে সময়ে আমাদের জাতীয় চরিত্রে জমেছিল আবর্জনা, চিন্তায় ছিল দৈন্য, সমাজ ছিল স্থাণু।

এদেশে ইংরেজের আগমনে পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয়ের সুযোগ ঘটল। রাজা রামমোহনের মত যুগন্ধরের আবির্ভাব হল। 'জাতির জনক'-রূপে প্রকৃত অর্থেই তিনি আখ্যাত হয়েছেন। ডিরোজিওর চিন্তার বলিষ্ঠতা ও ইংরেজি শিক্ষার প্রসার দেশবাসীর কাছে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান এনে দিল। মানসিক জড়তা-মুক্তির পর্ব শুরু হল।

এরপর স্বাধীনতা সংগ্রাম দুটি ধারায় প্রবাহিত হতে দেখা গেল। এক, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রমুখের নেতৃত্বে ধর্মীয় সংস্কার ও মানবিক ধর্মের বিকাশ। অন্য ধারাটি রাজনৈতিক আন্দোলন, যার প্রথম পর্বের নেতৃত্বে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ, তিলক প্রমুখেরা।

রাজনৈতিক আন্দোলনও বিভিন্ন খাতে বয়ে চলল। আন্দোলনে এলেন অরবিন্দ ঘোষ এবং পরে যাঁরা বিপ্লবী বলে চিহ্নিত হলেন তাঁরা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হ'ল। গান্ধীজীর অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন, সত্যাগ্রহ ও 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামের এক দিশারি। অন্য দিশারি সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ।

স্বাধীনতা অর্জনের সন্ধিক্ষণ। ভারত স্বাধীন হল এবং জিন্না-প্রার্থিত পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান সৃষ্টি হল। সাম্প্রতিক কালে পূর্ব পাকিস্তান রূপান্তরিত হল স্বাধীন বাংলা দেশ-এ।

ভারত তার শাসনব্যবস্থার লক্ষ্যরূপে স্থির করেছে সমাজতন্ত্র। এদেশের পূর্বতন আর্থিক পটভূমি থেকে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছে। বর্তমানকালে চলছে তার রূপায়ণ। সমগ্র ভারতবাসীর দৃষ্টি সমাজতন্ত্রের বাস্তবায়ণের ওপর আবদ্ধ কারণ দেশবাসীর ধারণায় দারিদ্র্যমুক্ত সুন্দর জীবনযাপনের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়। উপরিউক্ত বিভিন্ন মতবাদ ও আন্দোলনের ধারাবাহিক আলোচনা রয়েছে এই গ্রন্থে।

বর্তমান গ্রন্থের লেখক ডক্‌টর শঙ্কর ঘোষের পরিচয় কারো অবিদিত নয়। ইংরেজি ভাষায় রাজনীতি ও ইতিহাস বিষয়ক কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করে ইতিমধ্যেই তিনি দেশে ও বিদেশে বিদগ্ধ সমাজে প্রশংসিত হয়েছেন। শুধু তত্ত্বগত আলোচনাতেই তিনি তাঁর উদ্যোগ সীমাবদ্ধ রাখেন নি। দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তর সাধনের সংগ্রামেও তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন। বর্তমানে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা মন্ত্রী।

ডক্টর শঙ্কর ঘোষের বাঙলা ভাষায় লেখা এই বইটি পাঠক সাধারণের কাছে আদৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

ভূমিকা

ভারতে জাতীয়তাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ও আন্দোলনের যে ক্রমবিকাশ ঘটেছে তারই এক ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার সংবদ্ধ কাহিনী রচনার প্রয়াস এই বইটি। আর এই কাহিনী রচনা করা হয়েছে পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে।

একদিকে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং অন্যদিকে ভারতীয় মানসে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক চিন্তাধারার প্রভাব—এই দুই পরস্পর-বিরোধী ধারা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারাকে আবর্তিত করেছে। পশ্চিমের মানুষ যে ধূর্ত বণিক এবং উদ্ধত শাসকের বেশে এসেছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলন, আবার অন্যদিকে পাশ্চাত্য দেশ থেকে আধুনিক চিন্তাধারা এবং সর্বমানবের ন্যায়বিচারের দাবীসম্বলিত যে দর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান এসেছিল তার প্রতি আকর্ষণ—এই দুই বিপরীতধর্ম আন্দোলন ও চিন্তা ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে ভারতের প্রথম যোগসূত্র ঘটাতে যাঁরা পথিকৃৎ, যথা, রামমোহন ও ডিরোজিও, তাঁদের নাম আজ সর্বজনশ্রদ্ধেয়। ডিরোজিও ভারতের বদ্ধ সমাজে যতটা না প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশী করেছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন ছিলেন আত্মস্থ পুরুষ এবং আধুনিক ভারতের প্রথম মহামানব। রামমোহন যখন একের পর এক বদ্ধ জানালা খুলে পশ্চিমের আলো আমাদের দেশে এনে দিয়েছিলেন তখন ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাঁর বিশ্বাস ছিল অবিচল। রামমোহন ছিলেন পুরোপুরি ভারতীয়, তাই পাশ্চাত্যের চিন্তাকে তিনি শুধুমাত্র অনুকরণ বা কেবলমাত্র বর্জন করতে বলেন নি, তিনি সমন্বয়ের পথই বেছে নিয়েছিলেন।

পরবর্তী যুগে ভারতীয় দর্শন এবং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও বর্তমান জগতের বিভিন্ন ধারার প্রতিফলন ঘটেছিল অন্য একটি আশ্চর্য পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে। বিবেকানন্দ ছিলেন অবিসংবাদিতভাবে ভারতীয়। তাঁর ভাবমূর্তি দেশীয় চিন্তা ও মূল্যাদর্শে গড়ে উঠেছিল এবং সেই কারণেই তিনি যখন সংস্কার ও পরিবর্তনের কথা দেশবাসীকে বললেন তখন তা দেশবাসীর মনে বিশেষভাবে সাড়া জাগিয়েছিল।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য শিক্ষিত ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার ফলশ্রুতি হিসেবে রাজনৈতিক চিন্তায় জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের, সামাজিক চিন্তায় ধর্মনিরপেক্ষতার এবং অর্থনৈতিক চিন্তায় সমাজতন্ত্রের আন্দোলনের সৃষ্টি হয়।

গোড়ার দিকে ভারতে রাজনৈতিক চিন্তার দুটি প্রধান ধারা ছিল; তার একটি ছিল সংবিধানবাদী উদারনৈতিক এবং অন্যটি ছিল চরমপন্থী জঙ্গী জাতীয়তাবাদী। নরমপন্থী বা সাংবিধানিকরা ব্রিটিশ উদারনৈতিক চিন্তাধারা এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা তদানীন্তন প্রশাসনকে আরও ভারতীয় ও গণতান্ত্রিক করতে চেয়েছিলেন ক্রমানুয়িক সাংবিধানিক পদ্ধতিতে। তাঁরা বিবর্তনে বিশ্বাস করতেন। বস্তুতঃ, বিপ্লবী ম্যাট্‌সিনির চেয়ে বাস্তববাদী কাভুরের প্রতিই তাঁদের আকর্ষণ ছিল বেশী। তাঁরা বার্কের ফরাসী বিপ্লবের সমালোচনায় আশ্বস্ত বোধ করতেন---ব্যাস্টিলের পতনের ইতিহাস তাঁদের কাছে প্রশংসার চেয়ে ভয়াবহতার প্রতীক হিসেবেই প্রতিভাত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তাঁরাই কিন্তু গোড়ার দিকে ভারতীয়দের ভেতর রাজনৈতিক চেতনা, ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবোধ এবং অর্থনৈতিক চিন্তাধারা জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই নরম ধীরগতি রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব এবং তাঁর ঘোষণা যে জাতীয় কংগ্রেসের মৃত্যুকাল আসন্ন এবং তার সম্পূর্ণ বিলোপ-সাধনই তাঁর অভিলাষ---এর প্রতিবাদে এবং প্রতিক্রিয়া হিসেবে জন্ম নেয় চরমপন্থীরা, যাঁরা ব্রিটিশ শাসন বা ব্রিটিশ চিন্তাধারা কোনটাকেই বরদাস্ত করতে রাজী ছিলেন না। চরমপন্থীরা ভারতীয় সংস্কৃতির নিজস্ব উৎসধারায় ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। তাঁরা আশ্বাস পেয়েছিলেন সিন্ ফিন্ আন্দোলন থেকে। সিন্ ফিন্ কথাটির মোটামুটি অর্থ হলো 'আমরা আমাদের'। সিন্ ফিনের এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা চেয়েছিলেন আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি বন্ধ করে স্বরাজের জন্য বয়কট এবং বিদেশী বর্জনের নীতি প্রবর্তন করতে। এই পরিপ্রেক্ষিতে চরমপন্থী রাজনীতির প্রবক্তাদের, যেমন বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন পাল, লাজপত রায় প্রমুখের চিন্তা ও দর্শন এখানে আলোচিত হয়েছে, তেমনি আলোচিত হয়েছে সাংবিধানিক ধারার গঠনশীল প্রবক্তাদের কথা, যেমন দাদাভাই নৌরজী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রমুখের চিন্তাধারা ও কর্মসূচী।

আবার এই চরমপন্থীদের বিদেশী বর্জন এবং সিন্ ফিন্-ধাঁচের আন্দোলনও কিন্তু সন্ত্রাসবাদী বা বিপ্লবীদের সন্তুষ্ট করতে পারে নি। বিপ্লবীরা অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন রুশ সন্ত্রাসবাদীদের কাছ থেকে, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস থেকে, আর 'আনন্দমঠ' উপন্যাস থেকে। তাঁদের হাতিয়ার ছিল বোমা আর বারুদ।

পরবর্তী কালে, ১৯১৯ সালের পর থেকে, ভারতীয় রাজনৈতিক

জগতে বিশেষ করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। গান্ধী নরমপন্থী গোখলেকে তাঁর রাজনৈতিক গুরু বলে আখ্যা দিয়েছিলেন, কিন্তু গান্ধীর সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে নরমপন্থীদের ক্রমানুয়িক সাংবিধানিক পদ্ধতির অমিল ছিল মৌলিক। গান্ধীর আন্দোলনের পদ্ধতি, যা দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে এক বিরাট পরিবর্তন আনে, তা গোখলের সাংবিধানিকতা আর তিলকের চরমপন্থা—এই উভয় থেকেই ছিল পৃথক ও ভিন্ন। গান্ধীর সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য ও 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলন এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন, আর এই সমুদয়ের ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর যে অবদান ছিল তা এখানে আলোচিত হয়েছে।

চরমপন্থী আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এবং পরবর্তী কালে গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন, এই সমস্তের ভেতরই রাজনীতি ও ধর্মচেতনার সংমিশ্রণ ঘটেছিল যদিও খুবই বিভিন্ন ভাবে। চরমপন্থী আন্দোলনের ভেতর ছিল তিলকের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ, অরবিন্দের যোগসাধনা, বিপিন পালের দর্শন ও স্বাজাত্যবোধ। সন্ত্রাসবাদীরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন একদিকে যেমন, ম্যাট্‌সিনির ও গ্যারিবল্ডির জীবনী থেকে আবার অন্যদিকে গীতা, উপনিষদ্‌ এবং 'আনন্দমঠ'-এর মতো দর্শন ও সাহিত্য থেকে। পরবর্তী কালে গান্ধীর আন্দোলনে সব সময়েই একটা চারিত্রিক নীতিবোধের আবেদন ছিল যা অনেকটা ধর্মীয় প্রসঙ্গের স্মারক। 'সত্যাগ্রহ' শব্দের মধ্যেই সেই ব্যঞ্জনা ছিল।

স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পূর্বে যে দুটি আন্দোলন প্রচণ্ডভাবে ভারতীয় জনচিত্তকে নাড়া দিয়েছিল তা হল গান্ধীর 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলন ও সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিযান। ১৯৪২ সালের গান্ধীর 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলন, তাঁর ১৯১৯-২০ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং ১৯৩০-৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের চেয়ে ছিল অনেক বেশী ব্যাপক ও গণভিত্তিক। আর প্রায় এই 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের সময়েই, আন্তর্জাতিক ইতিহাসের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণ, সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে সংগ্রামের অবকাশ এসেছিল সুভাষচন্দ্রের। সুভাষচন্দ্রের পরিচালিত সশস্ত্র আজাদ্‌ হিন্দ্‌ বাহিনীর অভিযান জনসাধারণের মনে এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

স্বাধীনতালাভের পর দেশে কেবলমাত্র সংসদীয় গণতন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত হয় নি, এক লিখিত সংবিধানের মধ্যে জনগণের নানাবিধ মৌলিক অধিকার সন্দেহাতীতভাবে তালিকাবদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তার সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের আদর্শের দ্বন্দ্ব, যা জওহরলাল নেহেরু পঞ্চদশ দশকেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, সেই প্রশ্নটি পরবর্তী কালে এক জাতীয় তর্কের সৃষ্টি করে। অবশেষে প্রায় দুই দশক পরে ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানোর ব্যাপারে সংবিধানের মৌলিক অধিকার-সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারাগুলির নানাবিধ সংশোধন করা হয়।

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের আদি পর্যায়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভই ছিল মুখ্য লক্ষ্য, কিন্তু পরবর্তী কালে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদীদের চিন্তায় স্বাধীনতা সংগ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গুরুত্ব পেতে থাকে। এই সময়ে শ্রেণী সংগ্রামের প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় এবং গান্ধীর অছিতত্ত্ব ও শ্রেণী সহায়তার দর্শনের সমালোচনা শুরু হয়। এই সমালোচকদের ভেতর এক সময় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। মানবেন্দ্রনাথের এই সমালোচনা, তাঁর মার্ক্সবাদী চিন্তা-ভাবনা এবং পরবর্তী কালে তাঁর র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম্ এবং পরিশেষে তাঁর নব মানবিকতাবাদ-- এই সমস্তই এখানে আলোচিত হয়েছে।

গান্ধীর অছিবাদ, রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং অহিংস বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বোদয় সমাজ গঠনের কথা যেমন আলোচনা করেছি, তেমনিই করেছি নেহেরুর বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ, তাঁর ওপর গান্ধীবাদ ও মার্ক্সবাদের ভিন্নমুখী প্রভাব, ফ্যাসীবাদের সম্বন্ধে তাঁর মতামত এবং এই ব্যাপারে সুভাষ বসুর সঙ্গে কিছু কিছু বিষয়ে তাঁর মতানৈক্যও। সমাজতন্ত্রের দিকে গান্ধীর আকর্ষণ ছিল মানবিকতাবোধ থেকে ; নেহেরু কিন্তু তাঁর সমাজতন্ত্রকে বলতেন বৈজ্ঞানিক। তিনি একদিকে যেমন পাশ্চাত্য উদারনৈতিক চিন্তাধারা ও গান্ধীবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, আবার অন্যদিকে মার্ক্সবাদীদের কয়েকটি দিকও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। নেহেরু সহিংস বিপ্লবের পথ পরিহার করতে বিশেষভাবে বলেছিলেন এবং তাঁর ক্ষমতাসীন যুগে সমাজতন্ত্রের আদর্শের সঙ্গে গণতন্ত্রের পদ্ধতিকে সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন।

ভারতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাস বিচিত্র। বিশের দশকের আগে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ভারতে প্রায় ছিলই না। এই সময়ের আগে যদিও দাদাভাই নৌরজী সোশ্যালিস্ট হিণ্ডম্যানের মাধ্যমে এই চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসেছিলেন, তিনি তা দ্বারা প্রভাবিত হন নি ; তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিপিন পাল ও লালা লাজপত রায় এই চিন্তাধারা দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে, বিশেষ করে তিরিশের দশকে, জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসু দ্ব্যর্থহীনভাবে নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে ঘোষণা করেন, এবং জাতীয় কংগ্রেসের ভেতর কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল গড়ে ওঠে আর তার বাইরে কমিউনিস্ট দল বিপ্লব, শ্রেণী সংগ্রাম ও সাম্যবাদের কথা বলতে শুরু করে। সমাজতান্ত্রিক ইতিহাসের এই ক্রমবিকাশ এখানে আলোচনা করেছি।

১৯৩৬ সালে নেহেরুর সমাজতান্ত্রিক মতামত কংগ্রেসের মধ্যে এক সংকটের সৃষ্টি করেছিল ; অবশ্য তাতে কোনও ভাঙন ধরেনি। এই ভাঙন ধরল এসে ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে। নেহেরু-উত্তর যুগের কংগ্রেসের এই আভ্যন্তরীণ সংকট, ব্যাঙ্কজাতীয়করণ ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রশ্নে যে শক্তির দ্বিকেন্দ্রীভবন হয় এবং অবশেষে কংগ্রেস যে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়, এখানে এসবই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বামপন্থী আদর্শ ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ধীরে ধীরে বিস্তারলাভ করতে থাকে। শ্রমিকশ্রেণীর এই সচেতনতা ভারতীয় সমাজতন্ত্রের ওপর কিভাবে প্রভাব ফেলেছে সে কথাও আলোচিত হয়েছে।

একথা ঠিক যে ভারতীয় সমাজবাদীদের ভেতর অনেকে সমাজ-তন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে স্বীকার করেছেন এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠায় সহিংস গণ-অভ্যুত্থান যে অবশ্যম্ভাবী একথা মনে করেন নি। কিন্তু ভারতীয় সমাজবাদীরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে বিভক্ত এবং শ্রেণী সংগ্রাম, গণতন্ত্র, গান্ধীবাদ এবং মার্ক্সবাদী কমিউনিজমের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর যথেষ্ট পার্থক্য ছিল এবং আছে।

ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসও বিচার করার চেষ্টা করেছি—যেমন স্বাধীনতার পূর্বেকার যুগ, স্বাধীনতার পরে তেলেঙ্গনা আন্দোলনের কাল, অন্ধ্র কমিউনিস্টদের মাওবাদী 'নয়া গণতন্ত্র' প্রচারের সময় এবং তারপর সংসদীয় ও অসংসদীয় উভয় পদ্ধতির সংমিশ্রণের ভিত্তিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আর অবশেষে ১৯৬৪ সালের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিধা-বিভক্তি।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের পথ নির্ধারণের ব্যাপারে চিরকালই দুটি ধারা কাজ করেছে : একটি হল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, অন্যটি ধনতন্ত্রের বিরোধিতা। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীতার দিক থেকে চারটি শ্রেণী, যথা, শিল্প-শ্রমিক, কৃষক, পেটি বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়া এদের সংহতি খোঁজা হয়েছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তার সাহায্যকারী, সামন্ততন্ত্র ও একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য। আর ধনতন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামে তিনটি শ্রেণী, যথা, শিল্প-শ্রমিক, কৃষক ও পেটি বুর্জোয়া, এদের সংহতির কথা বলা হয়েছে। অবশ্য জন-গণতন্ত্র বা নয়া গণতন্ত্র চিন্তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই দুই চিন্তাধারার ভিত্তিতে সংগ্রামের কৌশল সম্বন্ধে পার্থক্য কমে এসেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই দুই কৌশলের পারস্পরিক অগ্রাধিকার নিয়ে ভারতীয় কমিউনিস্টদের মধ্যে মতবিরোধ থেকেই যায়। শেষে চীন-ভারত-সীমান্ত সংঘর্ষ ও চীন-সোবিয়েত আদর্শগত বিরোধ পূবেকার এই জটিল মতবিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে একটি সংকট সৃষ্টি করে এবং পরিশেষে ১৯৬৪ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট দল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় এবং সি পি. আই(এম) দল প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা করতে হয়েছে সি পি আই ও সি পি. আই (এম)-এর মতাদর্শ ও কৌশলগত পার্থক্যের কথা, মার্ক্সবাদী ও মাওবাদের প্রতি তাদের পারস্পরিক মনোভাবের কথা, জাতীয় গণতন্ত্র, জনগণতন্ত্র, শোধনবাদ ও অতিবাম হঠকারিতার প্রতি তাদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর কথা। এইগুলি এবং অন্য কয়েকটি ব্যাপারে মতবিরোধ ১৯৬৭ সালে আরও একবার ভাঙন নিয়ে আসে—যখন মাওবাদীরা সি পি. আই. (এম)-এর থেকে বেরিয়ে যায়। ভারতে মাওবাদের জন্ম ১৯৪৮ সালের তেলেঙ্গনা আন্দোলনের সময় থেকে, যখন অন্ধ্র কমিউনিস্টরা মার্ক্স, এঙ্গেলস্, লেনিন এবং স্ট্যালিনের

চিন্তার সঙ্গে মাও-ৎসের নয়া গণতন্ত্রের নীতি যোগ করতে চেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে আধুনিক কালে নক্‌সালপন্থীদের মধ্যে মাওবাদের প্রভাবের কথাও আলোচিত হয়েছে।

পুরনো দিনের তর্কগুলি আজও অমীমাংসিত থেকে গেছে---বিশেষ করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রশ্ন সম্বন্ধে। ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার, সনাতনের সঙ্গে পরিবর্তনের দ্বন্দ্ব আজও সমানভাবেই চলেছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা ও সাম্য ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোন সার্থকতা আছে কি না, গান্ধীবাদ, সমাজবাদ, মার্ক্স-বাদ ও মাওবাদের মৌল সমস্যাগুলির সমাধানের সর্বোত্তম পথ কি---এই সমস্ত প্রশ্নগুলি ভারতীয় মানুষের মন ও চিন্তাকে আন্দোলিত করেছে এবং করে চলেছে। অতীতের অনেক সমস্যা অমীমাংসিত থাকলেও সেগুলির অনুধ্যান থেকে যে উপলব্ধি জন্মায় তা বর্তমানকে পরিবর্তিত করার কাজে সহায়ক ও অপরিহার্য।

ভারতের গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলন আজ যে সব মৌলিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ও সামাজিক প্রশ্নগুলি সামনে নিয়ে এসেছে সেইগুলির গুরুত্ব অপরিসীম লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে। কিন্তু প্রায়ই দেখা গেছে যে এই সব চিন্তা ও চিন্তানায়কদের কথা বলতে গিয়ে অনেকেই হয় কেবলমাত্র স্তুতি করেছেন অথবা অবিমিশ্র নিন্দা করেছেন। এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে নিস্পৃহ সমালোচনা সম্পূর্ণ সম্ভব না-ও হতে পারে, এমন কি কেউ কেউ বলবেন যে পুরোপুরি বাঞ্ছনীয়ও না, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সমস্ত প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন আন্দোলনের সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার এবং যথাযথভাবে আলোচনার চেষ্টা করা প্রয়োজন। এই বহুমুখী এবং জটিলতাপূর্ণ ইতিহাসের কয়েকটি দিক্ নিয়ে আমার পূর্বেকার কয়েকটি বইতে* যা বলেছিলাম তা থেকে স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান আলোচনার জন্য কিছুটা সাহায্য নিয়েছি।

২-এফ, ক্যামাক স্ট্রীট,
কলকাতা-১৬
১৭ই মার্চ, ১৯৭৫

শঙ্কর ঘোষ

* Sankar Ghose : *The Renaissance to Militant Nationalism in India* ; *Socialism And Communism in India* ; *The Western Impact On Indian Politics (1885-1919)* , *Socialism, Democracy And Nationalism in India.*

সবিতাকে

সূচীপত্র

রামমোহন, মেকলে, ডিরোজিও ও ইংরেজী শিক্ষা

চিরকালই এই ভারত নানা জাতি ও নানা সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্র। ব্রিটিশদের আসবার আগে ভারতে পশ্চিম এশিয়ার ঐশ্লামিক সংস্কৃতি ও প্রাচ্য সংস্কৃতি সম্মিলিত ও সমন্বিত হচ্ছিল। দূর পশ্চিম থেকে ব্রিটিশদের আগমনে ভারতের সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন প্রবলভাবে প্রভাবিত হল।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব ভারতের অন্তর্নিহিত উদারনৈতিক চেতনাকে প্রজ্বলিত করেছিল। ভারতীয় উদারনীতিবাদের প্রথম প্রদীপ প্রজ্বলিত করেন রাজা রামমোহন রায়। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের মানুষ যখন প্রথম সংবিধানের অধিকারী হল সেই উপলক্ষে রামমোহন কলকাতায় এক ভোজসভার আয়োজন করেন। ইউরোপযাত্রী রামমোহন পথে এক বন্দরে ফরাসী জাহাজে বিপ্লবী পতাকা উড়তে দেখে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার প্রচারক ফরাসী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ঐ জাহাজে যাওয়ার বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

কিছু ঐতিহাসিক বলেছেন যে পাশ্চাত্যের ছোঁয়াচ ভারতকে আধুনিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েছে এবং পাশ্চাত্যের বিদ্রোহী সাহিত্য ভারতীয়-দের রাজনৈতিক মুক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছে। একথা সত্য যে মিল, ব্রাইট ও গ্ল্যাডস্টোনের সংসদীয় চিন্তাধারা গোড়ার দিকে ভারতীয় রাজ-নীতিবিদ্‌দের প্রভাবিত করেছিল। এটাও অবিসংবাদিত সত্য যে ব্রিটিশ প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভিত্তিতেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে। যা হোক, ব্রিটিশ শাসনকালে পাশ্চাত্যের প্রভাব ভারতের উপর বিশেষভাবে পড়ে এবং ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলেও সে প্রভাব সম্পূর্ণ মুছে যায় নি।

স্বাধীনতা অর্জনের এক বছরের কিছু পরে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে গণপরিষদে এক ইংরেজী ভাষণে জওহরলাল নেহরু বলেন, "এই সভা জানে যে গত শতাব্দীতে এবং তারও আগে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে এই দেশের অবশ্যম্ভাবী অনেক রকমের সংযোগ গড়ে উঠেছে আর আমরা সারা জীবন ধরে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য সংগ্রাম করে এসেছি। এই সব সম্পর্কের মধ্যে অনেকগুলি খারাপ দিক ছিল, কিছু হয়তো ভাল দিকও ছিল এবং এমন কিছু ছিল যা ভালয়-মন্দয় মেশানো এবং যা এখনও আমাদের মধ্যে রয়েছে। এই মহতী সভায় এই যে ইংরেজী ভাষায় আমি কথা বলছি এই-ই প্রমাণ করে যে এ-সব সম্পর্কের আমি এক নির্ভেজাল দৃষ্টান্ত। সন্দেহ নেই যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা ঐ ভাষার পরিবর্তন ঘটাতে চলেছি এবং কার্যত আমি ও যাঁরা এখানে বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগ সদস্যই এর পরিবর্তন-সাধনে সচেষ্ট হবেন। এই সভা পরিচালনার জন্য ব্রিটিশ সংবিধানের ছাঁচে তৈরি কিছু নিয়মকানুন আমরা মেনে নিয়েছি। ইদানীন্তন কালে যে সব সংবিধানের ধারা প্রচলিত তার অধিকাংশই ব্রিটিশের তৈরি। তার

মধ্যেকার ভালগুলি আমরা গ্রহণ করে নেব, যেগুলি দেখব ভাল নয় তা পরিত্যাগ করব। এই পরিবর্তন ক্রমে ক্রমে ঘটাতে হবে। এইভাবে অগ্রসর না হয়ে যদি আমরা তাড়াতাড়ি এবং বাড়াবাড়ি কিছু করি তবে তার ফল ক্ষতিকর হবে।"[১]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ পর্যন্ত শিক্ষিত ভারতীয়দের কাছে পাশ্চাত্য সভ্যতার এক দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল। এই সময়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা শিক্ষিত ভারতীয়দের কিভাবে প্রভাবিত করেছিল তার সুন্দর বর্ণনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে। এই সময়ে, যখন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যুবক, তখন শিক্ষিত ভারতীয়দের পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে এক রোমান্টিক ধারণা ছিল। তারা ফরাসী বিপ্লবের শেষ আলোর ছটায় উদ্ভাসিত পাশ্চাত্য সভ্যতার ছবিটি দেখে খুবই উৎসাহিত হয়েছিলেন। এই সময় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যারা নিষ্পেষিত, যারা দুর্ভাগ্য-তাড়িত তাদের সপক্ষে দাঁড়াতে পাশ্চাত্য তার তরুণ সৈনিকদের দীক্ষিত করেছে দেখে আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে দুনিয়ার সর্বজাতির জাগৃতির জন্য পাশ্চাত্য সভ্যতার এক বিশেষ প্রবণতা আছে। এ কথা সত্য যে আমাদের দেশে পশ্চিমের মানুষ ধূর্ত বণিকের বেশেই এসেছিল, তবু স্বীকার করতে হবে তারাই আবার আমাদের এমন এক সাহিত্য-সম্ভার দিয়েছে, যে সাহিত্যে সর্বমানবের ন্যায়-বিচারের দাবি উচ্চারিত হয়েছে।"

রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন তাঁর যৌবনকালে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়রা কেমনভাবে বার্কের বাগ্মিতা ও মেকলের ভাষা-প্রবাহের তরঙ্গভঙ্গি নিয়ে দিনরাত মুখরিত হয়ে থাকত, কেমন করে তারা শেকসপীয়ারের নাটক ও বায়রনের কাব্য নিয়ে নিয়ত আলোচনা চালাত এবং কেমন করে উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ জাতির রাষ্ট্রনীতির উদার-নৈতিকতা থেকে তারা অনুপ্রেরণা পেয়েছিল। তারা এমনও বিশ্বাস করেছিল যে এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে।[২] কিন্তু পাশ্চাত্য সম্পর্কে এই মনোমুগ্ধকর ধারণা বেশিদিন টিকল না। শাসিতের প্রতি তাদের দুর্ব্যবহারের দরুন রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে পশ্চিমী জাতিগুলির উপর তাঁর পূর্বেকার সব আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। 'সভ্যতার সংকট' রচনায় পাশ্চাত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই নৈরাশ্যের কথা জানিয়েছেন। পাশ্চাত্যের দর্পিত সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।"[৩]

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনাতে শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যমণিরা জোর দিয়ে বললেন যে প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য যেমন করে ইউরোপে, বিশেষ করে গলে ও স্পেনে, তাদের নৈতিকতা ও সভ্যতা বিস্তারের কর্তব্য সম্পাদন করেছিল, সেই রকমভাবে এশিয়ার ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব পালন করবে ইংরেজরা। তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের অতীত সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাই তাঁদের মতে ব্রিটিশ শাসনের লক্ষ্য হবে ভারতীয়দের পুরোপুরি ইংরেজীভাবাপন্ন করে তোলা। তাঁদের ইচ্ছা ছিল সাম্রাজ্যবাদী

রাম যেমন করে গল ও স্পেনকে প্রভাবিত করেছিল ভারতীয়দের সেই-ভাবে ইংরেজরা কৃষ্ণকায় ইংরেজ করে তুলবে।

ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান ছিল টমাস ব্যাবিংটন মেকলের। মেকলের লক্ষ্য ছিল যে এমন এক শ্রেণী গড়তে হবে যারা কেবল রক্তে আর গাত্রবর্ণে হবে ভারতীয়, কিন্তু রুচিতে ও ধ্যান-ধারণায় হবে পাকা ইংরেজ। মেকলের গভীর আশা ছিল যে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হলে হিন্দুধর্মের ধ্বংস হবে এবং দলে দলে লোক খ্রীষ্ট-ধর্মান্তরিত হবে। তাঁর পিতার কাছে এক পত্রে মেকলে লিখেছিলেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে যদি আমাদের শিক্ষা-পরিকল্পনা কার্যকর হয় তবে তিরিশ বছর পরে বাঙলার শিক্ষিত শ্রেণীতে একজনও পৌত্তলিক থাকবে না। এবং তার জন্য ধর্মান্তরণের প্রচেষ্টার দরকার হবে না, ধর্মাচরণের স্বাধীনতাতেও হস্তক্ষেপ করতে হবে না, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পথে স্বাভাবিকভাবেই এ পরিবর্তন ঘটে যাবে।"[৪] জনশিক্ষা প্রসার কমিটির সভাপতি মেকলে এবং তাঁর আত্মীয় ও ঐ কমিটির অন্যতম সদস্য স্যার চার্লস্ ট্রেভেলিয়নও বিশ্বাস করতেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন হলে "হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের ভিত নড়ে যাবে এবং আমাদের ভাষা ও শিক্ষা-ধারা দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে যাবে এবং অবশেষে ভারতে আমাদের ধর্মের পত্তন হবে।"[৫]

ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের যোগসূত্রের সূচনা যেভাবে হয়েছে তা দুর্ভাগ্য-জনক এবং তার দরুন তিক্ততা ও সংঘর্ষ বেড়েছে। তবে বিজ্ঞান ও শিল্প-সমৃদ্ধ পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতের মিলনের আরেকটা দিকও আছে। বিজ্ঞান পাশ্চাত্যের মহান্ দান, বিজ্ঞান উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে ও ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে অন্ন যুগিয়েছে। ইউরোপ বিজ্ঞানের দীপশিখা নিয়ে ভারতে পদার্পণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে আমাদের উচিত সেই দীপশিখার সাহায্যে আমাদের প্রদীপটিকে জ্বালিয়ে নেওয়া।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা মানব-সভ্যতায় বিপ্লব ঘটিয়েছে, আধুনিক সমাজে এনেছে যুগান্তর, তাই আধুনিক ভারত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যাকে স্বাগত জানিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও জওহরলালের মতো ভারতের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নেতারা বিজ্ঞানকে স্বাগত জানিয়েছেন কেবল এই কারণে নয় যে বিজ্ঞান বাস্তবানুগ প্রয়োজনানুযায়ী চেতনা সঞ্চার করতে পেরেছে। তাঁরা বিজ্ঞানকে স্বাগত জানিয়েছেন বিশেষ করে এই কারণেও যে বিজ্ঞান অভাবের অর্থনীতিকে প্রাচুর্যের দাক্ষিণ্যে রূপান্তরিত করতে সক্ষম।[৬,৭]

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রচলন হয়। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে সমগ্র ভারতবর্ষের সংস্কৃতি বদলে গেল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ারের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হল হিন্দু কলেজ। কলেজের উদ্দেশ্য হল ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষায় উচ্চশ্রেণীর ভারতীয়দের বিদ্যাশিক্ষাদান ও ইউরোপের সাহিত্য ও বিজ্ঞানের জ্ঞান বিতরণ। এক বছর পর কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড নামে তিন উৎসাহী ধর্মপ্রচারক খ্রীষ্ট-ধর্মের প্রচারের জন্য শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে

আলেকজাণ্ডার ডাফ আর একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সব বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অচিরে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বস্তুতপক্ষে রামমোহন রায় প্রমুখ কয়েকজনের প্রচেষ্টায় ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে জনশিক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই কমিটির সভাপতি হন মেকলে এবং গভর্নর জেনারেলের কাছে পেশ-করা তাঁর শিক্ষা-সম্পর্কিত বক্তব্য নিঃসন্দেহে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় বিজ্ঞান শিক্ষাদানের পথ প্রশস্ত করে।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এই মর্মে একটি সরকারী ঘোষণায় বলা হয় যে সেই বছর থেকে যাঁরা একটি বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন তাঁদের জন্য লাভজনক চাকরির পথ উন্মুক্ত থাকবে। এই পরীক্ষায় পাশ করার জন্য বেকন, জনসন, মিলটন, শেকস্‌পীয়ার প্রমুখের রচনার খুঁটিনাটি জানা প্রয়োজন ছিল। এই অবস্থায় ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে একটি আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই শিক্ষা-আন্দোলনের সঙ্গে সমান পদক্ষেপে ইংরেজী ধাঁচে পত্রিকা ও সংঘগুলিও গড়ে উঠতে লাগল। এই আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসেবে হিন্দু কলেজের দুই ছাত্র ডিরোজিও-র শিষ্য দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রকাশ করলেন 'জ্ঞানান্বেষণ'।

ইংরেজী শিক্ষা ও আদর্শ প্রসারের ক্ষেত্রে এবং হিন্দু কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার জন্য ডিরোজিও (১৮০৮—৩১) সুপরিচিত। সমসাময়িক কালের ইতিহাসে তিনিই প্রথম ইঙ্গ-ভারতীয় যিনি একটা স্থায়ী ও গৌরবোজ্জ্বল আসন অধিকার করে আছেন। ডিরোজিও পর্তুগীজ ও ভারতীয় পিতামাতার সন্তান। যেহেতু তিনি ইঙ্গ-ভারতীয়, তাই সর্বোচ্চ সরকারী চাকরি-প্রাপ্তির পথ তাঁর জন্য খোলা ছিল না। কিন্তু ডিরোজিও খুবই মেধাবী ছিলেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সেই গঙ্গাতীরে বসে কাব্য রচনা করে কলকাতায় তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।[৮] যখন তাঁর বয়স ১৯-এর মতো তখন তিনি বিখ্যাত হিন্দু কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। এখানে ডিরোজিও তাঁর যোগ্য পদে বৃত হন ও তাঁর প্রতিভার বিকাশের সুযোগ পান। কলকাতার তরুণদের মধ্যে তিনি ইউরোপের জ্ঞান বিতরণে অগ্রণী হন এবং এর ফলে তিনি একটি আলোড়নের সৃষ্টি করেন। মাত্র ২২ বছর বয়সে অকালে ডিরোজিও মারা যান। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহলে পরিবর্তনের রীতিমতো ঝড় তুলে দিয়েছিলেন। তাঁর ছাত্রবৃন্দের মধ্যে তৎকালীন নব্যবঙ্গের বিখ্যাত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন।

ডিরোজিওর প্রভাব শুধু হিন্দু কলেজের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তার প্রভাব আরও বেশী করে অনুভূত হত শিক্ষিতদের সমাজে ও তাঁর নিজের গড়া আলোচনাচক্রে। কি ক্লাসে, কি আলোচনাচক্রে সর্বত্রই ডিরোজিও ধর্ম, পৌত্তলিকতা, স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বাধীনতা-সম্পর্কে তাঁর অভিনব ও বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারার কথা বলতেন। ডিরোজিওর প্রভাব এমনভাবে পড়ছিল যে প্রাচীন গ্রীসের সক্রেটিসের মতো তাঁকে লোকে এই বলে অভিযুক্ত করেছিল যে তিনি তরুণ মনকে দুর্নীতিপরায়ণ করে তুলছেন। অভিযোগের মাত্রা এতদূর পৌঁছেছিল যে গোঁড়া হিন্দু

অভিভাবকেরা একজোট হয়ে ডিরোজিওর অপসারণ দাবি করেন। হিন্দু কলেজের পরিচালকমণ্ডলী অবশেষে গোঁড়া অভিভাবকদের ইচ্ছার কাছে মাথা নত করেন। পরিচালকমণ্ডলী ডিরোজিওকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, "জনমতের দাবিকে মেনে নেওয়া বিশেষ জরুরী মনে করায় ন্যায়বিচারের অনুসন্ধান করার দায়িত্ব আমাদের ছিল না।"

ডিরোজিওর বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ ছিল যে তিনি নাস্তিক এবং তাঁর শিক্ষায় ছাত্রদের মধ্যে বিদ্রোহাত্মক ও অধার্মিক মনোবৃত্তির সৃষ্টি হচ্ছে। আত্মপক্ষ সমর্থন করে ডিরোজিও একটি বিখ্যাত চিঠিতে লেখেন, "কেউ বলতে পারবেন না যে আমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছি। ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করা যদি অন্যায় হয়, তবে আমি অপরাধী। তবে আমি ভীতও নই এবং স্বীকার করতে লজ্জিতও নই যে এই বিষয়ে দার্শনিকদের সন্দেহের সঙ্গে আমি ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছি এবং সেই সঙ্গে তার সমাধানের কথাও বলেছি। এই সব তর্কবিচার কি নিষিদ্ধ? যদি তাই হয় তবে কোনো এক পক্ষকে সমর্থন জানানোও নিশ্চয়ই অনুচিত ···এবং এই বিষয়ে লর্ড বেকনের মতো একজন গোঁড়া পণ্ডিতের বক্তব্য উপস্থাপিত করতে চাই। লর্ড বেকন বলেছেন, 'কেউ যদি তর্কাতীত ধারণা নিয়ে শুরু করেন তবু তাঁকে অবশেষে সন্দেহের বশবর্তী হতেই হবে।' এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি ভেবে দেখলাম যে কলেজের কিছু ছাত্রকে হিউম-রচিত ক্লিনথেম ও ফিলোর বিখ্যাত কথোপ-কথন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখা কর্তব্য। এই কথোপকথনের মধ্যেই রীতিমতো শাণিত যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। একই সঙ্গে আমি ডঃ রীড ও স্টুয়ার্টের প্রতিযুক্তির সঙ্গেও ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। হিউমের যুক্তির এত সুন্দর ও বলিষ্ঠ প্রতিবাদ আজ পর্যন্ত হয় নি। এই তো আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের মূলগত কারণ। এই শিক্ষার ফলে ছাত্রদের ধর্মবিষয়ক গোঁড়ামির মূল যদি নড়ে গিয়ে থাকে তার জন্য আমার দোষ নেই। ছাত্রদের মধ্য কোনো নির্দিষ্ট ধারণা আমি গড়ে তুলতে চাই নি, আর সে ক্ষমতাও আমার নেই। আমার শিক্ষাপদ্ধতির ফলে যদি কেউ নাস্তিক হয়ে থাকে তবে সে নিন্দা আমার প্রাপ্য, তেমনি যদি কেউ আস্তিক হয়ে থাকে তবে তার জন্য আমি প্রশংসা দাবি করতে পারি।"

ডিরোজিওর স্বদেশপ্রেম ছিল গভীর। তখনকার ভারতবর্ষের অধঃ-পতনের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন, আবার ভারতীয় প্রাচীন মহিমার অনুসন্ধানেও তিনি তৎপর ছিলেন। আর ইংরেজী রোমান্টিক কবিদের মতো তিনিও স্বদেশের উদ্দেশ্যে কাব্যোৎসর্গ করেছিলেন।[৯]

ডিরোজিওর মতো শিক্ষাবিদ্‌, কেরীর মতো ধর্মপ্রচারক ও মেকলের মতো প্রশাসক ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে সহায়তা করেছিলেন। তবে ইংরেজী শিক্ষার প্রচার বিষয়ে মেকলের সঙ্গে রামমোহনের উদ্দেশ্যগত প্রভেদ ছিল। মেকলের লক্ষ্য ছিল স্বদেশী কৃষ্টির আবাদের উচ্ছেদ করে সেই জায়গায় বিদেশী সংস্কৃতির পত্তন করা এবং তাঁর আশা ছিল এইভাবে সমগ্র হিন্দুত্ব একদিন খ্রীষ্ট-ভজনায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

আর রামমোহন রায়ের স্বপ্ন ছিল, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য—এই দুই মত ও পথের সমন্বয় সাধন করা। ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে মেকলের প্রখ্যাত প্রতিবেদন প্রস্তুতের বহু আগে রামমোহন ভারতে ইউরোপীয় শিক্ষাধারা প্রবর্তনের আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ-ব্যাপারে সহায়তায়, পাদ্রীদের শিক্ষাকর্মে উৎসাহ দানে, কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা বিখ্যাত পত্র প্রেরণে, এবং বহুবিধ সংস্কারাত্মক কার্যাবলীর মাধ্যমে রামমোহন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শের ঐকান্তিক মিলন ঘটাতে চেয়েছিলেন।

ইংরেজী শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম পর্বে পাশ্চাত্য ভাবধারার নূতনত্বের যে চমক ও রোমান্স ছিল তা প্রায় সব-কিছু পুরাতনকেই বিলোপ করে দিতে চেয়েছিল। পাশ্চাত্য ভাবধারা ভারতীয় ছাত্রদের তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। পাশ্চাত্য দার্শনিক হিউমের চিন্তাধারা হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মনোরাজ্যে প্রবেশ করে. ফলে ছাত্রেরা প্রাচীন শাস্ত্রের গণ্ডির ভেতর আবদ্ধ থাকতে অস্বীকার করে এবং সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার দাবি জানায়।

ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আবার ইংরেজরা তাদের শক্তির, সাফল্যের ও উন্নত অবস্থার জয় ঘোষণা করতে লাগল এবং সেই সঙ্গে প্রাচ্যের সভ্যতার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎকর্ষের কথা বলল। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণই তখন ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়দের ধ্যান জ্ঞান হয়ে উঠল। ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে বুদ্ধিপ্রবণ নৈরাজ্যবাদেরও প্রতিষ্ঠা হল। আর ছাত্ররা সর্ব-ব্যাপারেই পাশ্চাত্যের জয় এবং প্রাচ্যের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠল। ভারতের প্রাচীন শিক্ষাদীক্ষাকে উপহাস করা হল এবং প্রাচীন ধর্মকে কুসংস্কারের আধার বলেই বর্ণনা করা হল।

কিন্তু কলিকাতা এবং বোম্বাই-এর প্রকাশ্য সমাবেশে ভারতীয় প্রাচীন বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে হেয় প্রতিপন্ন করলেও শিক্ষিত ভারতীয়দের ভিতরে ভিতরে একটা অস্বস্তিবোধ রয়েই গেল। ইংরেজী শিক্ষিত ছাত্রদের অন্তরাত্মার মধ্যে একটা দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব ছিল। তাই ভারতীয় ধর্মের ও ঐতিহ্যের সমালোচনার বিরুদ্ধে শীঘ্রই এক আলোড়ন শুরু হয়।

ভারতীয় জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারার বিরুদ্ধে কিছু খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের নির্বিচার অপপ্রচারের প্রতিক্রিয়া হিসেবেও ভারতীয় বৈদান্তিকতার দিকে প্রত্যাবর্তনের একটা লক্ষণ দেখা দেয়। এই অপপ্রচার এতই বীভৎস হয় যে উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে লর্ড মিন্টো (ভারতের গভর্নর জেনারেল) খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের কিছু প্রচারপত্র নিষিদ্ধ করে দেন কারণ, তাঁর মতে, "সেগুলি যুক্তিহীনভাবে শুধু অপপ্রচার করছিল। একটা পুরো জাতি তাদের পিতা-পিতামহের কাছে যে শিক্ষা পেয়েছে, যার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোনও কারণ তাদের ছিল না, সেই জাতির প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করছিল।"

এই পরিবেশে অদ্বৈত দর্শনবাদের সমর্থনে মতবাদ সৃষ্টি হতে

থাকে। এই অদ্বৈতমতাবলম্বীরা পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ প্রথা, কুসংস্কার প্রত্যাখ্যান করেছিল। এই মতাবলম্বীদের পুরোধা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইউরোপের ভাবধারার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য রামমোহন হিন্দুচিন্তার সম্পদ-ভাণ্ডার থেকে নূতন নূতন অস্ত্রের আবিষ্কার করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তার অনুকরণে সত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দৃশ্য জগতের কাছে অজ্ঞেয় জগৎকে বলিদান না করে, রামমোহন প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার সুগভীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার ফরাসী বিপ্লবের সামাজিক গণতন্ত্রের সংমিশ্রণ ঘটাতে চেয়েছিলেন।

রামমোহন ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দুধর্মের সংস্কারের উদ্গাতা ছিলেন। রামমোহন যখন আত্মপ্রকাশ করলেন তখন একদিকে হোলবাক, কর্নডরমেট, দিদেরো প্রভৃতি আভিধানিকদের প্রভাব শেষ হয় নি, আর বেনথাম এবং অন্যান্য ইংরেজ হিতবাদীরা---যাঁরা পরবর্তী কালে ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তায় গভীর ছাপ রেখে গেছেন---তাঁদের প্রভাব সবে শুরু হয়েছে। রামমোহন ছিলেন অন্যতম শেষ আভিধানিক এবং সেই সঙ্গে বেনথামের একজন বন্ধু। ভারতীয় ঐতিহ্যের মূলধারাকে বর্জন না করে, রামমোহন অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় উদারনীতি এবং মানবতা-বোধের সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির সরাসরি সংযোগ স্থাপন করে দেন।

রামমোহন ছিলেন ভারতের সেই নূতন অন্বীক্ষার প্রতিনিধি, যা বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট এবং যুক্তি ও মানবতাবাদের প্রতি আগ্রহী। যদিও তিনি মূলতঃ একজন সংস্কারক ছিলেন তবুও প্রাচীনের প্রতি তাঁর ছিল সমালোচনামূলক শ্রদ্ধা আর অর্থহীন বিদ্রোহের প্রতিও ছিল তাঁর বিরাগ। সংস্কারক হিসেবে রামমোহন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মসমাজই প্রথম ধর্মীয় সংস্কার-আন্দোলন যা পাশ্চাত্য নূতন চিন্তার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল।

রামমোহন গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পরিবারের সন্তান ছিলেন। শৈশব থেকেই রামমোহনের ধর্ম-সম্পর্কীয় জিজ্ঞাসা খুব প্রবল ছিল। পারসী ভাষা শিক্ষার পর রামমোহন তখনকার হিন্দুধর্মের প্রধান পীঠস্থান বারাণসী যান এবং নিজেকে সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নে নিমজ্জিত করেন। তাঁর পর রামমোহন সারা ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, এমনকি তিব্বতে গিয়েও তিনি বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করবার জন্য কয়েক বছর নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

ইংরেজী ভাষার সঙ্গে পরিচয় ঘটার আগেই তখনকার দিনের ঐশ্লামিক চিন্তার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র পাটনায় পড়াশুনা করার ফলে রাম-মোহনের ধর্মীয় সংস্কার সম্বন্ধে নিজস্ব ধারণা জন্মাতে শুরু করে। রামমোহন যদি কখনও পাশ্চাত্য চিন্তার সংস্পর্শেও না আসতেন তাহলেও তিনি হয়ত নানক বা কবীরের মতো ধর্মসংস্কারক হতেন। ১৭৯৬ সালে রামমোহন ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। রামমোহন মূল সংস্কৃত উপনিষদ্ ও বেদান্তসূত্র এবং মূল হিব্রু ও গ্রীকে বাইবেলের 'পুরাতন' এবং নূতন টেস্টামেন্ট অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি উপনিষদের কিছু

অনুবাদ করেন এবং একটি বই—'Precepts of Jesus, the Guide to Peace and Happiness" প্রকাশ করেছিলেন। এই বইটি দেশবাসীর জন্য যত না অর্থপূর্ণ হোক, তার চেয়ে অনেক বেশী ছিল খ্রীষ্টান পাদ্রীদের উত্তর।

রামমোহন 'বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের' একজন বিশিষ্ট প্রশাসক ছিলেন। প্রশাসক-জীবনে সাফল্য এবং ভূমিসম্পদ্ হতে নিশ্চিত উপার্জনের জোরে তিনি ৪২ বৎসর বয়সে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে কলকাতায় স্থায়ী বসবাস শুরু করেন এবং সম্পূর্ণভাবে ভারতের আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক নবজাগরণের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। বহু গোঁড়া হিন্দুর ক্রুদ্ধ বিরোধিতাসত্ত্বেও রামমোহন এই নবজাগরণের কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন।

জীবনের অপরাহ্নকালে রামমোহন দিল্লীর সম্রাটের জন্য দরবার করতে ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডে যেতে "কালাপানি" পার হয়ে তিনি আর একবার গোঁড়া হিন্দুদের অনুশাসন প্রত্যাখ্যান করেন। ইংল্যাণ্ডে রামমোহন পার্লামেন্টের এক কমিটির সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থা উন্নত করার কথা ব্যক্ত করেন। এখানেই তিনি জেরিমি বেন্থামের সংস্পর্শে এসেছিলেন, যিনি পরবর্তী কালে রামমোহনকে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে অভিহিত করেন। রামমোহনকে একটি চিঠিতে বেন্থাম বলেছিলেন, "Your works are made known to me by a book in which I read a style which but for the name of a Hindu, I should certainly have ascribed to the pen of a superiorly educated and instructed Englishman".

সেই চিঠিতে তিনি জেমস মিলের বিখ্যাত 'History of India' পুস্তকের প্রশংসা করতে গিয়ে লিখেছিলেন, "though as to style I wish I could with truth and sincerity pronounce it equal to yours". ইংল্যাণ্ডে রামমোহন সর্বত্রই ভারতের বেসরকারী রাষ্ট্রদূত হিসেবে সম্মান লাভ করেছিলেন। রামমোহন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিস্টলে প্রাণত্যাগ করেন।

রামমোহনই প্রথম ভারতীয় সংস্কারক যিনি ইউরোপের স্বাধীনতা এবং মানবতাবোধের ধারাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে উপনিষদের প্রকৃত নীতির পুনর্জাগরণ এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। রামমোহন দেশীয় ধর্মের মূলসত্যকে শূন্য আচারের দুর্বোধ্যতা থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন এবং উপনিষদের মধ্যে ভারতীয় ধর্মের আত্মিক অদ্বৈতবাদের উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন। যে-সব শিক্ষিত ভারতীয় ইউরোপের বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে আধুনিক যুক্তিভিত্তিক এক বিশ্বাস খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন তাঁরা রামমোহনের যুক্তিবাদী শাস্ত্রব্যাখ্যার মধ্যে সান্ত্বনা ও আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলেন।

রামমোহনের ধর্মবিষয়ক যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ তৎকালীন হিন্দুদের খ্রীষ্টান হবার প্রবণতাকে প্রশমিত করে। খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারের সবচেয়ে বড় কথা ছিল যে হিন্দুধর্মের পুতুল

পূজাই নাকি সার কথা। রামমোহন ঘোষণা করেছিলেন যে হিন্দু-শাস্ত্র এক পরম অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী, মূর্তিপূজা তার মূল কথা নয়, বিকৃতি মাত্র। একজন ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু যদি পৌত্তলিকতায় বিমুখ হন তবে তাঁর খ্রীষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হ'বার প্রয়োজন নেই, তিনি শুধু মাত্র উপনিষদের আত্মিক অদ্বৈতবাদে ফিরে যেতে পারেন। রাম-মোহনকে দুই প্রান্তে যুদ্ধ করতে হয়েছিল---একদিকে খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের বিরুদ্ধে, অপরদিকে গোঁড়া হিন্দুদের বিরুদ্ধে।

রামমোহন প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন যে হিন্দুধর্ম কেবল জড়মূর্তির পূজা ও কতকগুলি বর্বর আচার-আচরণ নয়। রামমোহন হিন্দুধর্মকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন তার পুনর্ব্যাখ্যা করে এবং তাকে পরিশুদ্ধ করে। রামমোহনই ছিলেন প্রথম মহৎ ভারতীয় যিনি ইউরোপের যুক্তিবাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি আধুনিক ইউরোপের প্রাণশক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেন নি, আবার তার অনুকরণও করেন নি। আর সেই কারণেই রামমোহন যেমন একদিকে ইংরেজী শিক্ষাকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, আবার অন্যদিকে যারা ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে হেয় করার প্রয়াসে লিপ্ত ছিল তাদের তিনি তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন।

ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মেকলের বিখ্যাত প্রতিবেদন রচিত হয়। তার অনেক আগে রামমোহন বাঙালী ছেলেদের ইংরেজীর মাধ্যমে লেখাপড়া শেখবার জন্য বেশ কয়েকটি বিদ্যালয় চালু করে দিয়েছিলেন। ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রসারের জন্য রামমোহন যখন আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন, সেই সময়ে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত চর্চার উদ্দেশ্যে একটি নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ায় তিনি কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় রামমোহন ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে আরো জোরালো সওয়াল করলেন। সে সময়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষিতদের মধ্যে রামমোহন ছিলেন শিরোমণি, তাই ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে তাঁর সওয়াল জনশিক্ষা কমিটিতে ইংরেজী শিক্ষার সমর্থক সদস্যদের বিশেষভাবে নৈতিক সমর্থন যোগায়।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত চর্চার প্রসারের জন্য এক নূতন কলেজ স্থাপন ও তাকে আর্থিক সাহায্য দানের সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে রামমোহন তাঁর বিখ্যাত চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমরা জানতে পারলাম যে সরকার হিন্দু পরিচালনায় এক সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করতে চলেছেন এবং সেই প্রতিষ্ঠানে ভারতে প্রচলিত ধারায় জ্ঞান বিতরণ করা হবে (লর্ড বেকনের আগের আমলে ইউরোপে যে ধরনের শিক্ষার প্রচলন ছিল সেই জাতীয়)। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্ররা ব্যাকরণের খুঁটিনাটি ও দর্শনতত্ত্বের কচকচি দিয়ে মাথা ভারাক্রান্ত করবে, কিন্তু কি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে, কি সমাজের ক্ষেত্রে এর কোনো উপযোগিতা নেই। সারা ভারতে এতকাল ধরে যা শেখানো হয়েছে এই ব্যবস্থায় ছাত্ররা সেই দু-হাজার বছর আগেকার

পুরনো বিষয়েই জ্ঞানলাভ করবে, বড়জোর তার সঙ্গে জানতে পারবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মানুষের তৈরি কিছু ব্যর্থ ও অন্তঃসারশূন্য টীকা-টিপ্পনি।"[১০] সংস্কৃত যে শক্ত ভাষা এ কথার উল্লেখ করে রামমোহন বলেন যে ভালভাবে জ্ঞানলাভের জন্য প্রায় সারাজীবন ধরে এই ভাষাই অধ্যয়ন করতে হবে। অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে এবং বিশেষ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা প্রবর্তনের সপক্ষে রামমোহন তাঁর বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, "প্রকৃত জ্ঞানার্জন থেকে ব্রিটিশ জাতিকে যদি বিরত রাখাই উদ্দেশ্য হত তবে সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে এবং অজ্ঞানতাকে চিরস্থায়ী করে রাখার সবচেয়ে ভাল বন্দোবস্ত হোত গুরুমশাইদের শিক্ষা অব্যাহত রাখা এবং বেকনীয় চিন্তাধারার প্রবতন না করা। অবশ্য ব্রিটিশ আইনসভার নীতি যদি তাই হয় তবে অনুরূপভাবে বলা যায় যে সংস্কৃত পদ্ধতিতে শিক্ষা-ব্যবস্থায় এ দেশকে অন্ধকারে রাখার পক্ষে সবচেয়ে সুবন্দোবস্ত হবে।"[১১]

অষ্টাদশ শতকের সত্তরের দশকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ফারসী, আরবী ও সংস্কৃত চর্চার উন্নতিবিধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন ভারতে প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়াল তখন ভারতীয়রা অনেকেই বুঝতে পারল যে ইংরেজীর জ্ঞান অর্জন না করলে নতুন সরকারের অধীনে চাকরি পাওয়ার পথ প্রশস্ত হবে না; যদিও তখনও ফারসী ভাষায় কিছু কিছু সরকারী কাজ-কর্মের প্রচলন ছিল। ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকরি পাবার অর্থকরী মনোভাব অনেক ভারতীয়কে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করে। কিন্তু এই অর্থকরী লক্ষ্য পূর্ণ করা ছাড়াও ইংরেজীর জ্ঞান আধুনিক চিন্তাধারার উৎসমুখ খুলে দেয় এবং সে সময়ে যে-সমস্ত পরিশীলিত ভারতীয় এই কারণে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন রামমোহন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে টমাস ব্যাবিংটন মেকলে যখন জনশিক্ষা কমিটির সভাপতি হলেন, তখন এই কমিটি ইংরেজী সমর্থক ও প্রাচ্য শিক্ষা সমর্থক এই দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। ইংরেজীর সমর্থকরা চাইলেন কিছু কেরানী হোক, আর বাকীরা হোক ইংরেজ ইচ্ছাধীন বশংবদ শাসক ও বিশ্বাসী সরকারী চাকুরে। অপর পক্ষ যাঁরা প্রাচ্য শিক্ষার সমর্থক তাঁরা এতে ভয় পেলেন এই ভেবে যে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হলে ভারতীয় উচ্চশ্রেণীরা বিক্ষুব্ধ হবে, এমন কি তাদের ভেতর বিদ্রোহের ভাবও দেখা দিতে পারে।

এ ছাড়া প্রাচ্য ভাষাবিদ্‌রা এটাও চান নি যে এ দেশীয় প্রাচীন মতবাদে আঘাত পড়ুক। প্রাচ্য ভাষাভাষী পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। প্রাচ্য ভাষাবিদ্‌রা আরো উৎসাহিত হয়েছিলেন মহান প্রাচ্য ভাষাবিদ্ স্যার উইলিয়ম জোন্স (১৭৪৬—৯৪)-এর চিন্তাধারা থেকে। ভারতীয় ভাষাসমূহ সম্পর্কে জোন্সের বিশেষ উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি বলতেন, "ফারসী ভাষা হচ্ছে সমৃদ্ধ, শ্রুতিমধুর ও পরিচ্ছন্ন, এশিয়ার সব চেয়ে সমৃদ্ধ রাজদরবার-

গুলিতে এই ভাষা ব্যবহৃত হয়ে আসছে; কবি, দার্শনিক ও ঐতিহাসিকরা সুষমামণ্ডিত উন্নত আবেগ এই ভাষাতে কেমন সাবলীল ভঙ্গিতে লিখে গিয়েছেন ...তাই আশ্চর্য মনে হয় যে যখন সাধারণের মধ্যে জনশিক্ষার প্রসার হওয়ার প্রয়োজন তখন এই ভাষার চর্চা হচ্ছে এত কম।"[১২]

ইউরোপের প্রাচ্যবিদ্যার অনুরাগীরা নিজেরাই অল্পবিস্তর ব্রাহ্মণ্য-বাদী হয়ে পড়েছিলেন ও তাই ব্রাহ্মণদের পাশ্চাত্যমুখী করার চেষ্টায় তাঁদের সাহায্য আশা করা যুক্তিযুক্ত ছিল না। উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হচ্ছেন, অবশ্য শেষের দিকে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০--৯১)। সংস্কৃতের মহাপণ্ডিত বিদ্যাসাগর ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। সংস্কৃত পণ্ডিত হলেও বিদ্যাসাগর রামমোহনের মতো ইংরেজী শিক্ষাকে স্বাগত জানান এবং রামমোহন প্রবর্তিত ধর্ম-নিরপেক্ষতার ধারাকে বেগবতী করতে সাহায্য করেন। শিক্ষা পর্যদের কাছে অভিমত ব্যক্ত করে তিনি লিখেছিলেন, "কতকগুলি কারণে... সংস্কৃত কলেজে আমরা বেদান্ত ও সাংখ্যের বিচার পড়িয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি। বেদান্ত ও সাংখ্য ভ্রান্ত হলেও এই সব দর্শন হিন্দুদের মধ্যে সীমাহীন শ্রদ্ধা পেয়ে আসছে। সংস্কৃত কলেজে এইগুলি পড়ানোর সময় দেখতে হবে যাতে ইংরেজী পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত অভ্রান্ত দর্শনের সাহায্যে এগুলোর প্রভাব খর্ব করা হয়।"[১৩]

জনশিক্ষা কমিটির সভাপতি যখন সদ্য ইংল্যাণ্ড থেকে আসেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৪ বছর এবং ভারতীয় ভাষা-সম্পর্কে তার কোনো ধারণা ছিল না, তবু তিনি তাঁর শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিবেদনে ইংরেজী অনুরাগীদের পক্ষেই সিদ্ধান্ত দেন। শিক্ষার উপরে রামমোহন তাঁর বিখ্যাত চিঠি লিখেছিলেন ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে আর শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতি-বেদনে[১৪] ইংরেজী অনুরাগীদের সমর্থন করতে গিয়ে রামমোহন কর্তৃক ব্যবহৃত অনেক যুক্তি, এমন কি তাঁর বাক্যালঙ্কারগুলিও, মেকলে ব্যবহার করেন। ইংরেজী সম্পর্কে মেকলের যেরকম শ্রদ্ধা ছিল সংস্কৃত আর আরবী ভাষা সম্পর্কে তাঁর সেইরকমই অশ্রদ্ধা ছিল, যদিও এই সব ভাষা সম্পর্কে মেকলের বিশেষ কোনো জ্ঞান ছিল না। মেকলে নিজেই বলেছেন, "সংস্কৃত বা আরবী সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই। তবে এই সব ভাষার উপযোগিতা বিচারের জন্য যা যা করা দরকার আমি তা করেছি। ইংল্যাণ্ডের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য বইয়ে সংক্ষিপ্তাকারে যে ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবেশিত থাকে তা যত নগণ্যই হোক, আমার বিশ্বাস, মোটেই বাড়িয়ে বলা হবে না যদি বলা হয় যে সংস্কৃত ভাষায় রচিত সমগ্র পুস্তকভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত ও একত্রিত মালমসলার তুলনায় সেগুলি নিঃসন্দেহে মূল্যবান। বর্তমানে মাতৃভাষায় শিক্ষালাভে অসমর্থ এক জাতিকে আমাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। অর্থাৎ কোনো বিদেশী ভাষায় আমাদের শিক্ষা দিতে হবে।"

ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের সুপারিশ করে রচিত মেকলের প্রতিবেদন সম্পর্কে ঐতিহাসিক সীলি মন্তব্য করেছেন, "পৃথিবীতে আর কখনও এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় নি।"* মেকলের

প্রতিবেদন পেয়ে ইংরেজী অনুরাগীদের সুবিধা হয়ে গেল এবং ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারে তা বিশেষভাবে সহায়তা করল। একদা বাঙলার গভর্নর আর্ল অব রোনাল্ড্‌সে 'দি হার্ট অব আর্যাবর্ত' বইটিতে লিখেছিলেন, "অতঃপর হিন্দুত্বের পুরনো আধারে পশ্চিমী শিক্ষার ধারা প্রবাহিত হবার ফল দাঁড়াল মারাত্মক এবং কোনো সন্দেহ নাই যে নব্য বঙ্গের যুবকদের মধ্যে এ একটা বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করল।"[১৫] কার্যকালে দেখা গেল যে সারা ভারত জুড়ে একই ভাষায় অর্থাৎ ইংরেজীতে শিক্ষাদানের ফলে দেশ জুড়ে ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণীর উদ্ভব হল, যার ফলে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের চেতনার দানা বাঁধতে কিছুটা সহায়তা হল।

ইংরেজী শিক্ষা প্রথমে ইংরেজী শাসনের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিল। পরে যখন ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠল এবং নরমপন্থীরা ইংরেজী শাসনকে উদারনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে পরিবর্তিত করতে চাইলেন তখনও কিন্তু তাঁরা রামমোহনের মতো ইংরেজী শিক্ষাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে নরমপন্থী নেতা গোখলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে বলেন, "ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে সবরকম পাশ্চাত্য শিক্ষাই মূল্যবান ও দরকারী ..আমার মনে হয় ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিদ্যানুরাগী হতে উৎসাহিত করার চেয়েও পাশ্চাত্য শিক্ষার বড় কাজ হচ্ছে পুরনো চিন্তাধারার দাসত্ব থেকে মুক্তিদান এবং পাশ্চাত্যের জীবনধারায়, চিন্তায় ও চরিত্রে যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও উন্নত তাকে গ্রহণ করা।"[১৬]

নরমপন্থীরা ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারকে উৎসাহভরে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে লখনউতে আর একজন নরমপন্থী নেতা পণ্ডিত বিষণ নারায়ণ দার বলেন, "লেকির 'হিস্ট্রি অফ র‍্যাশানালিজম' এবং 'ইউরোপীয়ান মর‍্যালস্', গুইজটের 'হিস্ট্রি অফ সিভিলাইজেশন', মেইনের 'এনসিয়ান্টল' স্পেনসরের 'স্টাডি অব সোশিওলজি', মিলের 'লিবার্টি' এবং 'রিপ্রেজেন্টেটিভ গভর্নমেন্ট', স্যার আলফ্রেড লায়ালের 'এশিয়াটিক স্টাডিজ', মরলের 'কম্প্রোমাইজ'.... বাগেহটের 'ফিজিক্স্ অ্যাণ্ড পলিটিক্স্', সিলীর 'এক্স্‌পালশন্ অব ইংল্যাণ্ড' এবং 'লেকচারস্ অন্ পোলিটিক্যাল সায়ান্স', প্রাক্-স্নাতক-শ্রেণীর প্রত্যেক ছাত্রের পাঠোত্তর জীবনে অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।"[১৭] নরমপন্থীরা স্বদেশবাসীকে পাশ্চাত্য দেশের প্রাকৃতিক ও সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়ন করবার জন্য উৎসাহিত করতেন। ভারতে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁদের প্রধান সমালোচনা এই ছিল যে এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উপর যতটা জোর দেওয়া উচিত ততটা জোর দেওয়া হচ্ছিল না।[১৮]

চরমপন্থীরা ভারতে স্বদেশী শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলনে আগ্রহী ছিলেন কিন্তু তাঁরাও ভারতীয় বিদ্যালয়গুলি থেকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির উচ্ছেদ-সাধন করতে চান নি। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের কালে চরমপন্থীদের সহায়তায় স্থাপিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় নি। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের গঠনতন্ত্রে উল্লিখিত

প্রধান উদ্দেশ্যগুলি ছিল, 'জাতীয় ধারার সাহিত্য ও বিজ্ঞান এবং সেই সঙ্গে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া.---দেশের সাহিত্য, ইতিহাস. দর্শন সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া এবং প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও জীবন-দর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সমন্বিতকরণযোগ্য আদর্শকে বরণ করা..'[১৯]

চরমপন্থী নেতারাও, আর বিশেষ করে লালা লাজপত রায়, পাশ্চাত্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান অধ্যয়নের উপর বরাবর জোর দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন যে ঐগুলি অধ্যয়ন করলে ভারতীয়রা পুরোপুরি পাশ্চাত্যমুখী হয়ে যাবে না, বরং তারা আরো ভাল আধুনিক ভারতীয় হয়ে উঠতে পারবে। আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে অস্বীকার করে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়া যাবে না।[২০] নির্ভেজাল জাতীয় চরিত্র বজায় রাখার জন্য হাজার হাজার মানুষকে আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থা বর্জন করতে বললে রোগমুক্তির পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। সমর-বিদ্যাতেও ভারতীয়েরা যদি আধুনিক শস্ত্র-বিজ্ঞান না শেখে এবং যদি সেকালের প্রাচীন প্রতিরক্ষা প্রথার তীরধনুক, বর্শা. তরোয়ালের উপর কেবলমাত্র নির্ভর করে তবে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। তেমনি অর্থনীতি-শাস্ত্রেও কেবলমাত্র পুরনো অর্থশাস্ত্রের উপর আস্থাশীল থেকে যদি ইউরোপীয় চিন্তাশীলদের দ্বারা রচিত নবতর ও ব্যাপকতর অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন না করা হয় তবে ভারতীয়দের অজ্ঞানের অন্ধকারে বাস করতে হবে। তেমনি আইন শাস্ত্রের বিষয়ে মনু, নারদ ও আপস্তম্বের নির্দেশাবলীতে ডুবে থাকলে এবং সমকালীন চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আধুনিক ভারতের বিধিবদ্ধ আইনকে অস্বীকার করলে পশ্চাদ্গামিতা ও মূঢ়তাকেই বরণ করা হবে।[২১] আধুনিককালে ভারতীয়রা যদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের জ্ঞান আহরণ করতে অরাজী হয় এই বলে যে এগুলি প্রধানতঃ অভারতীয়-দের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে, তাহলে চরমপন্থীরাও বলতেন যে ভারতীয়রা নিজেদেরই বঞ্চিত করবে।

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় নবজাগরণ

যেসব পাশ্চাত্যভাবাপন্ন যুবক শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যেতেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৩—১৯০২), পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ নামে যিনি সুবিখ্যাত। বিবেকানন্দ পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন এবং আইন পড়ার জন্য ইংল্যাণ্ডে যাওয়া মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ধর্মপ্রেরণা তাঁকে এক গুরুর কাছ থেকে অন্য গুরুর কাছে নিয়ে যায়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে গিয়ে বিবেকানন্দ প্রশ্ন করেছিলেন তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন কি না। দেবেন্দ্রনাথের উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণকে সেই একই প্রশ্ন করতে গিয়েছিলেন। এই পশ্চিমী শিক্ষাহীন সরল গ্রাম্য সাধক বিবেকানন্দকে বলেছিলেন যে, হ্যাঁ, তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন। প্রথমে বিবেকানন্দ সন্দিগ্ধ ছিলেন আর বহু দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে দোলায়িত হয়েছিলেন ; কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর বিশ্বাস জন্মায় এবং পরে তিনি রামকৃষ্ণের কাছে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ করেন।

ছাত্র বয়সে বিবেকানন্দ তাঁর অন্যান্য সতীর্থদের মতই পশ্চিম-এর যুক্তিবাদী সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠেন এবং তিনি ঈশ্বর বা ধর্ম সম্বন্ধে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে বিবেকানন্দের সমস্ত জীবন ও চিন্তা একটা নূতন পথে প্রবাহিত হল। কিন্তু যদিও বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণকে গুরু বলে স্বীকার করে নেন, তাঁদের মানসিকতা ছিল বিভিন্ন। রামকৃষ্ণের অধিকাংশ জীবন কেটেছে দক্ষিণেশ্বরে যেখানে তিনি তাঁর সরল সহজ ধর্ম প্রচার করেছেন যা প্রবেশ করত মানুষের হৃদয়ে। কিন্তু বিবেকানন্দ সারা বিশ্ব পরিভ্রমণ করেছেন প্রকৃত বেদান্তের প্রচার করার জন্য। রামকৃষ্ণ সকলকে বলেছেন ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে এই ঈশ্বর-উপলব্ধির মধ্যেই বাকী সব পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। বিবেকানন্দ মূলতঃ তাঁর গুরুর এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়েও এমন এক ধর্মপ্রচারে নামলেন যাঁর মূলমন্ত্রই হচ্ছে সমাজসেবা এবং দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের দুঃখমোচন। রামকৃষ্ণের নারায়ণ বিবেকানন্দের কাছে দরিদ্র নারায়ণ হয়ে উঠলেন।

১৮৯৩ সালে চিকাগোতে প্রথম ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দের বক্তৃতা সমগ্র পৃথিবীকে চমকিত করে তোলে। ধর্মমহাসভায় ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার উপর বক্তৃতার পর মার্কিন সংবাদপত্র 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড' লেখে যে বিবেকানন্দ "was undoubtedly the greatest figure in the Parliament of Religions. After hearing him we feel how foolish it is to send Missionaries to this learned nation."[১] ১৮৯৩ সালে চিকাগোতে বিবেকানন্দ হিন্দু অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন ভারতীয় মনে তার যে প্রচণ্ড সাড়া উঠেছিল তা ১৯০৫ সালের রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধজয়ের ফলে যে সাড়া জাগে তার সঙ্গে তুলনীয়।

আমেরিকাতে বিবেকানন্দের অভূতপূর্ব সাফল্য ও বৈদান্তিক আদর্শের শক্তিশালী উপস্থাপন ভারতীয় মনে স্বকীয় ধর্মসংস্কৃতিতে গর্ববোধ দৃঢ়তর করে তোলে। আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে প্রায় চার বৎসরকাল ধর্মপ্রচার করে বিবেকানন্দ যখন ভারতে ফিরে এলেন তখন তিনি এক বীরের অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে বিবেকানন্দ বেদান্তের বাণী-প্রচারে ও স্বদেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন ও এই কাজে তিলে তিলে নিজেকে ক্ষইয়ে ফেলেন এবং মাত্র উনচল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

বিবেকানন্দ যখন পশ্চিমী জগতের সামনে ভারতীয় আত্মিক মহত্ত্ব তুলে ধরলেন তখন বিদেশী শাসনে অপমানিত ভারতীয়েরা এই ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন যে বাহ্যিক চাকচিক্যে যদিও তাঁরা দীন, অন্তরের ঐশ্বর্যে তাঁরা ধনী। বিবেকানন্দ দাবি করেন যে ভারত বহু যুগ ধরে এক মহৎ ধর্মচিন্তায় ব্যাপৃত, যে ধর্মচিন্তা পশ্চিমী বস্তুবাদের অনেক ঊর্ধ্বে।

বিবেকানন্দ মার্কিনবাসীদের কর্মক্ষমতা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় পারদর্শিতার প্রশংসা করেছেন, কিন্তু তিনি এও বলেছিলেন যে আর্থিক চিন্তা মার্কিন জীবনকে অত্যধিক অভিভূত করে রেখেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৮৯৪ সালে মহীশূরের মহারাজাকে তিনি একটি চিঠিতে লেখেন, "It is a wonderful country and this is a wonderful nation in many respects. No other nation applies so much machinery in their everyday work as do the people of this country. Everything is machine. There is no limit to their wealth and luxury". কিন্তু সেই সঙ্গেই তিনি একথা যোগ করলেন যে, "With all the criticisms of the Westerners against our caste they have a worse one—that of money. The almighty dollar, as the Americans say, can do anything here".[২]

পশ্চিম ভ্রমণকালে বিবেকানন্দ আমেরিকা ও ইউরোপের অধিবাসীদের সংগঠন ক্ষমতা ও তাদের গণতান্ত্রিক চিন্তাধারায় গভীর-ভাবে আকৃষ্ট হন, কিন্তু পরে তিনি অনুভব করেন যে পশ্চিমী সমাজ বিভেদ, লোভ এবং বিশ্ব-আধিপত্যের স্পৃহায় ভারাক্রান্ত। তিনি ইউরোপের প্রচ্ছন্ন বেদনাকে অনুভব করেন, যে বেদনা জন্মায় শক্তির অপব্যয়ের ক্লান্তি থেকে। ইউরোপের প্রগল্‌ভ মুখোশের অন্তরালে যে অসন্তোষ আর অস্বস্তি লুকানো ছিল, সে সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বলেন, "Social life in the West is like a peal of laughter, but underneath it is a wail. It ends in a sob. The fun and frivolity is all on the surface, really it is full of tragic intensity... Here (in India) it is sad and gloomy on the surface but underneath are carelessness and merriment".[৩]

১৮৯৯ সালে লিখিত তাঁর একটি প্রবন্ধে বিবেকানন্দ পশ্চিমের শিল্প ও বণিক সভ্যতার উল্লেখ করে তাঁর দেশবাসীকে বলেছিলেন কেন তারা তাঁদের নিজস্ব প্রাচীন ধর্ম ও ঐতিহ্যকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে।

তিনি লিখেছিলেন, "On one side is modern Western science, dazzling the eyes with the brilliance of myriad suns, and driving in the chariots of hard and fast facts... On the other are the hopeful and strengthening traditions of her ancient forefathers in the days when she was at the zenith of her glory-traditions that have been brought out of the pages of her history by the great sages of her own land and outside, that run for numberless years and centuries through her every vein, with the quickening of life drawn from universal love, traditions that reveal unsurpassed valour, superhuman genius and supreme spirituality, which are the envy of the gods—these inspire her with future hopes".

তিনি বললেন যে একদিকে নগ্ন বস্তুবাদ, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য, পুঞ্জীভূত ক্ষমতা আর বিদেশী সমাজের ইন্দ্রিয়-উপাসনা, আর অন্যদিকে এই সমস্ত ছাপিয়ে ভারতবর্ষ শুনছে তার চিরন্তন আধ্যাত্মিক বাণী। তার সামনে রয়েছে পশ্চিম থেকে আনা বিভিন্ন বিলাস-আয়োজন, উপাদেয় পানীয়, বহুমূল্য খাদ্য, অপূর্ব বসন, বিরাট প্রাসাদ, নূতন শকট, নূতন আচরণ, নূতনতর সজ্জা যা পরে আধুনিক তরুণী ঘুরে বেড়ায় তার নির্লজ্জ স্বাধীনতায়; আবার দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয় আর সেই স্থানে আবির্ভূত হয় সীতা ও সাবিত্রীর তপঃক্লিষ্ট উপস্থিতি, আত্মবিমুখ ধর্মসাধনা, উপবাস, বানপ্রস্থ গৈরিক বস্ত্রাচ্ছাদিত জটাধারী সন্ন্যাসী, সমাধি আর নিরলস আত্মানুসন্ধান। একদিকে পশ্চিমী সমাজের স্বার্থসিদ্ধ স্বাধীনতা আর অন্যদিকে আর্য সভ্যতার কঠোর আত্মত্যাগ। তিনি প্রশ্ন করেন, "In this violent conflict, is it strange that Indian society should be tossed up and down ? Of the West, the goal is—individual independence, the language--money-making education, the means—politics ; of India, the goal is—Mukti, the language—the Veda, the means--renunciation".[৪]

বিবেকানন্দ তাঁর দেশবাসীকে এই সনাতন ত্যাগের আদর্শে উদ্দীপিত হতে বলেছিলেন। ভারতবাসীকে তিনি বলেছিলেন, মানুষের মধ্যে যে ভগবান আছেন এবং মানুষে মানুষে যে একাত্মতা আছে তাই যেন তাঁরা উপলব্ধি করেন। তিনি আহ্বান জানালেন যেন ভারতীয়রা অধ্যাত্মবাদের প্রচারের জন্য সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ঘোষণা করলেন, "This is the great ideal before us and everyone must be ready for it—the conquest of the whole world by India--nothing less than that, and we must all get ready for it, strain every nerve for it. Let foreigners come and flood the land with their armies, never mind. Up, India, and conquer the world with your spirituality. Aye, as has been declared on this soil first, love must conquer hatred, hatred cannot conquer itself.

Materialism and all its miseries can never be conquered by materialism. Armies when they attempt to conquer armies only multiply and make brutes of humanity. Spirituality must conquer the West. Slowly they are finding out that what they want is spirituality to preserve them as nations . . . Where are the men who are ready to sacrifice everything, so that this message can reach every corner of the world? Such heroic souls are wanted to help the spread of truth. Such heroic workers are wanted to go abroad and help to disseminate the great truths of the Vedanta The world wants it , without it the world will be destroyed The whole of the Western world is on a volcano which may burst tomorrow, go to pieces tomorrow. They have searched every corner of the world and have found no respite They have drunk deep of the cup of pleasure and found it vanity Now is the time to work so that India's spiritual ideas may penetrate deep into the West . . We must go out, we must conquer the world through spirituality and philosphy. There is no other alternative, we must do it or die. The only condition of the national life, of awakened and vigorous national life, is the conquest of the world by Indian thought".[৫]

বিবেকানন্দ মনে করতেন যে যেমন পশ্চিমের প্রয়োজন হল ভারতের আধ্যাত্মিকতা, তেমনি ভারতের প্রয়োজন হল পশ্চিমের বিজ্ঞান-সাধনা ; আর তিনি চেয়েছিলেন এই পশ্চিমী বিজ্ঞানসাধনা ও ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে। বিবেকানন্দের এই ধরনের চিন্তা অনেকটা কেশবচন্দ্রের চিন্তার সঙ্গে তুলনীয়—কেশবচন্দ্র ভারতীয়দের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আর পাশ্চাত্যকে ভারতীয় প্রাচীন জ্ঞান শিক্ষা করতে বলেছিলেন।[৬] কেশবচন্দ্রের সমন্বয়বাদ অবশ্য জনগণের মনে খুব বেশী ছাপ রেখে যেতে পারে নি। কিন্তু বিবেকানন্দের ভারতীয় ঐতিহ্যের ব্যাখ্যা স্বদেশবাসীর মন আলোড়িত করে তুলেছিল। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, প্রাচ্যদেশ থেকেই সেই জিজ্ঞাসা ধ্বনিত হয়েছিল যে মানুষ সব কিছুর মালিক হয়েও যদি আধ্যাত্মিকতাহীন হয়, তাহলে লাভ কি। এই হল প্রাচ্য দর্শন। আর আছে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যা। এই দুইয়েরই নিজস্ব ঐশ্বর্য ও গৌরব আছে। বর্তমানের প্রয়োজন এই দুইয়ের সুসমঞ্জস সংমিশ্রণ। প্রাচ্যবাসীর কাছে আত্মিক জগৎ পাশ্চাত্য-বাসীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মতই সত্য, তাই আধ্যাত্মিকতার মধ্যেই প্রাচ্যবাসী জীবনের সমস্ত সফলতার সন্ধান পায়। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "To the Occidental he (the Oriental) is a dreamer ; to the Oriental the Occidental is a dreamer, playing with ephemeral toys, and he laughs to think that grown up men and women should make so much of a handful of matter

which they will have to leave sooner or later. Each calls the other dreamer. But the Oriental ideal is as necessary for the progress of the human race as is the Occidental and I think it is more necessary. Machines never made mankind happy, and never will make. He who is trying to make us believe this, will claim that happiness is in the machine, but it is always in the mind. The man alone who is the lord of his mind can become happy, and none else... It is true that external nature is majestic, with its mountains and oceans and rivers and with its infinite power and varieties. Yet there is a more majestic internal nature of man, higher than the sun, and the stars, higher than this earth of ours and higher than the physical universe, transcending these little lives of ours ; and it affords another field of study. There the Orientals excel, just as the Occidentals excel in the other. Therefore it is fitting that, whenever there is a spiritual adjustment, it should come from the Orient. It is also fitting that when the Oriental wants to learn about machine-making, he should sit at the feet of the Occidental and learn from him. When the Occident wants to learn about the spirit, about God, about the soul, about the meaning and mystery of this universe, he must sit at the feet of the Orient to learn".[৭]

বিবেকানন্দ যে বাণী প্রচার করেছিলেন তা হল এই যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর সুপ্ত আছেন এবং এইভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করলে সব মানুষের মৌলিক ঐক্যের মধ্যে মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ খুঁজে পাওয়া যাবে। তিনি বলেছিলেন, "Every man and woman is the palpable, blissful, living God. Who says God is unknown ? Who says He is to be searched after ? We have found God eternally. We have been living in Him eternally. He is eternally known, eternally worshipped".[৮]

বিবেকানন্দ একই সঙ্গে সনাতনী ও সংস্কারক ছিলেন। তিনি সনাতনী ছিলেন, কেননা তিনি ভারতীয় ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন এবং পশ্চিমের অনুকরণকে ঘৃণা করতেন। তিনি সংস্কারক ছিলেন, কেননা তিনি ভারতীয় সমাজের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের আধুনিক চিন্তাধারাকে গ্রথিত করতে চেয়েছিলেন। বিবেকানন্দ ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে বিসর্জন না দিয়ে তার মধ্যে আধুনিক যুক্তি-বাদের সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন।

বিবেকানন্দ পৌত্তলিকতাকে সমর্থন করেছেন কিন্তু বলেছেন যে পৌত্তলিকতা উপাসনার নিম্নতম স্তর। "This external worship of image has, however, been described in all our Shastras as the lowest of all low forms of worship. But that does not mean

that it is a wrong thing to do. Despite the many inequities that have found entrance into the practice of image-worship as it is in vogue now, I do not condemn it".[৯]

রামকৃষ্ণ সাকার ও নিরাকার দুইভাবেই ঈশ্বর উপাসনায় বিশ্বাসী ছিলেন। রামকৃষ্ণের উল্লেখ করে বিবেকানন্দ বলতেন, "Aye, where would I have been, if I had not been blessed with the dust of the holy feet of that orthodox, image-worshipping Brahmana?" সংস্কারকদের সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "Those reformers who preached against image-worship or what they denounce as idolatry— to them I say : 'Brother, If you are fit to worship God without form discarding any external help, do so, but why do you condemn others who cannot do the same ?' "[১০]

বিবেকানন্দ বর্ণাশ্রমকে পুরোপুরি বর্জন করতে চান নি, কিন্তু বর্ণাশ্রমের অচল জড়তা দূর করে তাকে গুণভিত্তিক করতে চেয়েছিলেন। আর অস্পৃশ্যতার অনাচার দূরীকরণে বিবেকানন্দ বিশেষ প্রয়াসী ছিলেন। তিনি হিন্দু সমাজকে সংশোধন করে তার শুচিতা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন, তাকে ভেঙে ফেলতে চান নি। বর্ণাশ্রমকে সরাসরি আক্রমণ করলে সংস্কারের চেয়ে বাদবিতণ্ডাই বেশী হবে বলে তিনি মনে করতেন। আসলে বিবেকানন্দের গুণভিত্তিক গতিশীল বর্ণাশ্রমের কল্পনা সেই কালের প্রচলিত বর্ণাশ্রম, যার ভিত্তিই ছিল অচল জড়তা, তার বিরুদ্ধে সরাসরি সংগ্রামেরই নামান্তর মাত্র।

বিবেকানন্দ যদিও সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন, তবু শুধুমাত্র পশ্চিমীরা পছন্দ করেন নি বলেই কোন ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ভেঙে ফেলতে হবে এইরকম মনোভাবের তিনি সমালোচনা করেন। শেষের দিকে লেখা, ১৮৯৯ সালের একটি প্রবন্ধে, তিনি বলেন, "The Westerners disapprove of our dress, decoration, food and ways of living -- therefore let us throw our gods and goddesses into the river of Ganges The Westerners hold caste distinctions to be obnoxious--therefore let all the castes be jumbled into one. We are not discussing here whether those customs deserve countenance or rejection ; but if the mere disapproval of the Westerners be the measure of the abominableness of our manners and customs, then it is our duty to raise our emphatic protest against it."

পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার নির্বিচার অনুকরণকে বিবেকানন্দ সর্বদাই কঠিন সমালোচনা করেছেন। শিকাগো ধর্মসভায় যিনি হিন্দু সন্ন্যাসীর গৈরিক আলখাল্লা পরে বক্তৃতা করেছিলেন সেই বিবেকানন্দ তীব্র ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন যে তিনি যখনই ইউরোপীয় পোশাকে সজ্জিত ভারতীয় দেখেন তখন তাঁর মনে হয় এরা নিজের জাতিত্বে লজ্জিত, ভারতবর্ষের অজ্ঞ, দরিদ্র, অশিক্ষিত, নিপীড়িত মানুষের সঙ্গে নিজের আত্মীয়তা স্বীকার করতে

অনিচ্ছুক। তিনি সশ্লেষে বলেন, "The Westerners have now taught us that these stupid, ignorant, low-caste millions of Indians, clad only in loin-clothes, are not Aryans. They are therefore no more our kith and kin".[১১]

বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে তার নিজস্ব আচরণ, সভ্যতা ও জীবন-যাত্রার পদ্ধতি সম্বন্ধে গৌরব অনুভব করতে বলেছিলেন। তিনি আসমুদ্র-হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে বজ্রনির্ঘোষে বিদেশী সংস্কৃতির রাহুগ্রস্ত বিজাতীয়ত্ব ও পশ্চিমের অনুকরণশীলতার বিরুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ আবেগ-বিহ্বল হয়ে লিখেছিলেন,—"হে ভারত, অপরের প্রতিধ্বনিমাত্র, হীন অনুকরণ, পরাধীনতা ও দুর্বল ক্রীতদাসত্ব—এই উপকরণ দিয়েই কি তুমি সভ্যতা ও মহত্ত্বের শিখরে উঠবে? যে স্বাধীনতা একমাত্র সাহসী ও বীরগণের লভ্য, তা কি তুমি এই অপমানজনক কাপুরুষতা দিয়ে পাবে? হে ভারত, ভুলো না, তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলো না যে ভগবানকে তুমি পূজা করো সে হল মহাসন্ন্যাসী, সর্বত্যাগী উমানাথ শঙ্কর, ভুলো না যে তোমার বিবাহ, তোমার সম্পদ, তোমার জীবন শুধু বিলাসের জন্য নয়, তোমার ব্যক্তিগত সুখভোগের জন্য নয়, ভুলো না যে জন্ম থেকেই তুমি মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত, ভুলো না যে তোমার সমাজ অনন্ত বিশ্বমাতার লীলামাত্র, ভুলো না যে শূদ্র, অজ্ঞ, দরিদ্র, অশিক্ষিত, মুচি ও মেথর তোমার রক্তমাংস, তোমার ভাই, হে বীর, ওঠো জাগো, সাহসের সঙ্গে বলো, 'অজ্ঞ ভারতবাসী, শূদ্র ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবর্ষ আমার জীবন, ভারতীয় দেবদেবীরা আমার ভগবান, ভারতীয় সমাজ আমার শৈশবের মাতৃক্রোড়, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী।' বল ভাই, 'ভারত-বর্ষের মাটিই আমার স্বর্গ, ভারতবর্ষের কল্যাণই আমার কল্যাণ'। আর দিবারাত্রি প্রার্থনা কর, 'হে গৌরীনাথ, হে জগজ্জননী, আমাকে মনুষ্যত্ব দাও হে শক্তিদাত্রী জননী, আমার দুর্বলতা, অমানুষতা দূর করো, আমায় মানুষ করো'।[১২]

বিবেকানন্দ ভারতীয় সমাজের আমূল পরিবর্তন চাইতেন কিন্তু তিনি তৎকালীন সংস্কারকদের দৃষ্টিভঙ্গী ও সমালোচনার ভাষা অপছন্দ করতেন। ১৮৯৭ সালে তিনি যখন মাদ্রাজে ধর্মপ্রচার করছিলেন তখন কয়েকজন সমাজ-সংস্কারকের সমালোচনার উত্তরে তিনি বলেন, "যে-কোন একজন সমাজ-সংস্কারক সেই মানুষ আমায় দেখান যিনি শূদ্রের মলমূত্র নিজ হাতে পরিষ্কার করে নিজের মাথার চুল দিয়ে তা মুছে দিয়েছেন (রামকৃষ্ণ যা করেছিলেন), তাহলে আমি তাঁর পদতলে বসে শিক্ষা গ্রহণ করব। কিন্তু তার আগে নয়। "One ounce of practice is worth twenty thousand tons of big talk."[১৩] তিনি সমাজ-সংস্কারকদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আমি নিজেকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে সমস্ত সমাজকে নির্দেশ দিতে পারি না, তুমি এই দিকে যাবে, ঐ দিকে নয়।" তিনি বলেন, "Boys, unmoustached babies, who never went out of Madras, standing up and wanting to dictate laws to three hundred millions

of people, with thousands of traditions at their back... Irreverent boys, simply because you can scrawl a few lines upon a paper and get some fools to publish it for you, you think that you are the educators of the world, you think you are the public opinion of India".[১৪]

সমাজ-সংস্কার আন্দোলন সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেন, "What good has been done excepting the creation of a most vituperative and most condemnatory literature ?" বিবেকানন্দের মতে সমাজ-সংস্কারকরা সনাতনপন্থীদের এত বেশী সমালোচনা করেছেন, কটুকাটব্য করেছেন এবং গালাগালি দিয়েছেন যে সনাতনীরাও সেটা শিখে নিয়ে সমাজ-সংস্কারকদেরও গালাগালি ফিরিয়ে দিতে শুরু করেছেন, আর এর ফলে সমস্ত ভারতীয় ভাষায় এমন কিছু সাহিত্য রচিত হয়েছে যা জাতির পক্ষে ও দেশের পক্ষে লজ্জাজনক। এই পথে সংস্কার আসতে পারে না এবং দেশের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।[১৫]

বিবেকানন্দ অভিযোগ করেন যে সমাজ-সংস্কারকরা শুধুমাত্র উচ্চ-বর্ণ ও উচ্চশ্রেণীর লোকদের মধ্যেই কাজ করেছেন, আসল জনগণকে স্পর্শও করতে পারেন নি। তিনি বলেন যে সংস্কারপন্থীরা বিধবা বিবাহ নিয়ে যত আন্দোলন করেছেন অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য তত করেন নি—অথচ বিধবা বিবাহ উচ্চবর্ণের লোকদের সমস্যা, অস্পৃশ্যতা জনতার সমস্যা। তিনি বলেন যে সংস্কারকরা গত শতাব্দীতে যে-সব কাজ করেছেন তা শুধুমাত্র দুটি উচ্চবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাঁদের প্রয়াস ছিল নিজেদের ঘর পরিষ্কার করা যাতে বিদেশীদের চোখে তারা নিজেদের সুদর্শন করে তুলতে পারেন। বিবেকানন্দের মতে এ জাতীয় প্রয়াস কোন সংস্কারই নয়। তিনি সংস্কারকদের উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন জনতার মধ্যে কাজ করার জন্য. "Go down to the basis of the thing, to the very roots. That is what I call radical reformation. Put the fire there and let it burn upwards and make an Indian nation."[১৬]

বিবেকানন্দ সংস্কারের সাফল্যের আশা করতেন একমাত্র জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যমে।[১৭] ১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন আর এই মিশনের বা মঠের মূলনীতির মধ্যেই উল্লিখিত ছিল যে শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই সমাজ-সংস্কার সম্ভব হবে। মঠের নীতিতে বলা হয়েছিল, "The first and foremost task in India is propagation of spirituality and education among the masses."

ক্ষুধার্ত মানুষকে অন্ন না দিলে তার পক্ষে আধ্যাত্মিকতা সম্ভব নয়। সুতরাং মঠবাসীদের প্রধানতম কর্তব্য হল খাদ্য সরবরাহের নূতনতর পথ খুঁজে বার করা। মঠবাসীদের সমাজ-সংস্কারের দিকে খুব বেশী মনোনিবেশ করার প্রয়োজন নেই, কারণ সামাজিক পাপ হল সমাজ-দেহের ব্যাধির মতো এবং শিক্ষা এবং খাদ্যের দ্বারা যদি সেই দেহকে পরিপুষ্ট করা যায় তাহলে পাপ নিজে থেকেই অপসারিত হবে।[১৮]

বিবেকানন্দ ছিলেন কর্মযোগী আর তাই তিনি নিজেকে ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য অবিরাম কর্মপ্রবাহে ডুবিয়ে রাখতেন। আমেরিকাতে তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল 'দি সাইক্লোনিক হিন্দু'। অজস্র বক্তৃতা এবং ধর্ম ও সামাজিক বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ ও গ্রন্থের মাধ্যমে বিবেকানন্দ তাঁর মতবাদ প্রচার করেন। আর তিনি যে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা শুধু ধর্ম ও শিক্ষা প্রচার করেই ক্ষান্ত হয় নি, নানাবিধ সমাজসেবামূলক কর্মেও এই প্রতিষ্ঠান সর্বদা তৎপর ছিল।

সমাজসেবার কাজ করার জন্য বিবেকানন্দ দেশের মধ্যে একটা নূতন সাড়া তোলেন। পশ্চিমের বিভিন্ন সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কর্মপদ্ধতিতে বিবেকানন্দ আকৃষ্ট হয়েছিলেন[১৯] এবং তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রায়ই বলতেন শুধু নিজের মুক্তি না খুঁজে সমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে। গোড়ার দিকে তাঁর কিছু কিছু শিষ্য এই বলে আপত্তিও তোলে যে সমাজসেবা হোলো পশ্চিমী ধারণা, ভারতীয় সন্ন্যাসী শুধু ব্যক্তিগত মোক্ষের সাধনা করবে।[২০] কিন্তু বিবেকানন্দ ঘোষণা করেন যে সাধারণ মানুষ ধর্ম চায় না, চায় খাদ্য, আর সেই মানুষই হল সত্যিকার ধর্মাচারী যে সাধারণ মানুষের সেবার জন্য নিজের মুক্তিকেও বলিদান করতে সক্ষম। আমেরিকা থেকে তিনি তাঁর শিষ্যদের একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "So long as the millions live in hunger and ignorance, I hold every man a traitor, who having been educated at their expense, pays not the least heed to them".[২১]

বিবেকানন্দ মিথ্যা প্রিয়ভাষণে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি নিষ্ক্রিয় ধার্মিকতা ও অলস ধ্যানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আক্রমণ করে বলেন, "Let us throw away all these paraphernalia of worship—blowing the conch and ringing the bell, and waving the lights before the Image... Let us throw away all pride of learning and study of Shastras and all Sadhanas for the attainment of personal Mukti, and going from village to village devote our lives to the service of the poor... and the distressed".[২২]

সময়ে সময়ে বিবেকানন্দ তাঁর কর্মযোগ ও সমাজসেবার আদর্শ রূঢ় কিন্তু আবেগময়ী ভাষায় প্রকাশ করতেন, "কে তোদের রামকৃষ্ণকে চায়? কি হবে তোদের ভক্তি আর মুক্তিতে? কি প্রয়োজন আছে শাস্ত্র কী বলে তা জেনে? যদি আমি আমার তমচ্ছন্ন স্বদেশবাসীদের জাগাতে পারি, যদি তাদের নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে কর্মযোগে দীক্ষা দিতে পারি তাহলে আমি হাসতে হাসতে হাজার নরকে যেতে প্রস্তুত।"[২৩]

বিবেকানন্দ নিজে ঐতিহ্যবাদী ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী হয়েও দেশবাসীকে পশ্চিমী বিজ্ঞান শিখতে ও পশ্চিমী সংস্কৃতির গুরুত্ব স্বীকার করতে বলেছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন যে, হিন্দুধর্মের পতনের অন্যতম কারণই হল যে এক সময়ে অনেক হিন্দুই মনে করেছিলেন যে তাঁরা সমস্ত পৃথিবীকে বাদ দিয়েই চলতে পারবেন[২৪] আর তাই তারা বিদেশযাত্রা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। হিন্দুদের বিদেশযাত্রার বাধা সম্বন্ধে

ব্যঙ্গ করে সাহিত্য-সমালোচক প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন, "আমাদের (ভারতীয়দের) সমুদ্র পেরোলে জাত যায়, আর তোমাদের (ইউরোপীয়দের) যায় না পেরোলে।"[২৫] বিবেকানন্দ হিন্দুদের কালাপানি পার হওয়ার বিধিনিষেধ উপেক্ষা করতে বলেন এবং তিনি নিজেও ইউরোপ-আমেরিকার বহু দেশ ঘুরে ধর্ম প্রচার করেছিলেন।[২৬]

এই পরিভ্রমণের ফলস্বরূপ বিবেকানন্দের প্রতীতি জন্মায় যে পাশ্চাত্য দেশগুলি কয়েকটা বস্তুগত মূল্যমানকে প্রধান স্থান দিয়েছে। তিনি লিখেছিলেন যে প্রাচীন ভারতীয়দের মুখ্য আকাঙ্ক্ষা ছিল মোক্ষলাভ আর পাশ্চাত্যের মানুষদের ছিল ধর্ম আচরণ। ধর্ম আচরণ মানুষকে রাজসিক করে এবং সক্রিয়ভাবে সুখের অন্বেষণে অনুপ্রাণিত করে।[২৭] অন্যদিকে মোক্ষানুসন্ধানীদের পার্থিব সুখের জন্য বা বৈষয়িক ক্রিয়া-কর্মের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থাকে না, কেননা তাদের মতে পার্থিব সুখ স্থায়ী হতে পারে না এবং জীবাত্মার স্বর্গীয় সুখ আসে দেহবন্ধনের মুক্তির পর। বিবেকানন্দ বললেন যে যদিও মোক্ষ ধর্মের চেয়ে উচ্চতর সাধনা, তবু কোনো ব্যক্তি একমাত্র ধর্মাচরণের শেষেই মোক্ষ পেতে পারে। পৃথিবীকে ভোগ করার পরই ত্যাগ করা সম্ভব।[২৮]

বিবেকানন্দের মতে সমসাময়িক ভারতবর্ষে যাঁরা বলতেন যে তাঁরা পার্থিব সাফল্য চান না, কারণ তাঁরা আত্মিক সাধনায় ব্যাপৃত, তাঁদের বেশীর ভাগই ছিল আসলে অলস, অক্রিয় ও তামসিক।[২৯] তাঁদের না ছিল ভারতীয় সাত্ত্বিক গুণ, না ছিল ইউরোপীয়দের রাজসিক গুণ। বিবেকানন্দের মতে তৎকালীন ভারতীয়দের সাত্ত্বিক ভারতবর্ষ গড়ার স্বপ্ন ব্যর্থ হতে বাধ্য। প্রথমে ভারতীয়দের ইউরোপের মতো রাজসিক হয়ে ওঠা দরকার। ভারতীয়দের উচিত মার্কিনী বা ইউরোপীয়দের মতো স্বাধীন, আত্মনির্ভর ও প্রগতিশীল কর্মযোগী হওয়া।[৩০] তা হতে পারলে পরে মোক্ষসাধনের চিন্তা করা যেতে পারে।

অলস ভারতীয় যুবকদের শক্তির দরকার। তাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিবেকানন্দ বললেন, "গীতা পড়ার চেয়ে ফুটবল খেললে তোরা আগে স্বর্গে যাবি।"[৩১] 'Indian Nationalism and Hindu Social Reform' গ্রন্থে Charles H. Heimsath লেখেন যে কর্মযোগের সপক্ষে বিবেকানন্দের এই জাতীয় মতবাদ ও আন্দোলন "was possibly of more far-reaching benefit to Indian society than that of any single reformer in the national movement, although it was much less than he might have accomplished if ill health had not begun to plague him following his return to India".[৩২]

অস্পৃশ্যতার প্রথাকে কঠোর আক্রমণ করে বিবেকানন্দ বলেন যে ভারতবর্ষে ধর্ম কেবলমাত্র স্পর্শকাতরতায় পর্যবসিত হয়েছে। যদি কোন বিদেশী অথবা খ্রীষ্টান মিশনারী বিবেকানন্দের মতো ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে এইরূপ কঠিন মন্তব্য করতেন অথবা সাধারণ ভারতীয়দের তামসিক এবং সাধারণ ইউরোপীয়দের রাজসিক আখ্যা দিতেন, তাহলে হয়ত প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিত, কিন্তু বিবেকানন্দের কাছ থেকে দেশবাসী

বহু ভর্ৎসনা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল কারণ তারা জানত যে দেশবাসীর ওপর বিবেকানন্দের আস্থা অসীম এবং ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতায় তাঁর শ্রদ্ধা অটল।

বিবেকানন্দ স্বদেশবাসীকে পাশ্চাত্যের কাছ থেকে আধুনিক বিজ্ঞান-পদ্ধতি[৩৩] ও মুক্ত সমাজ সংগঠনের ধারা শিক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৩৪] তিনি বলতেন যে অতীতে ভারতে যদিও ধর্ম-সাধনায় ব্যাপক স্বাধীনতা ছিল, তবু সামাজিক ব্যাপারে অনমনীয়তার জন্য সমাজ পঙ্গু ও অনড় হয়ে পড়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভারতবর্ষের ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলে এই অচলায়তনের অবসান হবে। তাঁর মতে ইংরেজ শাসনের একটা লাভ এই ছিল যে উচ্চবর্ণের লোকেরা তাঁদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বরাবরের জন্য আর কায়েম করে রাখতে পারবে না।[৩৫]

যদিও বিবেকানন্দ প্রকাশ্যভাবেই স্বীকার করতেন যে ভারতবর্ষ পাশ্চাত্যের কাছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যা শিক্ষা করবে, তবুও এটাও তাঁর বিশ্বাস ছিল যে ভারতবর্ষ যদি তার ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা হারিয়ে ফেলে তাহলে সে হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়বে। তিনি বলতেন, ভারতবর্ষের হৃদয় ধর্মের মধ্যে সংবদ্ধ।[৩৬] তাঁর মতে ইংরেজদের মৌলিক আকর্ষণ অর্থনীতিতে, ফরাসীদের রাজনীতিতে, আর ভারতবাসীদের ধর্মে। ইংরেজরা তাদের রাজাকে বাধা দিয়েছিল যখন রাজা তাদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করতে চেয়েছিলেন, ফরাসীরা বিদ্রোহ করেছিল যখন রাজা তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছিলেন, আর ভারতীয়রা তাদের রাজার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল যখন রাজা জনগণের ধর্মে আঘাত করেছিলেন।[৩৭] পাশ্চাত্যের মানুষ রাজনীতিতে আগ্রহী, তাই আমেরিকাবাসীরা হয় ডেমোক্র্যাটিক নয় রিপাবলিক্যান দলের সমর্থক, ইংল্যাণ্ডের লোকেরা হয় রক্ষণশীল নয় প্রগতিশীল দলের সমর্থক, কিন্তু ভারতীয় কৃষক-সমাজ যদিও রাজনীতিতে অজ্ঞ, তারা ধর্মে আগ্রহী। বিবেকানন্দ বলতেন যে রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ ভারতীয় কৃষকের ধর্ম সম্বন্ধে যে জ্ঞান আছে তা সাধারণ ইউরোপীয় বা মার্কিনীর থেকে অনেক বেশী।[৩৮] তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ভারতীয়দের ঐতিহাসিক নিয়তি হলো ধর্ম-কেন্দ্রিক জাতি হয়ে ওঠা, তাই পাশ্চাত্যের অনুকরণে ভারতে কেবলমাত্র রাজনীতিকেন্দ্রিক জাতীয়তা সৃষ্টি করার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।[৩৯]

কিন্তু বিবেকানন্দের মতবাদ ভারতীয়দের স্বকীয় কৃষ্টি ও ধর্মেই কেবল শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনে না, সেই সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক জাতীয়তার অনুভূতিকেও শক্তিশালী করে তোলে। যদিও বিবেকানন্দ দৃঢ়ভাবে বলেন যে তিনি কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন বা প্রচারের নেতা নন,[৪০] তবুও তাঁর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে অরবিন্দ ঘোষ যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলেন সেটা কিছুমাত্র আশ্চর্যের বিষয় নয়।

বিবেকানন্দ মনে করতেন যে যতদিন না মানুষের চরিত্রে ধার্মিক বা আধ্যাত্মিক উত্তরণ ঘটছে ততদিন মানুষের সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না। তিনি বলেছিলেন, যদিও পশ্চিমের মানুষ শিল্পে ও বাণিজ্যে

প্রচুর দক্ষতা অর্জন করেছে তবুও তারা সুখী ও সুসমঞ্জস সমাজ গড়ে তুলতে অপারগ হয়েছে; এবং তার কারণ হচ্ছে যতক্ষণ মানুষ মূলতঃ আত্মকেন্দ্রিক এবং অন্য সব কিছুর ওপরে অর্থ ও শক্তির জন্য আগ্রহী থাকবে ততদিন তাদের পারস্পরিক বস্তুগত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধতে বাধ্য। মানুষ তখনই সুখী ও সংহত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে যখন তারা এই বৈদান্তিক সত্য উপলব্ধি করবে যে, সব মানুষের আত্মাই ঈশ্বরের স্বরূপ, আর সেই কারণে সব মানুষের মধ্যেই ঐক্য বিরাজমান।[৪১] বিবেকানন্দ বলতেন, বহু পশ্চিমের মানুষ তাদের ধর্মের মধ্যে নিজেদের আত্মিক সন্দেহের সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না, আর তাই তারা সাগ্রহে বৈদান্তিক সত্যের শিক্ষার জন্য প্রতীক্ষা করে আছে।[৪২]

উনবিংশ শতাব্দীতে জর্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার বেদের এক অস্পষ্ট পারসী অনুবাদের ভিত্তিতে এক ফরাসী কর্তৃক লাটিন অনুবাদ পাঠ করে বলেন যে বেদ হচ্ছে "the fruit of highest human knowledge and wisdom", আর উপনিষদ্ হল শতাব্দীর বৃহত্তম আবিষ্কার।[৪৩] তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "In India our religions will never take root . On the contrary, Indian philosophy . will produce a fundamental change in our knowledge and thought".[৪৪]

শোপেনহাওয়ার, ম্যাক্সমূলার প্রমুখদের ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের প্রতি যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল তাই থেকে বিবেকানন্দের ধারণা জন্মায় যে ভারতীয় ধর্ম-সাহিত্যের আবিষ্কারে ইউরোপে একটি বিরাট ও সুদূরপ্রসারী চিন্তার বিপ্লব সংগঠিত হবে, যে বিপ্লব একমাত্র তুলনীয় গ্রীক সাহিত্যের আবিষ্কারের ফলে ইউরোপে যেরূপ বিপ্লব হয়েছিল তার সাথে।[৪৫] ভারতীয় সম্রাট অশোক মানুষকে জয় করতে চেয়েছিলেন সৈন্য দিয়ে নয়, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা দিয়ে; আধুনিক ভারতের আদর্শ হবে, বিবেকানন্দের মতে, অশোকের মত ধর্মের জয়। অশোকের সময় পরিবহণ ও যাতায়াতের অসুবিধা ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার বিশ্বপ্রসারের পথে বাধাস্বরূপ ছিল, কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য জাতি পরিবহণ-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে এবং সেই কারণে অশোকের আমলে ভারতীয় ভাবধারা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার পথে যে বাধা ছিল তা অপসারিত হয়েছে।[৪৬] ভারতীয়দের প্রতি বিবেকানন্দের বাণী ছিল, "Up, India, and conquer the world with your spirituality".[৪৭] বিবেকানন্দ অনুভব করতেন যে সেদিন আসছে যেদিন প্রাচীন ভারতবর্ষ তার মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করবে সমস্ত পৃথিবীতে আধ্যাত্মিকতার প্রসার ঘটিয়ে। কিন্তু বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে কোনো "ঈশ্বর প্রেরিত দূত" বলে দম্ভ করতে নিষেধ করেন এবং যদিও তিনি মনে করতেন যে ভবিষ্যৎ চিন্তাশীল মানুষের মতবাদের ভিত্তিই হবে বেদান্ত, তবুও তিনি তাঁর অনুগামীদের উপদেশ দিয়েছিলেন সব মানুষের ধর্মকেই শ্রদ্ধা করতে এবং কারুর ওপর কোনো বিশ্বাস চাপিয়ে না দিতে।

বিবেকানন্দ কিন্তু তাঁর নিজের দরিদ্র, যন্ত্রণাহত দেশবাসীর কাছে কেবলমাত্র ও প্রধানতঃ পারলৌকিক ধর্মের কথা বলেন নি। ● ভারতীয়

জনগণের দারিদ্র্য ও যন্ত্রণা বিবেকানন্দকে উদ্বেল করে তুলত, তাই তিনি মনে করতেন যে সত্যিকার ধার্মিক মানুষের প্রধান কর্তব্য হল এইসব পদানত অত্যাচারিত মানুষের সেবা। এই সেবাকর্মে বিবেকানন্দ পরবর্তী কালের গান্ধীর পূর্বসূরী।

বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছিলেন যে ঈশ্বর বুভুক্ষু জনতাকে অন্ন দিতে পারে না সেই রকম ঈশ্বরে বিশ্বাসী হওয়ার চেয়ে তিনি নাস্তিক থাকবেন। ১৮৯৪ সালে শিকাগো থেকে মহীশূরের মহারাজাকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলেন, "The one thing that is at the root of all evils in India is the condition of the poor . . . Priest-power and foreign conquest have trodden them down for centuries, and at last the poor of India have forgotten that they are human beings. They are to be given ideas ; their eyes are to be opened to what is going on in the world around them, and then they will work out their own salvation".[৪৮] তাঁর কাছে দরিদ্র মানুষমাত্রেই ছিল 'দরিদ্র নারায়ণ'। "The only God that exists, the only God in whom I believe . . . My God, the miserable, my God the poor of all races".

বিবেকানন্দের এই দৃপ্ত বাণী গান্ধীর মধ্যে পুনঃপ্রচারিত হয়। এইভাবেই অবহেলিত শ্রেণী ও বর্ণের সেবার সঙ্গে ধর্মচিন্তার মিলন সংঘটিত হয়। বিবেকানন্দ ও গান্ধী স্বদেশবাসীকে সেবাদর্শনে নূতন দীক্ষা দেন। নিষ্ঠাবান ভারতীয়দের মনে এই নূতন আদর্শ এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাদের সামনে দুর্ভিক্ষ, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড বা মড়কে সেবাকর্ম এক মহান আদর্শ হয়ে ওঠে। তাই এই শতাব্দীতে বহু সেবাশ্রম ও সেবা-সমিতি গড়ে ওঠে। এই সেবা-আন্দোলনের মাধ্যমে চিন্তাসর্বস্ব ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মবিশ্বাসের মূলে আঘাত হানা সম্ভব হয়েছিল। অশিক্ষিত সরল সাধক রামকৃষ্ণ, যিনি পাশ্চাত্য চিন্তা বা কার্ল মার্কসের নামও শোনেন নি, তিনি তাঁর ঘরোয়া ভাষায় বললেন, "খালি পেটে ধর্ম হয় না"। "মানুষ ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় রূপ, আর মানুষের পূজাই পৃথিবীর সেরা পূজা," "ধর্মের নিগূঢ় অর্থই হল মুমর্ষের জন্য নিজের প্রাণ দিতে পারা,"—রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের এইসব বাণী ভারতীয় চিত্তে বিপ্লব এনে দিল। এইভাবে নূতন যুগের নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হল, যার মূলকথা ছিল দরিদ্রকে অন্নদানের জন্য কর্মযজ্ঞে ব্যাপৃত থাকতে হবে এবং তার জন্যে ব্যক্তিগত মুক্তিসাধনাকে উপেক্ষা করতে হবে।

মানবিক ধর্ম ও রাজনৈতিক সক্রিয়তা

ভগবদ্‌গীতা ও পরবর্তী কালে রামানুজ, রামানন্দ ও অন্যান্যদের মধ্যে যে নীতিনিষ্ঠ জীবনবাদ ব্যাখ্যাত হয়েছিল তা উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে, ভারতবর্ষ যখন পাশ্চাত্যের মানবতাবাদী কর্মচিন্তার সংস্পর্শে এল, তখন পরিবর্ধিত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বহু লোককে বৌদ্ধযুগে এই জগৎকে দুঃখময় বলে তার বাইরে নির্বাণ খুঁজতে এবং মধ্যযুগে শঙ্কর বেদান্তের মধ্যে এই মায়াময় জগতের বাইরে মুক্তি খুঁজতে প্রেরণা যুগিয়েছিল, কিন্তু উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে আধুনিক পরিবহণ, আদানপ্রদান, ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার ফলে যখন ভারতবর্ষে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হল তখন আর জীবনের দুঃখময় দিকটার দিকে জোর না দিয়ে উপনিষদের বৃহদংশে যে আশাবাদী বাণী ও ভগবদ্‌গীতায় যে নিষ্কাম কর্মের আদর্শের কথা বলা হয়েছে, তার উপরই জোর দেওয়া হল।

ভারতীয় সভ্যতার বিভিন্ন যুগে মুক্তি ও পুনর্জন্ম থেকে অব্যাহতি পাবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে বেশ আধিপত্য করেছে, কিন্তু আধুনিক ভারতীয় চিন্তায় তার গুরুত্ব অনেক কমে গেছে।

"মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে
আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন প'রে বাঁধা সবার কাছে।"[১]

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"[২]

এ কথা আধুনিক ভারতবর্ষের দার্শনিক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠে উচ্চারিত।

রামানুজ ও রামানন্দের ঐতিহ্যের উত্তরসূরী আধুনিক কালের রামমোহন রায় উপনিষদের মধ্যে এমন এক নৈতিক বাণী খুঁজে পান যা ঘোষণাকরে যে মানুষের সেবাই হচ্ছে প্রকৃত পূজা। এমনকি রামকৃষ্ণ, যিনি নিজে সর্বোচ্চ ধর্মীয় নৈর্ব্যক্তিক সমাধিতে পৌঁছেছিলেন, তিনিও তাঁর প্রিয়তম শিষ্য বিবেকানন্দকে সমাধি না খুঁজে মানুষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ ও তাঁর মতাবলম্বী লোকেরা ভারতবর্ষকে তাঁদের কর্মযোগের দ্বারা চিন্তাসর্বস্ব ধ্যানের চোরাবালি থেকে উদ্ধার করেছিলেন। বিবেকানন্দ যে শিক্ষা প্রচার করেছিলেন তার সারকথা হল, চরম সত্তার সঙ্গে মানবাত্মার ঐক্য ঘোষণা আর এই ঐক্য আসবে নিষ্ক্রিয় চিন্তার মধ্য দিয়ে নয়, আসবে আত্মবিমুখ সমাজসেবার মাধ্যমে। এই মহৎ সন্ন্যাসী কোন রহস্যময় আনন্দলোকে আশ্রয় খোঁজেন নি, তিনি অনুপ্রেরণা পেয়েছেন কর্ম-যজ্ঞের ভেতর এবং তিনি তাঁর স্বদেশবাসীকে কর্মশক্তিতে পাশ্চাত্যেরও পাশ্চাত্যতর হয়ে উঠতে উদ্বুদ্ধ করেন। বিবেকানন্দের আহ্বানে

ভারতীয় তপস্যার শান্ত সরোবর বাঁধ ভেঙে সক্রিয় সমাজসেবার অজস্র স্রোতস্বিনী-ধারায় প্রবাহিত হয়।

বিবেকানন্দ বলেন, "What our country now wants are muscles of iron and nerves of steel, gigantic wills, which nothing can resist"। তিনি এক বাস্তব বেদান্ত প্রচার করলেন। শঙ্কর বেদান্ত নয়, যা অন্ততঃ একশ্রেণীর লোকের মতে নিষ্ক্রিয়তার শাস্ত্র হয়ে উঠেছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'চরৈবেতি' সাধনা ও বৈদিক শাস্ত্রের কথা, যে কর্মযোগী মানুষেরই সমৃদ্ধি হয় এবং কর্মহীনের বিনাশ হয়, তা বিবেকানন্দের সৃষ্টিশীল জীবনে মূর্ত হয়ে ওঠে। তাঁর কাছে জীবন হল কর্ম এবং তিনি প্রচার করলেন কর্ম ও সমাজসেবার গীতা। এই গীতা সারা বিশ্বে প্রচারের জন্য তিনি স্বদেশবাসীকে আহ্বান জানান। তিনি বললেন, "We have to conquer the world. That we have to do . India must conquer the world and nothing less than that is my ideal. .The sign of life is expansion, we must go out, expand, show life or degrade, fester and die"

এই আধুনিক ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগে প্রাচীন ধর্মীয় আচার-আচরণকেও মানবিক অর্থে অর্থপূর্ণ করে তোলা হল। প্রাচীন যজ্ঞাচার, যা ছিল দেবতাদের তুষ্টির জন্য অগ্নিতে ঘৃতাহুতি, তাও সমাজসেবার নূতন আদর্শে নূতন ব্যঞ্জনা পেল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'যজ্ঞকথা' গ্রন্থে যজ্ঞকে সক্রিয় সমাজসেবা ও জনহিতকর নীতি-আচরণ বলে ব্যাখ্যা করলেন। রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, ত্যাগ হল স্বার্থবিমুখতা, কৃচ্ছ্রসাধন বা সন্ন্যাস নয়, কারণ ধর্মাচরণের জন্য মানুষকে নিষ্ক্রিয় হতে হয় না, শুধু সকল ক্রিয়াকে স্বার্থহীন করতে হয় অর্থাৎ "there would be production without profit, action without self-assertion"

রামেন্দ্রসুন্দরের 'যজ্ঞ' সম্বন্ধে এই মতামত ও ব্যাখ্যা কিন্তু বিখ্যাত বাংলা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল। বঙ্কিম ছিলেন স্পষ্টবাদী, যুক্তিশীল। বঙ্কিমচন্দ্র সেই ধর্ম প্রচার করতে চেয়েছিলেন যার সারকথা হল মানবতা আর যার আচার হল সমাজসেবা। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু পুরাতন যজ্ঞের মধ্যে বাহ্যিক আচার ও নিবেদন ছাড়া আর কিছু দেখতে পান নি। যা হোক, আধুনিক কালের সক্রিয় মানবতাবাদের সঙ্গে যজ্ঞকে মিলিয়ে দেবার জন্যই রামেন্দ্রসুন্দর প্রাচীন যজ্ঞের নূতন ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

আধুনিক ভারতে অনেক চিন্তাশীল মানুষই এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে পারলৌকিক দর্শনের পক্ষাঘাতে ভারত উদ্যোগহীন হয়ে পড়েছে এবং তাই প্রত্যেক ভারতীয়েরই কর্তব্য হবে সক্রিয়তার জীবন-দর্শন প্রচার করা। ১৯১৯ সালে চরমপন্থী নেতা লাজপৎ রায় মন্তব্য করেন, ভারতীয় জাতীয় দুর্বলতার কারণ হল পারলৌকিক জীবনে অত্যধিক বিশ্বাস। যাঁরা সাধু, তপস্বী ইত্যাদিদের গুণকীর্তন করতেন, লাজপৎ রায় তাঁদের কঠিন সমালোচনা করেন।[৩] তিনি ইংরেজী শিক্ষাকে স্বাগত জানান এই বলে যে এই শিক্ষার প্রভাবে ভারতীয়রা সাধু হওয়ার অসারতা

বুঝতে পারবে। তিনি বলেন, প্রত্যেক আধুনিক ভারতীয় সংস্কারকের উচিত হবে জীবনের বাণী ও মানবতার গৌরব প্রচার করা এবং মাত্রাতিরিক্ত ত্যাগ ও তপশ্চারণের বিরোধিতা করা। তিনি বলতেন, ভারতীয়দের আরও বেশী করে পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদের সংস্পর্শে আনতে হবে।[৪]

ভারতীয় সাধু ও তপস্বীদের ওপর তীব্র আক্রমণ করেন বিপ্লবী হরদয়াল। ১৯১২-১৯১৩ সালে আমেরিকা থেকে পাঠানো 'মডার্ন রিভিউ" পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি এই বিষয়ে তাঁর মতবাদ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বলেন যে আধুনিক জগতে ইউরোপীয়রা যে প্রচণ্ড উন্নতি করেছে তা কোন ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার জন্য নয়---তা তাদের বৈজ্ঞানিক মনোভাবের জন্য। বিজ্ঞানের সামান্য উন্নতি সমগ্র পাশ্চাত্য জনসাধারণের মধ্যে যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য এনেছে তা পুরো মধ্যযুগের দর্শন ও শুচিতা আনতে পারে নি।[৫] মানুষের ব্যাধি নিরাময় করতে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান যা করেছে তার কিছুমাত্র মধ্যযুগে শুচিতা, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, আর গীর্জার ঘন্টা বাজানো দিয়ে সম্ভব হয় নি। বৈজ্ঞানিক পাস্তর ধর্মপ্রাণ সেন্ট ফ্রান্সিস, সেন্ট ডোমিনিক বা মধ্যযুগের অন্যান্য সাধুদের মতো ধর্মশীল ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষের উপকার ধর্মযাজকদের চেয়ে অনেক বেশী করেছে।[৬]

সংস্কৃত বা পারসী শিখে সময় নষ্ট না করে হরদয়াল শিক্ষিত ভারতীয়দের কোন একটি ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা করতে বলেন।[৭] পুরী, বারাণসী ইত্যাদি ভারতীয় তীর্থে না গিয়ে ভারতবাসীদের তিনি লণ্ডন, প্যারী, বার্লিন, জেনিভা ইত্যাদি কেন্দ্রে তীর্থযাত্রা করতে অনুরোধ করেন।[৮] তাঁর দুঃখ ছিল যে আধুনিক কালেও কিছু কিছু ভারতীয় পশ্চিমের বিজ্ঞানচর্চা না করে, ধ্যান, সমাধি, পূজা, তীর্থভ্রমণ ইত্যাদিতে শক্তিক্ষয় করছিল। তার ক্ষোভ এই ছিল যে ভারতীয়রা তখনও বৈজ্ঞানিকদের অধিক সম্মান না দেখিয়ে ধার্মিকদের নিয়ে মাতামাতি করছিল। তাঁর মতে ঋষি রামকৃষ্ণের চেয়ে রাজনীতিক অরবিন্দ মহত্তর।[৯] একজন পরিপূর্ণ মানুষকে শুধু নিঃস্বার্থ ও ঋষিতুল্য হলেই চলবে না, তাঁকে প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন হতে হবে। হরদয়াল বিশ্বাস করতেন যে ভারতের প্রয়োজন রামকৃষ্ণ বা রামতীর্থের মতো আধ্যাত্মিক ঋষির নয়, তার প্রয়োজন জগদীশচন্দ্র বসু, তিলক প্রভৃতির মত বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের। হরদয়াল পার্থিব সমস্যাকে এত গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং আধ্যাত্মিকতাকে এত অবজ্ঞা করতেন যে তিনি এ কথাও বলেছিলেন, "There was more wisdom in one of Tilak's political speeches than in all the Upanishads"[১০]

হরদয়াল ভারতীয়দের ধর্ম ও দর্শনচর্চা ত্যাগ করে পাশ্চাত্যের প্রকৃতি ও সমাজ-বিজ্ঞান পাঠ করতে বললেও, ভারতের চরমপন্থী নেতারা মনে করতেন যে ভারতবর্ষে রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ধর্ম বাদ দিয়ে গড়ে উঠবে না, এবং ধর্মের মধ্যে যে প্রবল শক্তি আছে তাকেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে। হরদয়াল বলেছিলেন

যে তিলকের একটি বক্তৃতায় সমগ্র উপনিষদের চেয়ে বেশী জ্ঞান আছে, কিন্তু তিলক নিজে তাঁর কর্মপ্রেরণা পেয়েছিলেন ভগবদ্‌গীতা থেকে। তিলক এবং অরবিন্দের মতো চরমপন্থী নেতারা ভগবদ্‌গীতার ভাষ্য রচনা করে কর্মযোগের প্রেরণা যুগিয়েছেন। পরবর্তী কালে গান্ধীও ভগবদ্‌গীতার ভাষ্য রচনা করেন ও নিষ্কাম কর্মযোগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় মানবতাবাদ অধিকতর গুরুত্ব পেতে থাকে। জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আদর্শ এত প্রকট হয়ে ওঠে যে শিল্পকলাকেও রাজনৈতিক বাস্তবতা থেকে কল্পনালোকে পলায়ন বলে মাঝে মাঝে সমালোচনা করা হয়। রবীন্দ্রনাথ সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকতেন। গান্ধী রবীন্দ্রনাথকে বাঁশী ছেড়ে চরকা ধরতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "I have found it impossible to soothe suffering patients with a song of Kabir". গান্ধী বলেন যে বেকার বুভুক্ষু জনতার কাছে ভগবান কর্মের ও খাদ্যের বেশে এলেই স্বীকৃত হবেন। এটা বিবেকানন্দেরও কল্পনা ছিল; তিনি বলেছিলেন, দরিদ্র নারায়ণের সেবাই ঈশ্বরের আরাধনা।

অতীতে ধর্ম মানুষকে শান্তির পথে নিয়ে গেছে, রাজনৈতিক সক্রিয়তার পথে নয়। কিন্তু গান্ধী বললেন, ধর্মই তাঁকে রাজনীতিতে টেনে এনেছে। এটাও অর্থপূর্ণ যে গান্ধী, যিনি ভারতের ধর্মপ্রেরণার প্রতীক ছিলেন, তিনি নেহেরু, যিনি ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক, তাঁকে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন।[১১] নেহেরু কোন রক্ষণশীল বা ঐতিহ্যগত ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না এবং তিনি মনে করতেন যে সাধারণতঃ "Religion becomes a social quest for God or the Absolute, and the religious man is concerned far more with his own salvation than with the good of society".[১২]

কিন্তু যদিও নেহেরু নিজেকে ধর্মপ্রাণ নয় বলে ঘোষণা করেছিলেন,[১৩] তবু তিনি গীতাকে সক্রিয়তার বাণী বলে স্বীকার করেছিলেন। "The Discovery of India" গ্রন্থে নেহেরু লিখেছিলেন, "The *Gita* deals essentially with the spiritual background of human existence and it is in this context that the practical problems of everyday life appear. It is a call to action to meet the obligations and duties of life, but always keeping in view that spiritual background and the larger purpose of the Universe. Inaction is condemned, and action and life have to be in accordance with the highest ideals of the age, for these ideals themselves may vary from age to age. The *Yugadharma*, the ideal of the particular age, has always to be kept in view".[১৪]

পাশ্চাত্য সমাজবাদী চিন্তায় প্রভাবিত নেহেরু কর্মযোগে বিশ্বাস করতেন। "Act as man of thought and think as man of action," ঘোষণা করেছিলেন বের্গসঁ। "Thought that does not lead to action is

an abortion", বলেছিলেন রোমাঁ রোলাঁ। কর্মবাদী নেহেরু এবং অনেক আধুনিক ভারতীয়রাই এই দুইটি উক্তি বারংবার উদ্ধৃত করেছেন। বস্তুতঃ আর একজন আধুনিক ভারতের নেতা, সুভাষচন্দ্র বসু, মনে করতেন যে গান্ধীদর্শনও যথেষ্ট সক্রিয় নয় এবং তিনি একথাও বলেছিলেন যে শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী-প্রসূত চিন্তাধারা এবং গান্ধীর সবরমতী-প্রসূত চিন্তাধারা এই দুইয়ের মধ্যেই নিষ্ক্রিয়তার কিছুটা লক্ষণ রয়েছে।[১৫]

যে-সব ভারতীয়রা রাজনৈতিক স্বাধীনতা চেয়েছিলেন তাঁরা সকলেই সক্রিয়তার দর্শনে বিশ্বাস করতেন। তাঁদের অনেকেই বলতেন যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন করতে হলে এ দেশেও সক্রিয়তার কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। কর্মযোগ শুধু জাতীয়তাবাদীরাই নয়, সমাজবাদীরাও প্রচার করেছেন। মার্কসীয় দর্শন, যা ঘোষণা করে যে চিন্তা ও কর্ম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং দর্শনশাস্ত্রের বিশ্বকে শুধু ব্যাখ্যা করলেই চলবে না, বিশ্বকে পরিবর্তন করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে, তা ভারতীয় সমাজবাদী ও সাম্যবাদীদের প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করেছিল।

১৯৪৭ সালে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় নেতারা দ্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে ভারতীয়দের আরও সক্রিয় হতে হবে এবং ভারতবাসীদের তথা সমগ্র এসিয়াবাসীদের, বিশ্বের রাজনীতিতে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। ১৯৪৭ সালের ৮ই নভেম্বর নেহেরু ঘোষণা করলেন, "For long periods Asia performed a very great function in the world in many ways, culturally of course, but even in regard to mechanical appliances, and processes of manufacture. Then it kept static, unmoving, unchanging and naturally it fell back. For 300 years or so it played no vital role in world history. The static period of Asia has ended and it was again on the verge of playing a vital and dynamic role." ১৯৪৯ সালের ৩১শে অক্টোবর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতায় নেহরু এশিয়ার ভূমিকা সম্বন্ধে বলেন, "A change of supreme importance has now come over the world scene and this is the renaissance of Asia Perhaps, when the history of our times comes to be written, the re-entry of this old continent of Asia—which has seen so many ups and downs —into world politics will be the most outstanding fact of this and the next generations"[১৬].

তিলক ও চরমপন্থী আন্দোলন

ম্যাট্‌সিনির অনুগামীরা বোধ হয় অস্ট্রিয়ানদের চেয়েও কাভুরের অনুগামীদের বেশী ঘৃণা করতেন। কংগ্রেসেও তেমনি যখন, ১৯০৭ সালে, সুরাটে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যেকার বিরোধ প্রকাশ্য হাতাহাতির রূপ নিল, তখন চরমপন্থীরা বোধহয় ইংরেজদের চেয়েও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, গোখলে ও অন্যান্য নরমপন্থীদের সম্বন্ধে বেশি অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন। সুরাট কংগ্রেসে এই মতবিরোধ জুতো ছোঁড়াছুড়ির মধ্যে দলে ভাঙন নিয়ে এলো। ১৯০৭ সালের ২৭শে নভেম্বরে এই সংঘর্ষ ঘটে এবং 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান'-এর প্রতিনিধি হেনরী নেভিনসন্ ঘটনাটি এইভাবে বর্ণনা করেছিলেন, "হঠাৎ কী যেন শূন্যে ছুটে গেল, এক পাটি জুতো, মারাঠা জুতো, লাল চামড়ার ছুঁচলো মুখ এবং তলায় সিসে মারা। সেটা গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর গালে লাগলো আর ছিটকে পড়লো স্যার ফিরোজশা' মেটার গায়ে। জুতোটি ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাগড়ি মাথার সাদা ঢেউ মঞ্চের ওপর ভেঙে পড়ল। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ক্রোধের হুঙ্কারে তারা নরমপন্থী-দেখতে যে-কোনো মাথার ওপর লাঠি মারতে থাকে এবং তার পর মুহূর্তে সবুজ রঙের টেবিলের পাশে দাঁড়ানো অসংখ্য বাদামী রঙের পায়ের ফাঁকে আমি দেখলাম ভারতের জাতীয় কংগ্রেস খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়ছে।"[১]

ভারতীয় চরমপন্থী জঙ্গী জাতীয়তাবাদীদের কাছে ম্যাট্‌সিনির নাম এক বিরাট্ অনুপ্রেরণা জাগাত। ম্যাট্‌সিনির রচনা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয় এবং ভারতীয় লেখকরা তাঁর জীবনীগ্রন্থও প্রকাশ করেন। চরমপন্থী নেতা লাজপৎ রায় ম্যাট্‌সিনির একটি জীবনী রচনা করেন। তাঁর আত্মজীবনীতে লাজপৎ রায় বলেন, "আমি স্থির করি যে সারা জীবন ম্যাট্‌সিনির শিক্ষায় আমি আমার দেশের সেবা করব। আমি ম্যাট্‌সিনিকে আমার গুরুদেব বরণ করি এবং আজও তাই করে চলেছি. . আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ম্যাট্‌সিনির জীবনী পাঠ করেছি এবং কয়েক বৎসর পূর্বে যখন বাবু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর ম্যাট্‌সিনি সম্পর্কিত বক্তৃতা পড়েছিলাম তখনও অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। এই মহান ইতালীয়ের প্রগাঢ় জাতীয়তাবাদ, বিপদ ও দুঃখবরণ, আত্মিক এবং মানবিক সহানুভূতি আমাকে মুগ্ধ করে।" পরে মারাঠী চরমপন্থী বিপ্লবী বিনায়ক সাভারকার মারাঠী ভাষায় ম্যাট্‌সিনির একটি জীবনী রচনা করেন এবং তা তৎক্ষণাৎ বোম্বাইয়ে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রথম বাংলায় ম্যাট্‌সিনির রচনার অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন এবং বাঙলার যুবসম্প্রদায়ের কাছে তিনি ম্যাট্‌সিনিকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। ইতালীয় 'রিসর্জিমেন্টো'-র ইতিহাস নিষ্ঠাসহকারে পঠিত হতে লাগল আর 'ইয়ং ইতালী'-র আদর্শে বাঙলায় "ইয়ং বেঙ্গল" নামে একটি সমিতির সূচনা ঘটল। 'ইতালীয়দের জন্য ইতালী' এই দাবির অনুসরণে এঁদের দাবি হল 'ভারত ভারতীয়দের জন্য'।

নরমপন্থী সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী দেশবাসীকে ম্যাট্‌সিনির স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হতে বললেন কিন্তু তাঁর বিপ্লবের পথ অনুসরণ করতে নিষেধ করলেন। সুরেন্দ্রনাথ ম্যাট্‌সিনির স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে বার্কের মধ্যপন্থার সংমিশ্রণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চরমপন্থীদের কাছে ম্যাট্‌সিনির আদর্শের আবেদন শুধুমাত্র তাঁর দেশপ্রেমের জন্যই নয়, আরও বেশী করে তা তাঁর বিপ্লবী পদ্ধতির জন্য।

ইউরোপীয় বিপ্লব সাহিত্যের সঙ্গে ব্রিটিশ সাংবিধানিক ইতিহাসের মৌলিক পার্থক্য অনুধাবন করার ফলে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের চরিত্রে পরিবর্তন আসতে শুরু হয়। ভারতে চরমপন্থী ভাবাদর্শের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী রাজনৈতিক জীবন ও প্রতিষ্ঠানের আকর্ষণ কমে আসতে শুরু করে, এবং ইংরেজী প্রভাবের বদলে ক্রমেই অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের ও ইউরোপীয় বিপ্লব সাহিত্যের প্রভাব বাড়তে শুরু করে। ব্রিটিশ সাংবিধানিক ইতিহাসের অনুধাবন নরমপন্থীদের মধ্যে "ডোমিনিয়ন স্টেটাস্" সম্বন্ধে এক বিশ্বাস সঞ্চার করেছিল এবং গোখলে বলেছিলেন যে তাঁর স্বদেশপ্রীতির কোনো সীমা নেই কিন্তু তাঁর সমগ্র স্বদেশপ্রীতির উচ্চাশাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে ডোমিনিয়ন স্টেটাস্ লাভের ভেতর দিয়ে পূর্ণ হতে পারে। কিন্তু ইতালীয়দের অস্ট্রিয়ানদের নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত করার কাহিনী ভারতের জঙ্গী জাতীয়তাবাদীদের কাছে পূর্ণ স্বাধীনতার এক নূতন আদর্শ এনে দেয়। পুরাতন নরমপন্থীদের ব্রিটিশ প্রভুত্বের অধীনে স্বকীয় শাসনই লক্ষ্য ছিল, আর নূতন চরমপন্থীদের আদর্শ হল সমস্ত বিদেশী প্রভাবমুক্ত জাতীয় স্বরাজ।

চরমপন্থী আন্দোলনের বলিষ্ঠ নেতা ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬—১৯২০)। পাশ্চাত্যভাবাপন্ন নরমপন্থীদের থেকে তিলক ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিলক তাঁর পিতার কাছ থেকে সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষা পান কিন্তু তাঁর সামনে সব সময়েই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল মারাঠা ইতিহাসের কথা, ইংরেজ শাসনের আগেকার মহারাষ্ট্রের কথা, বিশেষ করে ১৮৫৭—৫৮-র বিরাট অভ্যুত্থানের কথা, যে কথা তিনি শুনেছিলেন তাঁর পিতামহের কাছ থেকে। শৈশবেই তিলকের মধ্যে বিদ্রোহের আকাঙক্ষা ও স্বাধীনতার অভীপ্সা জাগরূক হয়েছিল।

ষোল বছর বয়সে তিলক অনাথ হন। পরে তিলক ও তাঁর সঙ্গীরা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি বিদ্যালয় ও দুটি সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তিলক "ডেকান এডুকেশন সোসাইটি" ও 'ফার্গুসন কলেজ' স্থাপনার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন, কিন্তু পরে গোখলে ও আধারকারের সঙ্গে সমাজ-সংস্কারের প্রশ্নে তিলকের মত-বিরোধ হয়। তিলক ছিলেন একজন জঙ্গী জাতীয়বাদী এবং তিনি মনে করতেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনতে হবে আগে, সমাজ-সংস্কারের কথা হবে পরে। এই ব্যাপারে গোখলে এবং আধারকারের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটে, গোখলে প্রমুখরা বিশ্বাস করতেন সমাজ সংস্কার ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা দুইই সমান প্রয়োজনীয়। এই মতবিরোধের জন্যই তিলক 'ডেকান এডুকেশন সোসাইটি' থেকে ১৮৯০ সালে পদত্যাগ করেন।

এরপর তিলক তাঁর মতবাদ মারাঠী সাপ্তাহিক 'কেশরী' ও ইংরেজী সংবাদপত্র 'দি মারহাট্টা'-র মাধ্যমে প্রচার করতে থাকেন। পাশ্চাত্যভাবাপন্ন নরমপন্থীরা, যাঁরা ভিক্টোরীয় উদারতা ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন, তাঁদের থেকে তিলকের চিন্তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। নরম-পন্থীদের মত রাজনীতি থেকে ধর্মকে সরিয়ে রাখার পক্ষপাতী তিলক ছিলেন না। বরং তিলক মনে করতেন যে ধর্মীয় উৎসব ও আচারের জন্য যেসব জায়গায় হিন্দুরা সম্মিলিত হন সেইসব স্থানই দেশাত্মবোধ প্রচারের সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা। 'কেশরী' এবং 'দি মারহাট্টা'-তে তিলক হিন্দু-দেবতাগণের পূজা জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যান এবং মহারাষ্ট্রের বীর সন্তান শিবাজীর জীবনী ও কর্মধারা সম্বন্ধে প্রচার করতে থাকেন। ধর্মে রাজনীতির অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে তিলকের বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। মারাঠাদের জাতীয় গর্বকে তিলক শিবাজী উৎসবের মাধ্যমে বাড়িয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। শিবাজী উৎসব এবং গণেশ পূজা মুসলমানদের পক্ষে খুব সহজগ্রাহ্য ছিল না, তবুও তিলক হিন্দু ধর্মচেতনাকে এইভাবে স্বদেশাভিযানের পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। আর্যসমাজের নেতা দয়ানন্দ যখন গোহত্যার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন, তিলক তাতেও সমর্থন জানান। হিন্দু দেবতা ও হিন্দু সমর-নায়কদের প্রতি তিলকের এই আনুগত্য রাজনীতিতে এক পরিবর্তন আনে, কিন্তু এইসব মুসলমানদের মধ্যে তিলকের জনপ্রিয়তা বাড়াতে সহায়ক হয় নি।

ইংরেজদের ভারত জয়ের পূর্বেকার ইতিহাস চর্চার মধ্য দিয়ে তিলক শুধু যে মহারাস্ট্রীয়দের রাজনৈতিক চেতনা ও গর্ববোধ বাড়াতে চেয়েছিলেন তাই নয়, তিনি চেয়েছিলেন যাতে রাজনীতিতে জঙ্গী পদ্ধতিরও প্রবর্তন করা হয়। 'কেশরী'-র জঙ্গী মনোভাবাপন্ন ও উত্তেজনামূলক রচনা-গুলি শীঘ্রই ব্রিটিশ সরকারের নজরে পড়ে। ১৮৯৭ সালে পুনাতে দু'জন ব্রিটিশ রাজকর্মচারীর হত্যার পর ব্রিটিশ সরকার তিলকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন যে তিনি 'কেশরী'-র মাধ্যমে রাজদ্রোহ ও হিংসার প্রচার করছেন। এই অভিযোগে তিলকের বিচার হয় এবং আঠার মাসের জন্য কারাদণ্ড হয়।

কারামুক্তির পরেও তিলক স্বদেশী কাজকর্ম চালিয়ে যেতে থাকেন। এই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আসতে শুরু হয়েছিল এবং ১৯০৫ সালে বাঙলায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মাধ্যমে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় চরমপন্থী আন্দোলন জোরদার হয় এবং স্বরাজের দাবী উচ্চারিত হয়। তিলক এবং অন্যান্য চরমপন্থী নেতারা অসহযোগ ও সক্রিয় আন্দোলন করার নীতি প্রচার করতে থাকেন এবং নরমপন্থীদের 'রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি'র নীতিকে আক্রমণ করতে শুরু করেন। নরম ও চরমপন্থীদের বিরোধ ক্রমেই বাড়তে থাকে এবং ১৯০৫ সালে ইংল্যাণ্ড থেকে দাদাভাই নৌরজীকে কংগ্রেস সভাপতিত্ব করার জন্য নিয়ে আসা হয় যাতে এই বিরোধ মিটিয়ে ফেলা যায়। দাদাভাইয়ের চেষ্টায় এই মতপার্থক্য মেটে, কিন্তু খুব

অল্পকালের জন্যই। পরের বছরেই সুরাট কংগ্রেস অধিবেশনে এই বিরোধ প্রকট হয়ে পড়ে। এই সম্মেলনে সভামধ্যে জুতা ও লাঠি নিক্ষিপ্ত হয় এবং কংগ্রেস অধিবেশনের ভেতরই এক দাঙ্গার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

সুরাট সম্মেলনের পরই রাজদ্রোহের অভিযোগে তিলকের আবার বিচার হয় এবং তিনি ছয় বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। পরবর্তী কালে নেহরু ও সুভাষচন্দ্রের মতই তিলকও কারাবাসকালে পড়াশুনায় মন দেন। বর্মার মান্দালয় জেলে বসে তিলক তাঁর গীতা-ভাষ্য রচনা করেন। এই রচনার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করতে চান যে গীতার আসল দর্শন তার শেষভাগের ত্যাগের বাণীতে নয়, বরং তার প্রথম ভাগের কর্মের আদর্শে। তিনি ঘোষণা করেন, গীতার বাণীতে রয়েছে নিরলস কর্মের আহ্বান। আরও একজন চরমপন্থী নেতা, অরবিন্দ, গীতার ভাষ্য রচনা করেন এবং বলেন যে কারাবাসের সময় এক ঐশীশক্তি তাঁর হাতে গীতা তুলে দেন এবং তাঁকে সনাতন ধর্মের বাণী প্রচার করতে আদেশ দেন।

তিলক ছিলেন রাজনৈতিক বাস্তববাদী এবং গীতার মধ্যে তিনি শুধু কর্মের অনুপ্রেরণাই পেলেন না, পেলেন সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সহিংস সংগ্রামের যাথার্থ্যও। এই ব্যাখ্যা তৎকালীন বিপ্লব ও সন্ত্রাস-বাদীদের কাছে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে।

ব্রিটিশ সরকার মনে করলেন যে তিলক তাঁর 'কেশরী'-র লেখাগুলিতে ও তির্যক বক্তব্যের ব্যঞ্জনায় সহিংস সংগ্রামের প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। তিলককে তাই রাজদ্রোহের অভিযোগে কারারুদ্ধ করা হয়। এই সময়ে ব্রিটিশ সাংবাদিক ভ্যালেন্টাইন চিরোল ভারতে এসেছিলেন এবং তিনি তিলককে 'ভারতের অশান্তির জনক' বলে অভিহিত করেন। অবশ্য তিলক যে প্রকাশ্যভাবে সহিংস সংঘর্ষের প্ররোচনা দিয়েছেন এমন কোন প্রমাণ নেই। বস্তুতঃ তিলক প্রায়ই বলতেন যে যেহেতু ভারতীয়দের হাতে অস্ত্রশস্ত্র নেই সেইজন্য সশস্ত্র অভ্যুত্থান ব্যর্থ হতে বাধ্য। তিনি এও মনে করতেন যে অহিংস অসহযোগের দ্বারাই স্বরাজ আনা সম্ভব। তিলক যদিও সহিংস সংগ্রামের কথা প্রচার করেন নি, তিনি কিন্তু একথা মনে করতেন না যে একটা পরাধীন জাতির স্বাধীনতা লাভের জন্য সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অধিকার নেই।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিলক লিখেছিলেন, "স্বরাজ বা স্বায়ত্ত-শাসনের ডাক দেবার দিন এসেছে। টুকরো টুকরো সংস্কার দিয়ে আর চলতে পারে না। বর্তমান শাসন-ব্যবস্থা দেশের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। হয় একে ঢেলে সাজাতে হবে, নয় একে শেষ করে ফেলতে হবে।" তিলকের মতে স্বরাজ সমস্ত ভারতীয়ের জন্মগত অধিকার।

'স্বরাজ' শব্দটি একটি প্রাচীন শব্দ। এটি বেদোক্ত শব্দ। তিলক এটি হিন্দুশাস্ত্র থেকে তুলে নেন এবং তিনি বলেন ভারতবাসী "স্বরাজ" চাইবে আত্মিক প্রয়োজনে।[২] অন্য এক চরমপন্থী নেতা বিপিন পাল বলেন, "বেদান্তে 'স্বরাজ' শব্দটির অর্থ ঊর্ধ্বতম আধ্যাত্মিক

অবস্থা, যখন ব্যক্তি তার পরিচয় ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে উপলব্ধি করে এবং শুধুমাত্র সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি পায় না, বিশ্বের সবকিছুর সঙ্গে তার পূর্ণ সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়।"[৩] এই মতবাদ অনুসারে 'স্বরাজ' শব্দটি শুধু মাত্র রাজনৈতিক অর্থবাচক নয় এবং তাই ইংরেজী freedom বা স্বাধীনতা থেকে স্বরাজের ধারণা সম্পূর্ণ পৃথক্। ইংরেজী freedom শব্দ নাস্তিবাচক আর স্বরাজ অস্তিবাচক। বিপিন পাল বলেন, "The corresponding term in our language is not non-subjection which would be a literal rendering of the English word 'Independence' but self-subjection which is a positive ideal. It does not mean absence of restraint or regulation or dependence but self-restraint, self-regulation and self-dependence. In fact, our self-subjection means a good deal more than whatever the terms self-restraint, self-regulation or self-dependence may mean in English . . . Self-subjection means, therefore, in our thought, really and truly subjection to the universal, the complete identification of the individual with the universal."[৪]

স্বরাজ যে শুধুমাত্র একটা রাজনৈতিক আদর্শ নয়, শুধু ব্রিটিশ শাসনের অবসান নয়, এটা একটা আত্মিক আদর্শ যার ভিত্তিতে ব্যক্তি একটি বৃহত্তর মূল্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, এই চিন্তা পরবর্তী কালে গান্ধীও প্রচার করেছিলেন। স্বদেশসেবার জন্য ভারতীয় জনগণ স্বরাজ মন্ত্রের প্রবক্তা তিলককে 'লোকমান্য' অভিধায় অভিহিত করেন।

মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কারের পর যেসব আইনসভা গঠিত হওয়ার প্রস্তাব ছিল সেগুলিকে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হোক, এই ছিল তিলকের মত। গান্ধীর মত অবশ্য ছিল ভিন্নরূপ। ১৯২০ সালে তিলকের অকালমৃত্যু হয়। তিলকের মৃত্যুতে জাতীয় আন্দোলনে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয় যদিও গান্ধী পরে তা' পূর্ণ করেন।

চরমপন্থী আন্দোলন ও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ

চরমপন্থীরা মনে করতেন যে ভারতবাসীদের মনে ধর্মের ভাবই প্রবল এবং ধর্মীয় ভাষায় ব্যাখ্যা না করলে রাজনীতিও তাদের কাছে গ্রহণ-যোগ্য হবে না। তাঁরা ভাবতেন যে, ধর্মীয় তত্ত্বের একটু ছোঁয়া না থাকলে শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রচার জনসাধারণের মধ্যে কার্যকর হবে না। অরবিন্দ রচিত 'ভবানী মন্দির' গ্রন্থ এই ধর্মীয় ভাষা ও ব্যঞ্জনা ব্যবহারের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। 'ভবানী মন্দিরে' তিনি লিখেছিলেন, "India cannot perish, our race cannot become extinct, because among all the divisions of mankind it is to India that is reserved the highest and the most splendid destiny, the most essential to the future of the human race. It is she who must send forth from herself the future religion for the entire world, the eternal religion which is to harmonise all religions, sciences and philosophies and make mankind one soul. It is for this that Shri Ramkrishna came and Vivekananda preached." এতে বলা হয়েছিল যে জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলে, "You will be helping to create a nation, to consolidate an age, to organise a world".

চরমপন্থী ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদীরা ভাবতেন যে ভারতীয়দের জাতিগত ঐক্য সাধন বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের কোনো অর্থই থাকবে না যদি মনে মনে ভারতীয়রাও পাশ্চাত্যের মতো শুধু বস্তুর সাধনায় ব্যস্ত থাকে। তাঁরা বলতেন যে, যে জাতীয় আন্দোলনে ভারতীয় প্রতিভার নূতন উন্মেষ ঘটবে না তার কোন সার্থকতা নেই। বিবেকানন্দ অনেকদিন আগেই বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের অমরত্ব তার ঈশ্বরা-নুসন্ধানের মধ্যে, আর এই আধ্যাত্মিক পথ পরিত্যাগ করে ভারতীয়রা যদি রাজনীতি-সর্বস্ব হয়ে যায় তবে ভারতীয় আত্মার মৃত্যু ঘটবে।[১]

কিন্তু সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম নেতা বিবেকানন্দ ভারতীয়দের নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতিতে গৌরববোধ জাগ্রত করে আসলে তাদের রাজনৈতিক জাতীয়তা বোধও দৃঢ়তর করেছিলেন। এইজন্যই যদিও বিবেকানন্দ নিজেকে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা বলতে অস্বীকার করতেন[২], তবুও তাঁরই শিক্ষায় প্রভাবিত অরবিন্দ যখন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। চরমপন্থীদের নেতা অরবিন্দ চেয়েছিলেন জাতীয় আন্দোলনকে আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে।[৩] চরমপন্থী বা জঙ্গী জাতীয়তাবাদীরা বিশ্বাস করতেন যে ভারতের জাতীয় মুক্তি শুধুমাত্র পাশ্চাত্য নিদর্শনে আসতে পারে না এবং পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক্ করা গেলেও ভারতীয় রাজনীতিকে ধর্মের কাছ থেকে সমর্থন পেতে হবে।

অন্য এক চরমপন্থী নেতা তিলকও নরমপন্থীদের পশ্চিমী অনুকরণের সমালোচনা করেন এবং জাতীয় আন্দোলনকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি আধা-ধর্মীয় ভাষা ব্যবহার করতেন। তিনি মারাঠাদের ধর্মীয় রাজনীতির পুনঃপ্রবর্তন করেন। তাঁর আবেদন কেবলমাত্র ইংরেজী শিক্ষিত চিন্তাশীলদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, তিনি অশিক্ষিতদের সামাজিক ও ধর্মীয় আবেগকে রাজনৈতিক অস্ত্রে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি ধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তি দিয়ে রাজনৈতিক জাতীয়তাবোধকে শক্তিশালী করতে চাইতেন এবং তার জন্য ধর্মীয় উৎসবগুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে বলেছিলেন। ১৮৯৬ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর তিনি কেশরী পত্রিকায় লেখেন, "The educated people can achieve results through these national festivals which it would be impossible for the Congress to achieve. Why should you not give the shape of huge mass meetings to the bigger *jatras*? Will it not be possible for political activities to enter the humblest cottages of the villages through these festivals? Will it not thus be possible to make available to our illiterate countrymen in the villages the moral and the religious education which you have got after strenuous efforts?"[৪]

তিলক গণপতি ও শিবাজী উৎসব পালনে উৎসাহ দিতেন। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে তিলক এই অনুপ্রেরণা পান (কেশরী মারাঠা ট্রাস্ট প্রকাশিত তিলকের একটি প্রামাণ্য জীবনীর মতে) ইউরোপের ইতিহাস থেকে। গ্রীক ইতিহাস ও অলিম্পিক খেলার ইতিহাস থেকে তিলক গণপতি উৎসবের কল্পনা পেয়েছিলেন এবং কার্লাইল ও এমার্সনের বীর-পূজার তত্ত্বালোচনা থেকে তিনি শিবাজী উৎসব পালনের অনুপ্রেরণা পান।[৫] গণপতি হিন্দুদের দূরদৃষ্টি ও জ্ঞানের হস্তিমুণ্ড দেবতা এবং মারাঠা বীরশিবাজী হলেন মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটাবার অন্যতম নায়ক। কিন্তু এই হিন্দু দেবতা ও বীরদের সঙ্গে জাতীয়তার সম্মেলন কিছু হিন্দুর কাছে যেমন জনপ্রিয় হয়ে উঠল, তেমনি কিছু কিছু মুসলমানের কাছে সন্দেহের কারণ হয়েও দাঁড়ালো।

এই নূতন জাতীয়তাবাদ প্রাচীন দেবতার পূজার মাধ্যমে দেশাত্মবোধের প্রচারের কথা বলল। পাশ্চাত্য দেশ মূর্তিপূজা ও পৌত্তলিকতা বর্জন করেছিল কিন্তু বাঙালী ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেবী দূর্গার বিভিন্ন লীলাকে জাতীয় বিবর্তনের প্রতীকী ব্যাখ্যা দিয়ে মাতৃভূমির কল্পনার মধ্যে এক পারমাত্মিক ব্যঞ্জনা এনে দিলেন। এই রকমের প্রতীকী ব্যাখ্যা সহসা দেশের ধর্মোৎসবের মধ্যে এক নূতন অর্থপূর্ণতা এনে দিল এবং লোকে জগদ্ধাত্রী, কালী বা দুর্গা যে পূজাই করুক তার মধ্যে দেশপ্রেম খুঁজে পেল। তারা দেবীকে প্রণাম জানাল 'বন্দে মাতরম্' বলে। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠের' একটি গান 'বন্দে মাতরম্' নামে সুবিখ্যাত হয়েছিল। 'বন্দেমাতরম্' হল স্বদেশের প্রতি প্রণাম—দেবী হিসাবে আর জননী হিসাবে।

হেমচন্দ্র ও বাঙলার আদি কবিরা মনে করতেন যে জাতি হিসাবে ভারতীয়দের একটি নৈতিক দায়িত্ব আছে, কারণ ধর্মপ্রচারের জন্য তারা ঈশ্বর নির্বাচিত, যেমন হিব্রুরা মহত্তম আইন প্রচারের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল। নবীনচন্দ্রও তাঁর শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিয়ে রচিত কবিতার মধ্যে এক রাজনৈতিক বক্তব্যকে সোচ্চার করলেন। নবীনচন্দ্র পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে তাল রেখে ধর্মকে নূতন করে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। এই ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণ হলেন আত্মা, আর অর্জুন হলেন এই পুনর্জাগরিত ভারত-দেহের বাহুস্বরূপ। নবীনচন্দ্র বললেন যে অবতার শ্রীকৃষ্ণই বিভেদ-বিদ্বেষ দূর করে সকল দ্বন্দ্বের অবসান করবেন. এবং ভারতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করবেন।[৬]

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের স্বদেশী ধারা বঙ্কিমের মধ্যে প্রবাহিত হয়। বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণনা করেন আদর্শ পুরুষ হিসাবে। শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে বঙ্কিম 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে বলেন যে শ্রীকৃষ্ণ প্রণম্য, কেননা তিনি বাহুবলে দুষ্টের দমন করেছেন, জ্ঞানবলে ভারতের ঐক্যসাধন করেছেন এবং বিদ্যাবলে আদর্শ নিষ্কাম ধর্মের প্রচার করেছেন। তিনি প্রণম্য, কেননা বৈদিক শক্তির যুগে বৈদিক শক্তির দেশে তিনি ঘোষণা করতে পেরেছিলেন যে ধর্ম বেদে নেই, ধর্ম আছে মানুষের কল্যাণে। তিনি মানুষই হোন আর দেবতাই হোন, তিনি প্রণম্য, কেননা তাঁর মধ্যেই সকল শক্তি, ধর্ম ও প্রেম সমাহিত।[৭]

'কৃষ্ণ চরিত্র' গ্রন্থে বঙ্কিম বলেছিলেন যে জাতির প্রগতির জন্য প্রধানতঃ প্রয়োজন হল ধর্ম ও নৈতিক পুনর্জাগরণ। তাঁর মতে কৃষ্ণ কোনদিন সমাজ-সংস্কারক হতে চাননি, তাঁর লক্ষ্য ছিল সমাজের নৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং ধর্মরাজ্য সংস্থাপন। এটা সম্ভব হলে সমাজ নিজের থেকেই সংস্কৃত হবে, আর এটা না হলে কিছুতেই কিছু হবে না। তিনি বলেন যে আমরা বিপদ ডেকে আনি যখন সামাজিক সমস্যাগুলিকে ধর্মীয় সমস্যার থেকে পৃথক্ করে দেখি। রাজনৈতিক প্রগতি নির্ভর করছে ধর্মীয় প্রগতির ওপর, একটা হলে অন্যটা আপনা থেকেই হবে।[৮]

পারমাত্মিক পুনর্জাগরণের মধ্যে বঙ্কিম দেশের ভবিষ্যৎ দেখেছিলেন। তিনি স্বদেশকে মাতৃরূপে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করেছেন "বন্দে মাতরম্" বলে। এই ধরনের আবেদনে অনেক ভারতবাসীই জাতীয় ইতিহাসের প্রবহমাণ ধারার স্পর্শ পেয়েছিল।

পৃথিবীর অনেক দেশেই জাতীয়তাবোধের সঙ্গে একটি বিশেষ ভাষা ও সাহিত্য পাশাপাশি গড়ে উঠেছে। বঙ্কিমের বাংলা সাহিত্য ছিল এমনি এক জাতীয়তাবোধের কেন্দ্র, তবু সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধ থেকে এই ভাব কিঞ্চিৎ পৃথক্। বঙ্কিমের 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বদেশ-মূর্তির সঙ্গে ধর্মীয় দেবীমূর্তির একাত্মীকরণ সংঘটিত হল। স্বদেশ জননীর সঙ্গে যখনই দেবী মাতৃভূমির মিলন ঘটল তখনই অনেক হিন্দু জাতীয়তাবাদীর অন্তরে সাড়া জাগাল, যারা এ পর্যন্ত মধ্যপন্থীদের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক আবেদনে অতৃপ্ত ছিল। যদিও এই সম্মিলিত ধর্মীয় স্বাদেশিকতা অনেকের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠল

তবু এটা বিশেষ করে স্মরণ রাখতে হবে যে এতে শুধু হিন্দু পুনর্জাগরণই সম্ভব হল।

বিখ্যাত এবং মতদ্বৈধমূলক উপন্যাস 'আনন্দমঠ' বঙ্কিম রচনা করেন ১৭৭০ সালের সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায়। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ঘটেছিল এক শ্রেণীর সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে যাঁদের নেতা ছিলেন ভবানন্দ। এই শ্রেণীর সন্ন্যাসীদের জীবনে ধর্ম ও স্বাদেশিকতা একীভূত হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা অনুভব করতেন যে দেশের সেবার মধ্যে মাতৃসেবা ও ঈশ্বরসেবা নিহিত। নেতা ভবানন্দ শিষ্য মহেন্দ্রকে এই মাতৃপূজায় দীক্ষিত করার জন্য গেয়েছিলেন

"বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না—সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা মাতা কে। জিজ্ঞাসা করিল, "মাতা কে?" উত্তর না দিয়া ভবানন্দ গায়িতে লাগিলেন,—

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।"

মহেন্দ্র বলিল, "এ ত দেশ, এ ত মাতা নয়"—। ভবানন্দ বলিলেন, "আমরা অন্য মা মানি না। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, বন্ধু নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই। আমাদের কাছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা, শস্যশ্যামলা, মাতা।"[৯] তখন বুঝিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, "তবে আবার গাও"। ভবানন্দ আবার গায়িলেন,

"বন্দে মাতরম্
সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদ-করালে,
দ্বিসপ্তকোটি-ভুজৈধৃত-খর-করবালে,
অবলা কেন মা এত বলে!
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।"

বঙ্কিম মাতৃভূমির কল্পনায় যে ধর্মীয় অর্থ যোজনা করলেন তা হল দেবী দুর্গার বরাভয়দাত্রী মূর্তির মধ্যে মাতৃভূমির ভবিষ্যৎ গৌরবের

রূপকল্প।[১০] এই চিন্তার জনপ্রসার ঘটল অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ বাঙালী চরমপন্থীদের মাধ্যমে। বিপিনচন্দ্র ব্যাখ্যা করলেন যে দুর্গা বা কালী বা জগদ্ধাত্রী পূজার মধ্যে লোকে পূজা করে জননীকে, জন্মভূমিকে।[১১] অরবিন্দ বললেন যে বঙ্কিমের সর্বোত্তম দেশসেবা হল সেই শিক্ষাদানে যাতে তিনি বলেছিলেন যে মাতৃভমি শুধুমাত্র কিছু মাটি আর জনসংখ্যা নয়, মাতৃভূমি স্বর্গীয় ঐশ্বরিক শক্তি যেখানে দেশপ্রেম ধর্মীয় গরিমায় গৌরবান্বিত।[১২] জাতীয়তাবাদের এই ধর্মীয় ও প্রাচীন দেবপূজার ঐতিহ্য-মণ্ডিত আদর্শ জনসমাদৃত হয়ে ওঠে, কারণ এর মধ্যে জাতীয়তাবাদীরা তাঁদের নিজস্ব দেশের অনুভূতি পেয়েছিলেন, তাঁদের মনে হয় নি যে এটা ইউরোপের বিদেশী সংস্কৃতির কাছ থেকে ধার করা কোন মতবাদ।[১৩]

জাতীয়তাবাদী নেতা ও দার্শনিক বিপিনচন্দ্র পাল "The Soul of India" গ্রন্থে লিখলেন, "All these old and traditional gods and goddesses......have been reinstated with a new historic and nationalist interpretation in the mind and soul of the people. Hundreds of thousands of our people have commenced to hail their motherland today as *Durga, Kali, Jagaddhatri.* These are no longer mythical conceptions or legendary persons or even poetic symbols. They are different manifestations of the Mother. The Mother is the spirit of India. This geographical habitat of ours is only the outer body of the Mother ... Behind this physical and geographical body, there is a being, a personality—the personality of Mother—our history is the sacred biography of the Mother".[১৪] বিপিনচন্দ্র লেখেন, "Every nation has a particular world-idea of its own and develops... particular institutions and politics for the due realisation of this world-idea".

বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ দাবী করলেন যে বেদান্তের মৌলিক কল্পনা অর্থাৎ সমস্ত জীবনের মধ্যে মৌলিক ঐক্য রয়েছে এই হল নূতন ভারতীয় বিশ্বদর্শন। বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, "The new nationalist movement in India is essentially a spiritual movement ... The philosophy that stands behind it is the philosophy of the Absolute, the philosophy of Brahman, as applied to the interpretation of man's social and civic life ... The sacred and the secular are strangely blended together in every department of the comparatively primitive life and activities of the people."[১৫]

নূতন জাতীয়তাবাদের আদর্শ অনুযায়ী যাঁরা মাতৃপূজা করতেন আর যাঁরা নববৈদান্তিক এই দুই দলকেই বিপিনচন্দ্র মেলাতে চেয়েছিলেন। তিনি বললেন যে হিন্দুদের মূর্তিপূজার ধারণাও পরিবর্তিত হতে চলেছে। এই পরিবর্তন শুরু হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের কাল থেকে, এবং আনন্দমঠের

মাতৃপূজার নতুন ব্যাখ্যা থেকে। বিপিনচন্দ্র বললেন, "This interpretation of the old images of gods and goddesses had imparted a new meaning to the current ceremonialism of the country and the multitudes, while worshipping either Jagaddhatri or Kali or Durga, accosted them with devotion and enthusiasm, with the inspiring cry of Bande-Mataram . . ."[১৬] তিনি বললেন যে প্রাচীন দেবদেবীরা এই নবরূপায়ণে সাধারণ মানুষের কাছে নূতন জাতীয়তাবাদকে পৌঁছে দিচ্ছেন। আর নববৈদান্তিকদের সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র লিখলেন, "Neo-Vedantism which forms the very soul and essence of what may be called Neo-Hinduism has been seeking to realise the old spiritual ideals of the race, not through monkish negations or medieval abstractions, but by idealisation and spiritualisation of the concrete contents and actual relations of life."[১৭] এই নববৈদান্তিকতা সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষের জীবনের চরম আত্মিক বিকাশের উপযোগী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস দাবী করে। বিপিনচন্দ্রের মতে সমসাময়িক ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এই নব বেদান্ত চিন্তা-প্রসূত।

বঙ্কিমের মতোই বিপিনচন্দ্র মনে করতেন যে 'জাতি' শুধু একটি শব্দ বা গুণ নয়, 'জাতি' অত্যন্ত বাস্তব ও ধর্মীয় সত্য। এটা একই সঙ্গে শব্দ, চিন্তা, প্রতীক, প্রকাশ এবং বাস্তব।[১৮] এই ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে বঙ্কিমের মতই বিপিনচন্দ্র বলেন, "The mountains, these rivers, these extensive plains and lofty plateaus are all witnesses into the life and love of our race, in and through which the very life and love of the Mother have sought and found uninterrupted and progressive expression. Our history is the sacred biography of the Mother Our philosophies are the revelations of the Mother's mind, our poetry and our painting, our music and our drama, our architecture and our sculptures all are the outflow of the Mother's diverse emotional moods and experiences. Our religion is the organised expression of the soul of the Mother".[১৯]

অরবিন্দ ঘোষ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ

অরবিন্দ ঘোষ রাজনৈতিক জাতীয়তাকে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তার সঙ্গে এক করে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি গীতার থেকে পথ-নির্দেশ খুঁজে পান। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীও তাঁকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করে। অরবিন্দের মধ্যে তাই মানুষ একাধারে রাজনৈতিক নেতা ও ধর্মীয় গুরুর সন্ধান পায়।

অরবিন্দ বলেছিলেন যে একদা ভারতবর্ষ প্রাচ্যদেশের প্রধান পুরোহিত ছিল ঃ "Had not her civilization left her ripple marks on the furthermost limits of Asia ? India still has a soul... She alone in a pharisaical world where everyone acclaimed God in speech and denied Him in fact, offered Him the worship of her heart, she alone had given birth to the choice spirits who cast aside the highest of earth's gifts in their enraptured pursuit of the life of life. Only India could produce in the nineteenth century the Saint of Dakshineswar. The saving wisdom is still in the land—the wisdom gathered and garnered in their priest homes by her priest-philosophers, the builders of the Vedas, the thinkers of the Upanishads".

অরবিন্দ প্রশ্ন করলেন যে, যে ভারতবর্ষ একদা ঈশ্বরের ছিল, সে কি হঠাৎ ইংরেজ সভ্যতার এক নগণ্য শহরতলি হয়ে যাবে? ভারতের পতনে বেদনার্ত অরবিন্দ দুঃখ করেন, "The alien domination not only impoverished her body but also strangulated her soul".

অরবিন্দ জনসাধারণকে বলেন যে রাজনৈতিক মুক্তির জন্য অসহযোগের নীতি যেমন দরকারী, ঈশ্বরের অনুকূল অভিপ্রায় তার চেয়ে আরও বেশী প্রয়োজন। মধ্যপন্থীরা সাংবিধানিক আবেদনের পদ্ধতি বেছে নিয়েছিলেন, ইংরেজ শাসকদের সৌজন্যের ওপর নির্ভর করেছিলেন। অরবিন্দ ইংরেজদের সৌজন্যে বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু তিনি এও জানতেন যে জাতীয়তাবাদীদের এমন কোনো শারীরিক ক্ষমতা নেই যা বিদেশী সরকার চূর্ণ করতে পারবে না।[১] এই পরিস্থিতিতে অরবিন্দ মনে করলেন যে ভারতীয়দের একমাত্র সহায় ঈশ্বর এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভারতবর্ষ মুক্ত হবেই[২] কারণ ঈশ্বরের অভিপ্রায়ই হল ভারতের মুক্তি[৩]।

১৯০৭ সালের সুরাট কংগ্রেস অধিবেশনে মধ্যপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে বিভেদ প্রকট হয়ে পড়ে এবং তার পরই বোম্বাইয়ে এক সভায় অরবিন্দ বললেন, "There is a creed in India today which calls itself Nationalism, a creed which has come to you from Bengal. This is a creed which many of you have accepted when you called yourselves Nationalists. Have you realised...what that means... what it

is that you have taken in hand ? Or is it that you have merely accepted it in the pride of a superior intellectual conviction ?"

তিনি বললেন, "তোমরা নিজেদের জাতীয়তাবাদী বল। জাতীয়তাবাদ কি? জাতীয়তাবাদ শুধু একটা রাজনৈতিক কর্মসূচী নয়। জাতীয়তাবাদ হল একটা ধর্ম যা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। জাতীয়তাবাদ এমন এক আচার যা সারা জীবনে আচরণ করতে হবে। কেউ যেন শুধু বুদ্ধির গর্বে ও অহঙ্কারে আত্মহারা হয়ে নিজেকে জাতীয়তাবাদী না মনে করে। যদি তোমরা জাতীয়তাবাদী হতে চাও, যদি তোমরা জাতীয়তাবাদের ধর্ম গ্রহণ করতে চাও, তাহলে সেই ধর্মীয় ভক্তি নিয়ে এসো। মনে রেখো তোমরা ঈশ্বরের হাতে যন্ত্র মাত্র"। তিনি বললেন, "In Bengal, nationalism has come to the people as religion and it has been accepted as a religion. It always happens when a new religion is preached, when God is going to be born in the people, that . . . forces rise with all their weapons in their hands to crush that religion. In Bengal too a new religion, a religion divine and *sattic*, has been preached and this religion they (the British rulers) are trying with all the weapons at their command to crush".

অরবিন্দ নিজেকেই জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে কোন্ শক্তিতে বাঙলায় জাতীয়তাবাদ বেঁচে আছে? আবার নিজেই উত্তর দিলেন, জাতীয়তাবাদ বেঁচে থাকে ঈশ্বরের শক্তিতে, তাই কোন অস্ত্রেই তার বিনাশ সম্ভব নয়। "Nationalism is immortal ; nationalism cannot die ; because it is no human thing, it is God who is working in Bengal. God cannot be killed, God cannot be sent to jail".

তারপর অরবিন্দ তাঁর শ্রোতাদের প্রশ্ন করলেন, তোমাদের কি সত্যিকার বিশ্বাস আছে, না শুধু মাত্র একটা রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার বৃহত্তর স্বার্থপরতা তোমাদের পরিচালিত করছে? তোমাদের রাজনৈতিক আদর্শ কি বৃহত্তম কোন উৎস থেকে আসছে? তোমাদের মধ্যে কি ঈশ্বর জন্মগ্রহণ করেছেন? তোমরা কি উপলব্ধি করতে পেরেছ যে তোমরা ঈশ্বরের যন্ত্র মাত্র, তোমাদের শরীর তোমাদের নিজেদের নয়? তোমরা যদি সেই সত্য উপলব্ধি করে থাক তাহলে তোমরা সত্যই জাতীয়তাবাদী—তাহলেই তোমরা এই মহৎ জাতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।[৪]

অরবিন্দ ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন, তাই ব্রিটিশ সরকার যখন তাঁকে কারাগারের নির্জনতায় রেখেছিল তখন তিনি ধ্যান করতেন জীবনের সমস্যা ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্বন্ধে। এই কারাগারেই একদিন অরবিন্দ দেশের উন্নতি ও সনাতন ধর্মের প্রচারের দৈব আহ্বান পান। ১৯০৮ সালে কারামুক্তির পর অরবিন্দ সকলকে বলেন যে তিনি ঈশ্বরের বাণী শুনতে পেয়েছেন; কারাগারে ঈশ্বর তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে তাঁর হাতে গীতা তুলে দিয়েছিলেন এবং হিন্দুধর্মের সরল সত্যটি তাঁকে অনুভব করিয়ে দিয়েছিলেন।[৫] তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে ভারতের জাগরণের উদ্দেশ্য হবে সনাতন ধর্মের প্রচার, আর ভারতের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র প্রাচ্য দেশ জেগে উঠবে।

যদিও সনাতন ধর্ম সার্বজনীন তবুও অরবিন্দ বিশ্বাস করতেন যে ভারতবর্ষই হল সনাতন ধর্মের আদি ধারক ও বাহক।[৬] ঈশ্বর ভারতীয়দের এক জাতিতে ঐক্যবন্দী করেছেন যাতে সারা পৃথিবীতে তারা এই ধর্ম প্রচার করতে পারে।

কারাগার থেকে বেরিয়ে তিনি ধর্মসংরক্ষণ সভায় বক্তৃতাকালে বললেন, "The message came and it said, 'Something has been shown to you in this year of seclusion, something about which you had your doubts. ... It is this religion that I am raising up before the world, it is this that I have perfected and developed through the *rishis*, saints and *avatars*, and now it is going forth to be my work among the nations".

অরবিন্দ বললেন যে দৈববাণীর মাধ্যমে তিনি শুনেছেন যে ভারতীয় জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে সনাতন ধর্ম প্রচারের জন্য, যে ধর্ম আমরা আগে বুঝি নি কিন্তু যা নাস্তিক আর অবিশ্বাসীদের সন্দেহ দূর করবে। সেই বাণী অরবিন্দকে আদেশ দিয়েছিল, এগিয়ে যাও, তোমরা জাতিকে বলো যে তাদের সৃষ্টি সনাতন ধর্মের জন্য, ভারত যখন মহৎ হবে সনাতন ধর্ম তখন মহৎ হবে, ভারত যখন বৃহত্তর পরিব্যাপ্তি পাবে তখন সনাতন ধর্মও এইরূপ পরিব্যাপ্তি পাবে। ধর্মের জন্য এবং ধর্মের মধ্যেই ভারতবর্ষের অস্তিত্ব। অরবিন্দ বললেন যে ঈশ্বর সর্বত্র, সর্বভূতে, সকল মানুষের মধ্যে এবং বিশেষ করে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে বিদ্যমান আছেন।

এই সনাতন ধর্ম বিশ্বজনীন এবং তা কোন সংকীর্ণ গোষ্ঠীবদ্ধ ধর্ম নয়। এই ধর্ম বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও দর্শনের উপলব্ধিকে আত্মীকরণের দ্বারা বস্তুবাদের ওপর উঠতে পারে। এই ধর্ম ঈশ্বরের সান্নিধ্যের উপলব্ধি মানুষকে দিতে পারে এবং ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার সকল পথ নিজের মধ্যে খুঁজে পেতে পারে। এই ধর্ম সকল ধর্মের সত্যকে স্বীকার করে এবং বলে যে সকল বস্তু ও জীবের মধ্যেই তিনি আছেন, তাঁর মধ্যেই আমাদের সত্তা, আমাদের জীবন।

তাঁর পূর্ববর্তী বক্তৃতা, যাতে অরবিন্দ বলেছিলেন যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক নয় ধর্মনৈতিক, সেই বক্তৃতা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "I spoke once before with this force in me and I said then that this movement is not a political movement and that nationalism is not politics, but a religion, a creed, a faith. I say it again today, but I put it in another way I say no longer that nationalism is a creed, a religion, a faith ; I say that it is the Sanatan Dharma which for us is nationalism."

অরবিন্দ ছিলেন সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী। তিনি চাইতেন যে ভারতীয়রা পাশ্চাত্যের মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ তা গ্রহণ করবে ; কিন্তু সেটা করবে নিজের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যে গৌরবান্বিত এক জাতি হিসেবে—জাতিত্বহীন পাশ্চাত্যকরণের মোহে নয়।[৭] অনুকরণ করে ভারতবর্ষ কোনদিন ইউরোপ হয়ে উঠতে পারবে না, কারণ ইউরোপ ও ভারতের ইতিহাস বিভিন্ন এবং

তাদের ভবিষ্যৎও বিভিন্ন হতে বাধ্য। আর যদিও ভারত বহুল পরিমাণে পাশ্চাত্যকৃত হয়ে যায় তাহলে তার লাভ সামান্যই হবে, কারণ সে তার স্বকীয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে। গীতার ভাষায় অরবিন্দ ঘোষণা করলেন, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্মো ভয়াবহঃ।[৮]

অরবিন্দ দাবি করেন যে ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদীরা ইউরোপীয় চিন্তার প্রভাবে ভারতের আধ্যাত্মিক কর্তব্যের কথা বুঝতে না পেরে যে ভুল করেছিলেন তা বিংশ শতাব্দীর ভারতীয়রা বুঝতে পেরেছেন।[৯] তিনি লেখেন, "It has been driven home to us by experience that not on the strength of a raw unmoralised European enthusiasm shall we conquer . . . It is the East that must conquer in India's uprising".

রাজনৈতিক নেতাদের পেছনে দাঁড়াবেন যোগী, শিবাজীর সঙ্গে এক দেহে জন্ম নেবেন রামদাস, কাভুরের সঙ্গে মিলে যাবেন ম্যাটসিনি। বুদ্ধি ও আত্মায়, শক্তি ও পবিত্রতায় বিচ্ছেদ রেখেও ইউরোপে বিদ্রোহ সম্ভব, কিন্তু সেই ইউরোপীয় শক্তির দ্বারা ভারতের জয় সম্ভব হবে না। গত শতাব্দীর আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল, তার কারণ তা ছিল নিছক বুদ্ধিজীবী। জাতীয়তাবাদেও অপূর্ণতা থেকে গেছে, কারণ তা ছিল আবেগে ও আকাঙ্ক্ষায় ভারতীয়, কিন্তু বাস্তবে ও কর্মে ইউরোপীয়। এতে বুদ্ধি ছিল, প্রজ্ঞা ছিল না। "It has attached itself to imagination and idealism, but has not learned to discern the deeper truth and study the will of God".[১০]

ভারতীয় জাতীয়তাবোধ রাজনৈতিক নয়, তা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক —এই কল্পনা শুধু ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, পরবর্তী কালে গান্ধীর মধ্যেও তা প্রকাশ পেয়েছিল। আর্ল অফ রোন্যাল্ডসে তাঁর 'The Heart of Aryavarta'-গ্রন্থে লেখেন যে এই জাতীয় চিন্তার সাথে "the Western mind is little familiar."[১১]

অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র[১২] প্রমুখরা দাবি করতেন যে শুধু ধর্মে নয়, রাজনীতিতেও ভারতবর্ষের নিজস্ব প্রতিভাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাঁরা বলতেন যে মধ্যপন্থীদের রাজনীতির চরিত্র ছিল বিজাতীয়।[১৩] মধ্যপন্থীরা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন চাইতেন, কিন্তু অরবিন্দ সোচ্চারে জানান যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল পূর্ণ স্বরাজ। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দূর-প্রদেশ বা ইউরোপীয় সভ্যতার অংশমাত্র হয়ে থাকবে না।[১৪] অরবিন্দ মনে করতেন যে ভারত তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শ ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে, ইউরোপের প্রতিষ্ঠানগুলিকে নকল করবে না। তিনি লেখেন, "We do not believe that our political salvation can be attained by enlargement of councils, introduction of elective principles, colonial self-government or any other formula of European politics." তিনি স্বীকার করতেন যে রাজনৈতিক লড়াইয়ে অস্ত্র হিসেবে এগুলির কিছু উপযোগিতা আছে কিন্তু আদর্শ হিসেবে এগুলোকে তিনি যথেষ্ট মনে করতেন না।[১৫]

কোন এক বিশেষ ধরনের সরকার বা রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠায় অরবিন্দের উৎসাহ ছিল না। সরকারী ব্যবস্থা একটা রাজনৈতিক যন্ত্র মাত্র, সেটা ব্যবহার করবে ভাল বা মন্দ লোকে, ভাল বা মন্দ ভাবে। অরবিন্দ বলতেন যে ইউরোপের কিছু লোক বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রচালনা-পদ্ধতির সম্বন্ধে অনেক উচ্চাশা পোষণ করেন এবং ভাবেন যে সংসদীয় আইন করে স্বর্গরাজ্য আনা যাবে, কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের রাজনৈতিক পদ্ধতির চেয়ে সেটা যাঁরা কার্যকরী করবেন তাঁদের যোগ্যতার কথা বেশী করে ভাবতে হবে।[১৬] পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক পদ্ধতিকে অনুকরণ করলেই ভারতে সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে না। ভারতীয়রা যান্ত্রিকভাবে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করতে পারে, বর্ণভেদের বদলে শ্রেণীভেদ প্রথার প্রবর্তন করতে পারে, অসবর্ণ বিবাহ চালু করতে পারে,[১৭] কিন্তু অরবিন্দ বললেন, যে শুধু মাত্র এই সব পরিবর্তনের দ্বারাই ভারতে সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে না। অরবিন্দের এই পশ্চিম-বিমুখতা পরে গান্ধীর মধ্যে আরও বেশী প্রকট হয়ে ওঠে।

অরবিন্দ মনে করতেন যে ইউরোপ সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অতিরিক্ত মূল্য দেয় এবং মানুষের চরিত্রের বিকাশকে অবহেলা করে। আধুনিক ইউরোপ বলতে গেলে অহংবোধ ও আত্মকেন্দ্রিকতার প্রতিযোগিতাকে সমাজের ভিত্তি বলে মেনে নিয়েছে।[১৮] কিন্তু অরবিন্দ বিশ্বাস করতেন যে প্রাচীন ভারতবর্ষ একান্নবর্তী পরিবার, বর্ণাশ্রম ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পারস্পরিক ভালবাসার ওপর সমাজের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল,[১৯] যদিও তা সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে নি। তিনি বলতেন যে এই প্রেমভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠা তখনই সম্ভব হবে যখন সকল মানুষ সনাতন ধর্মের নিহিত সত্য যে সর্বভূতে ঈশ্বর, এই কথা উপলব্ধি করতে পারবে।[২০]

অরবিন্দ বলতেন যে সনাতন ধর্ম বিশ্বজনীন হলেও ভারতবর্ষ কিন্তু তার ধারক ও বাহক।[২১] অরবিন্দের এই বিশ্বাসের সঙ্গে ম্যাট্‌সিনির চিন্তার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দুজনেই মনে করতেন যে নীতির ভিত্তিই হল ঈশ্বরে বিশ্বাস, আর রাজনীতিকে নৈতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এবং তাঁদের জাতির (ম্যাট্‌সিনির ক্ষেত্রে ইতালীয় আর অরবিন্দের ক্ষেত্রে ভারতীয়) পৃথিবীতে একটি বিশেষ নৈতিক ও পারমার্থিক কর্তব্য আছে। ম্যাট্‌সিনি বলেছিলেন যে ইতালীয় জাতির কর্তব্য হল প্রমাণ করা যে তারা হচ্ছে "all sons of God and brothers in Him"[২২] তিনি লিখেছিলেন যে ইতালী ইউরোপের নৈতিক প্রগতির পুরোধা হবে।[২৩] অরবিন্দও বলেছিলেন, সনাতন ধর্মের প্রচারই ভারতীয় জাগরণের উদ্দেশ্য।[২৪]

বঙ্গ-ভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের চরমপন্থী নেতারা ভারতে এক আত্মিক জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যা পশ্চিমের রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ থেকে পৃথক্‌। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেশ শুধু একটি ভূমিখণ্ড নয়, এবং দেশগঠনের ভিত্তি কোনো ভৌগোলিক ঐক্য বা অর্থনৈতিক স্বার্থ নয়, তা হচ্ছে এক ধর্মীয় অনুভূতি যে আমরা সবাই একই জননীর সন্তান।[২৫] দেশমাতৃকার এই কল্পনাকে উল্লেখ করে অরবিন্দ বলেন যে দেশ "is not merely a division of land but it is a living thing. It is the mother in whom you move and have your being".[২৬]

অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র ম্যাট্‌সিনির মত জাতিকে এক উজ্জ্বল দ্যুতিময় মাতৃরূপে দেখতেন এবং ভারতীয় জাতির পৃথিবীতে এক বিশেষ মিশন আছে—এই মতবাদ পোষণ করতেন। ভারতীয় জাতির মিশন সম্বন্ধে অনেকে আবার বিরূপ সমালোচনাও করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এই জাতীয় মিশনে বিশ্বাস হচ্ছে "a beautiful illusion which flatters us and might even sustain us if we did not know that patriots in Montenegro also felt the same about the mission of their people।" পরবর্তী কালে কিন্তু গান্ধীও ভারতীয় জাতির একপ্রকার মিশনের কথা বলেছিলেন। অরবিন্দ যেখানে বলতেন যে ভারতীয়দের মিশন বা কর্তব্য হল সনাতন ধর্মের প্রচার, গান্ধী সে স্থলে বলেছিলেন যে ভারতীয় জাতির কর্তব্য হল পৃথিবীতে অহিংসার বাণী প্রচার করা।

বিপ্লবীদের পথ

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতীয় জাতীয়বাদীরা মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেনঃ নরমপন্থী, চরমপন্থী ও সন্ত্রাসবাদী। নরমপন্থীদের প্রেরণার উৎস ছিল ইংরেজ সাংবিধানিক ইতিহাস; তাঁদের লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক ধরনের স্বায়ত্তশাসন এবং তাঁদের পদ্ধতি ছিল শান্তিপূর্ণ, ক্রমান্বয়িক এবং সাংবিধানিক। চরমপন্থীরা সাধারণত চাইতেন স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সিনফিনবাদীদের মতো কিছুটা অসহযোগ পদ্ধতিতে তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন। সন্ত্রাসবাদীরাও চাইতেন পূর্ণ স্বাধীনতা তবে তাঁরা বিশ্বাস করতেন তখনকার রাশিয়া ও অন্যান্য কয়েকটি পশ্চিমী দেশে অনুসৃত বিপ্লবী বলপ্রয়োগের পদ্ধতিতে।

অনেক নরমপন্থীদের কাছে রাজনীতি ছিল অল্প সময়ের সখমাত্র, কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের কাছে তা হয়ে দাঁড়াল পূরো সময়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ভারতীয়দের রাজনৈতিক ও অন্যান্য সুযোগদানের প্রতি সরকারের কার্পণ্য ও শাসিতের প্রতি শাসকদের সহানুভূতির অভাব নরমপন্থী রাজনীতিতে অনেকেরই বীতশ্রদ্ধা এনে দেয় এবং জঙ্গী জাতীয়তাবাদী ও বোমাবারুদের রাজনীতির পথ সুগম করে দেয়।

কিন্তু ভারতে সন্ত্রাসবাদ কোনো গণঅভ্যুত্থান ঘটাতে পারে নি। সাধারণ মানুষ তখনও রাজনীতিতে প্রবেশ করেনি, আর তাই ফরাসী বিপ্লবের মত বিরাট জনসমর্থনে কোন বিপ্লব বা অভ্যুত্থান ভারতে সে সময় সম্ভব হয় নি। ভারতীয় সন্ত্রাসবাদী বা বিপ্লবী আন্দোলন ভদ্রলোক শ্রেণীর আন্দোলন হিসেবেই সীমাবদ্ধ ছিল, তা বুর্জোয়া শ্রেণীর আন্দোলনই রয়ে গিয়েছিল। গ্রামের অসংখ্য মানুষকে বা জনসাধারণকে তা স্পর্শ করতে পারে নি। সুতরাং বিপ্লবের পরিবর্তে দেখা দিল সন্ত্রাসবাদ, পেটিবুর্জোয়া মরিয়া হয়ে ওঠার সর্বজনীন বহিঃপ্রকাশ।

এই সময়ে ইউরোপীয় বিপ্লবের সাহিত্য খুঁজে খুঁজে সন্ত্রাসবাদের যৌক্তিকতা ও অবশ্যম্ভাবী সাফল্যের কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। ম্যাট্‌সিনীর লেখা, রুশ নৈরাজ্যবাদীদের কার্যকলাপ, ইত্যাদি সব কিছুই পঠিত ও আলোচিত হয়েছিল। রাজনৈতিক হত্যার প্রতি ইংরেজদের ছিল ঘৃণা, কিন্তু ইতালীয় মুক্তিযুদ্ধ ও আয়ারল্যাণ্ডের 'হোমরুল' আন্দোলন, যার সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়বাদী আন্দোলনের প্রায়ই তুলনা করা হতো, তাতে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ভারতীয় সন্ত্রাসবাদী ও বিপ্লবীরা প্রশ্ন করেছিল যে আইরিশরা যদি কুখ্যাত আমলাদের গুলি করাকে সরকারের ওপর যুক্তিপূর্ণ চাপ সৃষ্টি করার পদ্ধতি বলে মনে করতে পারেন, তবে কেন ভারতেও সে পথ নেয়া যাবে না? ফরাসী ও ইতালীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস থেকে সন্ত্রাসবাদীরা এই শিক্ষাই গ্রহণ করেন যে বিরাট এক অভ্যুত্থান ও তার ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা বাদ দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হবে না।

সন্ত্রাসবাদী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সংবিধান-পন্থীদের প্রতি ঘৃণা ও

তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে বলেন যে ভারতমাতা ভারতীয়দের কাছ থেকে চেয়েছিলেন রক্ত যাতে বহু যুগের পরাধীনতার কালি মুছে যায়। সন্ত্রাসবাদীদের মন্ত্র ছিল, 'তা হলে, এসো, নূতন জীবন লাভের জন্য মৃত্যুর দীক্ষা গ্রহণ করো'।

উনবিংশ শতাব্দীর রুশ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে এই সময়ের ভারতের কিছুটা সাদৃশ্য ছিল; তাই কিছু ভারতীয় বুদ্ধিজীবী যে তৎকালীন রুশ নৈরাজ্যবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়বেন এতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। ভারতীয় বিপ্লবীদের কাছে ইতালীয় কার্বোনারী জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং শারীরিক শক্তিচর্চার জন্য বেশ কিছু সমিতি ও সঙ্ঘও গড়ে ওঠে। কিছু কিছু রাজনৈতিক ডাকাতিও ঘটতে থাকে। বিপ্লবী ইউরোপের কাছ থেকে ভারতীয় বিপ্লবীরা বোমা-বারুদের রাজনীতি গ্রহণ করে।

সন্ত্রাসবাদীদের সাধারণত একটা বিশ্বাস ছিল যে বিদেশী পাশ্চাত্য শক্তি ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি ধ্বংস করছে এবং ভারতের আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের জন্য বিদেশী শাসনের সহিংস উৎখাত প্রয়োজন। ১৮৯৪ সালে গণপতি উৎসবের সময় পুণা শহরে প্রচারপত্র বিলি হয় এই কথা বলে যে শিবাজী যে-রকম মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন, সেই রকম অস্ত্রধারণ যেন হিন্দুরাও করেন তৎকালীন অসহনীয় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে।[১] শিবাজী উৎসবের সময় দুইজন চিতপাবন ব্রাহ্মণ দামোদর ও বালকৃষ্ণ চাপেকর জনসাধারণকে 'জাতীয় যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দান করে ধর্মনাশী শত্রুদের রক্তে পৃথিবী রঞ্জিত করার'[২] আহ্বান জানান। তাঁরা প্রশ্ন রাখেন, "একে যদি হিন্দুস্থান বলা হয় তবে ইংরেজ কেন এখানে শাসন করে?" তাঁরা জনগণকে ইংরেজদের হত্যা করার পরামর্শ দেন। ১৮৯৭ সালের ১২ই জুন শিবাজীর অভিষেক জয়ন্তীতে একজন বক্তা বলেন যে, "যাঁরা ফরাসী বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন তাঁরা যদি বলতে পারতেন যে তাঁরা খুন করেন নি, শুধু পথের বাধা দূর করেছিলেন মাত্র, তবে মহারাষ্ট্রের মানুষও সেই যুক্তি দেখাতে পারবেন না কেন?"[৩]

১৮৯৭ সালে যখন পুণায় প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হয় তখন সরকার রোগীদের খুঁজে বের করার জন্য সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করে। এই সময়ে সেই অঞ্চলের সংবাদপত্রে অভিযোগ ওঠে যে গৃহস্থদের আবরু নষ্ট করা হচ্ছে। 'সোলাপুর সমাচারে' লেখা হয়, "এটা খুবই দুর্ভাগ্যের কথা যে মুঘল আমলেও যে ধর্ম, সম্ভ্রম ও নারীর সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়নি, আলোকপ্রাপ্ত ইংরাজ সরকারের আমলে তা পদদলিত হচ্ছে।"[৪] এই সংবাদপত্রে এ-কথাও বলা হয়েছিল যে তাঁতিয়া টোপী ইউরোপীয়দের সঙ্গে যে যুদ্ধ করেছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যের মানুষ যে গণ-বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করেছিল তার প্রতিশোধ হিসেবেই এই সব ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছিল। আর একটি আঞ্চলিক পত্রিকা, সুধারকে বলা হয় যে প্লেগ কমিশনার রাণ্ড্ ব্রিটিশ অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দিচ্ছেন। এতে আরও লেখা হয় "এখনও আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে সব দেখে যাচ্ছি, প্রতিরোধের চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। এ থেকে কি প্রমাণ হয়? এ থেকে কেবল এই প্রমাণ হয় যে আমরা শক্তিহীন, ব্যক্তিত্বহীন, ভীরু, কাপুরুষের জাতি"। তিলকের পত্রিকা 'কেশরী'তেও

এই ধরনের মন্তব্য প্রকাশিত হয়।[৫] কিছুকাল পরে ১৮৯৭ সালের ২২শে জুন রাণ্ড্ আততায়ীর হাতে প্রাণ দেন।

১৮৯৭ সালে প্রথম যে সন্ত্রাসবাদ জন্ম নেয়, তা আবার দেখা দেয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যভাগে। রুশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্লেভের হত্যার পর একটি মারাঠি পত্র 'কাল'-এ লেখা হয়েছিল যে এই জাতীয় হত্যার 'শিক্ষণীয় মূল্য' আছে, এর প্রশংসনীয় উদ্দেশ্য হল 'বিষাক্ত অঙ্গকে কেটে ফেলা', এগুলি হল 'অস্ত্রোপচারের চিকিৎসা' এবং এসবই করা হয় 'পৃথিবীর কল্যাণের জন্য'।[৬] রাশিয়ার বিপ্লবী সমাজবাদীদের কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বারা রচিত এক ইস্তাহার থেকে উদ্ধৃত করে এই পত্রিকায় বলা হয়েছিল যে প্লেভের অত্যাচার তার গুপ্তহত্যাকে অনিবার্য করে তুলেছিল। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের 'পাইয়োনিয়র মেল' নামক একটি পত্রিকা মন্তব্য করে যে 'কাল'ই বোধ হয় প্রথম ভারতীয় পত্রিকা যা নিশ্চিত ও প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক হত্যার সমর্থন করেছিল।[৭] কিন্তু যদিও 'কাল' কয়েকটি বিশেষ পরিস্থিতিতে রাজ-নৈতিক হত্যার সমর্থন করে, তাতে এমন-কিছু লেখা হয়নি যার অর্থ— ভারতের সেই সময়েই এই জাতীয় কোন বিশেষ পরিস্থিতি অস্তিত্বশীল। সেই একই প্রবন্ধে একথাও বলা হয়েছিল যে কার্জনের ভারত শাসনের অত্যাচার রাশিয়ার প্লেভের অত্যাচারের থেকে অনেক কম।[৮]

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ রোধের সাংবিধানিক আন্দোলনের ব্যর্থতার পর জঙ্গী জাতীয়তাবাদীরা অনেকে বলছিলেন যে বলপ্রয়োগ ছাড়া কিছুই করা যাবে না। সন্ত্রাসবাদীরা বিশ্বাস করতেন যে নরমপন্থীদের সাংবিধানিক পন্থায় স্বাধীনতা আসতে পারে না। তা আসতে পারে আত্মত্যাগ ও কৃচ্ছ্র-সাধনের দ্বারা, তরবারি ও আগুনের মাধ্যমে, বস্তুত তা আসতে পারে কেবল-মাত্র সেই পথে যে-পথে ইতালীয় ও ফরাসীরা তাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন। সন্ত্রাসবাদীদের বিশ্বাস জন্মেছিল যে ফরাসী বিপ্লবের মত হত্যাকাণ্ড, গিলোটিন ও ট্রামব্রিল ছাড়া মুক্তি আসতে পারে না।

জাপানের ইতিহাস অধ্যয়ন বলপ্রয়োগের এই যুক্তিকেই আরও শক্তি-শালী করে তোলে। জাপান সামরিক শক্তিতে বলশালী ছিল বলেই ১৯০৫ সালে জাপান রাশিয়াকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। সেই রকম পাশ্চাত্য-শক্তিকে পর্যুদস্ত করতে চাইলে ভারতকেও সাংবিধানিক পথে নয়, বল-প্রয়োগের পথেই এগোতে হবে। জাপানের যুদ্ধজয়ের পরই, 'পাইয়োনীয়র মেল' পত্রিকার এক সাংবাদিক লিখেছিলেন যে জাপানের জয় থেকেই ভারতীয়দের ধারণা জন্মায় যে ব্রিটিশ শক্তিও অপরাজেয় নয় এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূলও কালক্রমে শিথিল হয়ে আসবে।[৯]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতের অনেক দেশপ্রেমিকেরই ধারণা ছিল যে স্বাধীনতার জন্য জনগণকে কষ্ট স্বীকার ও আত্মত্যাগ করতেই হবে। জাতীয়তাবাদী পত্রিকা 'স্বরাজে' লেখা হয়, "স্বাধীনতার জন্য পাশ্চাত্য দেশের মানুষরা যে বিপদ বরণ করেছিলেন তা মনে রাখবেন। স্বাধিকারের জন্য ইংল্যাণ্ডের জনগণকে বহু যুদ্ধ করতে হয়েছে . . . এই যুদ্ধে বহু দেশ-প্রেমিক রাজদ্রোহের অপরাধে কারারুদ্ধ হয়েছেন। বহু দেশপ্রেমিক প্রাণ-বিসর্জনও দিয়েছেন। ফরাসী দেশে এক বিরাট বিপ্লব হয়েছিল . . . রাজকুল

ও অভিজাতদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল। রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপান যখন যুদ্ধ করেছিল তখন জাপানের অনেক বীরসন্তান প্রাণ দিয়েছিলেন। বারংবার ঘর্ষণ না করলে যেমন হীরক উজ্জ্বল হয় না, বারংবার মন্থন না করলে যেমন দধি ঘৃত হয় না, তেমনি আন্দোলন না করলে জনগণের শক্তি আসে না।"[১০] অবশ্য এই পত্রিকাও জনগণকে অস্ত্রধারণ করতে পরামর্শ দেয় নি, পরামর্শ দিয়েছিল যাতে তারা ধর্ম ও অসহযোগের পথ গ্রহণ করে।

কিন্তু বাঙলার সন্ত্রাসবাদীদের মুখপত্র 'যুগান্তর' প্রকাশ্য ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অস্ত্রধারণের আহ্বান জানিয়েছিল। এতে ঘোষণা করা হয়েছিল যে ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গীতে রাজদ্রোহ বলে কিছু থাকতে পারে না,[১১] কারণ যদি প্রত্যেক ভারতবাসী বিদেশী শাসনের অবসানের জন্য রাষ্ট্রের আইন অমান্য করে তা হলে ন্যায়ধর্ম থাকবে ভারতীয়দের পক্ষেই, ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষে নয়। সন্ত্রাসবাদীদের যুক্তিতে ভারতীয় জনসাধারণ ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে এক 'স্থায়ী যুদ্ধাবস্থায়'[১২] আছে, সুতরাং ব্রিটিশ রাজের ভিত্তিতে যে-কোন প্রকার আঘাত হানাই হবে ন্যায়সঙ্গত।

'যুগান্তরে' বলা হয় যে ইউরোপীয়দের প্রতি গুলি বর্ষণ করতে বেশী কিছু দৈহিক শক্তির প্রয়োজন হয় না।[১৩] বাঙলার সন্ত্রাসবাদীরা কেবলমাত্র রিভলবারই নয়, বোমাও ব্যবহার করতেন। ১৯০৭ সালের ১২ই আগষ্ট 'যুগান্তরে' লেখা হয় যে সবদেশেই অসংখ্য গোপন স্থান আছে যেখানে অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণ করা যায় এবং স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় যে রাশিয়াতে যে প্রচুর পরিমাণে বোমা প্রস্তুত হয়েছে এবং তখনও হচ্ছিল আর তা সবই বিপ্লবীদের গোপন কারখানায় নির্মিত হয়েছে।[১৪] নরেন্দ্রনাথ গোঁসাই, যিনি প্রথমে একজন সন্ত্রাসবাদী ছিলেন, কিন্তু পরে আলিপুর বোমার মামলায় রাজসাক্ষী হয়ে যান, তিনি বলেছিলেন যে সন্ত্রাসবাদী নেতা বারীন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁকে বলছিলেন, "আমরা জাপান, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ায় কিছু ছেলেদের পাঠাচ্ছি বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য।" তাতে নরেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করে, "কি বিজ্ঞান"? এবং বারীন্দ্রনাথ উত্তর দেন, "কেমন করে বোমা বানাতে হয়।"[১৫]

'কাল' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল যে যদিও রাশিয়াতে বোমা ছোঁড়ার বিরুদ্ধে অনেক লোক সরকারকে সমর্থন করেছিল, ভারতে যখন আর বিশেষ কারুর ব্রিটিশ সরকারের প্রশস্তি গাইবার রুচি নেই তখন কোন ভারতীয়ই এখানকার বোমা ছোঁড়ার বিরুদ্ধে সরকারকে সমর্থন জানাবে না। এতে বলা হয়েছিল যে বিপ্লবী পরিস্থিতি থেকে রাশিয়া পেয়েছিল 'ডুমা' আর ভারত পাবে 'স্বরাজ'।[১৬]

তিলকের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'কেশরী'র ১৯০৭ সালে অন্যতম বক্তব্যই ছিল যে ভারতের প্রশাসন যখন রুশভাবাপন্ন হয়ে যাচ্ছে, তখন জনগণকেও রুশপদ্ধতিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ১৯০৭ সালে ডিসেম্বর মাসে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত স্বামীজী কৃষ্ণবর্মার নেতৃত্বে বিপ্লবী হোমরুল সোসাইটির মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান সোসিয়োলজিস্টে' এই অনুচ্ছেদটি প্রকাশিত হয়, "It seems that any agitation in India must be carried on secretly and that the only method which can bring the English government to its senses are the Russian methods vigorously and increasingly

applied until the English relax their tyranny and are driven out of the country... as a general principle the Russian methods will begin with the Indian officials rather than the European".[১৭] অবশ্য কোন্ বিশেষ পদ্ধতিতে এ কাজ হবে তা 'ইণ্ডিয়ান সোসিয়োলজিস্ট' স্থানীয় পরিস্থিতির ওপর ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীরা ভারতীয় ও ইউরোপীয় দুই ধরনের আমলাদেরই হত্যা করেছিল, যদিও প্রথমে করেছিল ইউরোপীয় আমলাদের।

বাঙলাদেশে সন্ত্রাসবাদীরা ধর্মীয় আবেদনের ভিত্তিতে যুবকদের দলে নিয়ে আসত এবং তারপর তাদের রুশ পদ্ধতির বলপ্রয়োগে শিক্ষা দিত। বোমা তৈরীর জন্য গোপন কারখানাও খোলা হয়েছিল। সিডিশন কমিটির প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল যে বাঙলাদেশের বিপ্লবী সংস্থাগুলি 'ভবানী মন্দির' বর্ণিত দর্শন ও নীতির সঙ্গে রুশ বিপ্লবীদের বলপ্রয়োগের পদ্ধতির সংমিশ্রণ করতো। এতে এও বলা হয়েছিল যে যদিও ধর্মীয় ব্যাপারে 'ভবানী মন্দিরে' অনেক কিছু লেখা ছিল, তা সত্ত্বেও রুশপদ্ধতি ছিল আরো অনেক বেশী বাস্তবধর্মী, আর ১৯০৮ সালের পরবর্তীকালে সন্ত্রাসবাদীদের যে সব সমিতি বা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাদের দীক্ষা ও শপথ গ্রহণের ধারা 'ভবানী মন্দির' পুস্তিকা থেকে গৃহীত হলেও, তারা সন্ত্রাস সৃষ্টির বাস্তব দিক এবং তার আনুষঙ্গিক বোমাবর্ষণ, ডাকাতি প্রভৃতির উপরই বেশি জোর দিয়েছিল।[১৮]

১৯০৮ সালের ২২শে মে আদালতে বিপ্লবী নেতা বারীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেছিলেন যে তিনি বরোদাতে রাজনৈতিক রচনা ও ইতিহাস অধ্যয়নে অভিনিবিষ্ট ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি বাঙলাদেশে ফিরে আসেন এক রাজনৈতিক প্রচারক হিসেবে এবং স্বাধীনতার বাণী প্রচারের জন্য। তিনি বলেছিলেন, "আমি জেলায় জেলায় ঘুরে শক্তিচর্চার জন্য জিমনাসিয়াম স্থাপন করতে থাকি। এই সব জিমনাসিয়ামে যুবকেরা আসতেন শরীর-চর্চা ও রাজনীতি শিক্ষার জন্য। আমি দু' বছর বাঙলাদেশের প্রায় সব জেলায় ঘুরে বেড়িয়ে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করি। পরে আমি বরোদায় ফিরে গিয়ে এক বছর পড়াশুনায় মন দিই। তারপর আমি আবার বাঙলায় ফিরে আসি এই বিশ্বাস নিয়ে যে শুধু মাত্র রাজনৈতিক প্রচার দিয়ে এ দেশে কিছু হবে না। জনসাধারণকে বিপদে সম্মুখীন হবার জন্য আধ্যাত্মিকভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। আমার ইচ্ছা ছিল একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়া। এই সময়ে আমরা সর্বদাই এক সুদূর বিপ্লবের কথা ভাবছিলাম...আর অল্প অল্প করে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করছিলাম। সবশুদ্ধ আমিই সংগ্রহ করেছি ১১টি রিভলভার, ৪টি রাইফেল, ১টি বন্দুক। আমাদের দলে যে-সব যুবক এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন উল্লাসকর দত্ত। সে বলেছিল যে আমাদের দলে আসবে বলে সে বোমা তৈরী করতে শিখেছিল। তার বাড়িতে তার বাবাকে লুকিয়ে সে ছোট একটা গবেষণাগারও করেছিল আর সেখানে সে বোমা বানাবার পরীক্ষা চালাতো।"[১৯] আর একজন সন্ত্রাসবাদী উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বলেছিলেন, "আমার বিশ্বাস হয়েছিল যে ভারতের লোকদের ধর্ম ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে কাজ করানো যাবে না, তাই

আমি কিছু সাধুর সাহায্য নিতে মনস্থ করেছিলাম। সাধু না পেলে, আমি ঠিক করেছিলাম স্কুলের ছাত্রদের যোগাড় করে ধর্ম, নীতি ও রাজনীতির শিক্ষা দেবো। আমার কাজ ছিল আমাদের দেশের অবস্থার কথা ছেলেদের শেখানো, স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার কথা তাদের সামনে তুলে ধরা, আর বলা যে আমাদের একমাত্র পথই হোলো দেশের বিভিন্ন স্থানে গুপ্ত সমিতি গড়া। বিশেষ করে সবাইকে বলা যে আগামী বিপ্লবের জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে।"[২০]

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় যে-সব চাঞ্চল্যকর লেখা লিখতেন সন্ত্রাসবাদীরা সেগুলি সাগ্রহে পড়তেন। তাঁর লেখায় ব্রহ্মবান্ধব ভবিষ্যদ্বাণী করতেন যে ভারতের মুক্তির দিন সমাসন্ন, ফিরিঙ্গীদের এদেশ থেকে তাড়িয়ে দিতেই হবে, আর তাদের বন্দুক ও কামান তাদের বাঁচাতে পারবে না। দেশবাসীকে অস্ত্রধারণ করতে ব্রহ্মবান্ধব আহ্বান জানিয়েছিলেন। ১৯০৭ সালে ব্রহ্মবান্ধব রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হন। যে সম্পাদকীয় রচনাটির ভিত্তিতে এই অভিযোগ প্রধানত করা হয়েছিল তাতে ব্রহ্মবান্ধব লিখেছিলেন যে তিনি সম্পূর্ণভাবে স্বদেশীতে বিশ্বাস করেন এবং শুধুমাত্র নুন আর চিনির ক্ষেত্রেই তিনি স্বদেশী নন। তিনি লিখেছিলেন যে ভারতের মুক্তিই তাঁর লক্ষ্য এবং আশা, আর এই আশা বা উচ্চাশা হিমালয়ের চেয়েও উঁচু। তিনি বলেছিলেন যে আমাদের উদ্দেশ্য হল যেন ভারত স্বাধীন হয়, আমাদের গৃহ থেকে বিদেশীরা যেন বিতাড়িত হয়, আমাদের শিক্ষা, সভ্যতা ও ঋষিবাক্য যেন চিরন্তন হয়। আগে জননীর শৃঙখল মোচন করতে হবে, তারপর নিজের মোক্ষলাভের কথা ভাবা যেতে পারে। তিনি বলে-ছিলেন যে আমরা যেন বারংবার ভারতেই জন্মগ্রহণ করি যতদিন না ভারত-মাতার শৃঙখল মুক্ত হয়। তিনি যা বলেছিলেন তার ভাবার্থ হল, "হে ফিরিঙ্গী, আমি এইখানে আমার কণ্ঠদেশ প্রলম্বিত করে দাঁড়িয়ে বলিপ্রদানের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তুমি কি আমাদের ভয় দেখাতে পারবে? কখনো না। কারণ আমাদের ক্ষমতা অতিমানবিক—দৈব। আমরা দৈববাণী শুনেছি যে ভারতের যন্ত্রণার দিন শেষ হয়ে আসছে, তার মুক্তির দিন সমাসন্ন। আমরা অমর। তোমাদের যদি জ্ঞান থাকে তাহলে আমাদের মুক্তিপ্রয়াসে সহায়তা কর। অন্যথায় এসো আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই। আমরা তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছি। সারা দেশে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। দেখ, মায়ের সন্তানরা নিজেদের প্রস্তুত করছে। আগ্নেয়, বরুণ, বায়ব্য—সব অস্ত্রই তাঁর অস্ত্রাগারে মার্জিত হচ্ছে। শোনো, মায়ের চতুর্ভুজের আন্দোলন। আমরা কি তোমার বন্দুক বা কামানে ভয় পাই? অস্ত্র ধরো, ভাইসব অস্ত্র ধর। আমরা দৈববাণী শুনেছি, আমরা কি মৃত্যুর পূর্বে মায়ের শৃঙখল-মোচন দেখে যাবো না?"[২১]

'সন্ধ্যা' ছাড়া 'যুগান্তর' ইত্যাদি অন্যান্য পত্রপত্রিকায় বলপ্রয়োগ পদ্ধতির সমর্থনে বিভিন্ন রচনা প্রকাশিত হয়। একটি ইংরাজ নারীর হত্যার সংবাদ পাবার পর বিপ্লবী সংবাদপত্র 'যুগান্তর' মন্তব্য করে, "বসুধার বক্ষ হতে অসুর জাতির বিনাশের জন্য বহু প্রেতিনীর মৃত্যু প্রয়োজন"। 'যুগান্তর'-এ লুণ্ঠনেরও প্রশংসাও করা হয়েছিল: "লুণ্ঠন, আজ তোমায় আমরা পূজা

করি, আমাদের সাথী হও, এসো আমাদের প্রাচীন সংগ্রামী চেতনা পুনর্জাগরিত করো"।

'যুগান্তরে' লেখা হয় যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে হবে ডাকঘর, ব্যাঙ্ক, সরকারী তোষাখানা এবং বিলাসী ধনীদের লুণ্ঠন করে।[২২] যাঁরা রাজনৈতিক ডাকাতির গুণাগুণ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ ছিলেন তাঁদের কাছে রুশ ও আইরিশ বিপ্লবীদের কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করা হত।[২৩] যুগান্তর পত্রিকায় বলা হয় যে ফরাসী ও রুশ বিদ্রোহের সময় সরকারী সেনাবাহিনীর একাংশ বিপ্লবীদের পক্ষ নিয়েছিল এবং যুক্তি দেখান হয় যে ভারতে যখন শাসকশক্তি বিদেশী, তখন সেনাবাহিনীর বৃহত্তর অংশ স্বদেশী বিপ্লবীদের অংশ নেবে এইটেই স্বাভাবিক।[২৪]

সন্ত্রাসবাদীরা নাটকীয় ভঙ্গী ও চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডে বিশ্বাস করতেন। "একমাত্র চাঁদা হল যে প্রত্যেক পাঠক একটি করে ইউরোপীয় মুণ্ড আনবেন"---এই জাতীয় শিরোনামা প্রায়ই বিপ্লবী সংবাদপত্রে দেখা যেতো। এই রকম একটি ইউরোপীয় মুণ্ড নিয়ে আসেন মদনলাল ধিংরা। তিনি ১৯০৯ সালের ১লা জুলাই লণ্ডনে সার কার্জন ওয়াইলীকে গুলি করে হত্যা করেন। ইংলণ্ডে ধিংরা বীর সাভারকারের প্রভাবে এসেছিলেন এবং সাভারকারের লেখা বলে কথিত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, "আমি স্বীকার করি যে দেশপ্রেমী ভারতীয় যুবকদের উপর দ্বীপান্তর ও ফাঁসির মত পাশবিক অত্যাচারের সামান্য প্রতিশোধ হিসেবে সেদিন আমি ইংরেজ রক্তপাত করতে চেয়েছিলাম। আমি বিশ্বাস করি বেয়নেটের দ্বারা যখন ইংরেজরা ভারতীয়দের দাবিয়ে রেখেছে, তখন ইংরেজদের সাথে ভারতীয়দের চিরন্তন যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে। যেহেতু নিরস্ত্র কোনো জাতির পক্ষে সম্মুখ সমর সম্ভব নয়, সেই হেতু আমি অতর্কিত আক্রমণ করি। যেহেতু আমি বন্দুক থেকে বঞ্চিত, তাই আমি পিস্তল বাহির করি এবং গুলি করি। একজন হিন্দু হিসেবে আমি মনে করি যে আমার দেশের প্রতি অন্যায় করা ঈশ্বরকে অপমানিত করা।" উপসংহারে ধিংরা বলেছিলেন, "যতদিন পর্যন্ত ভারতে বর্তমান অস্বাভাবিক অবস্থা বজায় থাকবে ততদিন ভারত ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলবে।"[২৫]

বহু আইরিশ সংবাদপত্র ধিংরার প্রভূত প্রশস্তি করে। "দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেবার জন্য মদনলাল ধিংরাকে আয়ারল্যাণ্ড সম্মান জানায়",[২৬] এই রকম লেখা কিছু আইরিশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই প্রতিক্রিয়াই আয়ারল্যাণ্ডে প্রত্যাশিত ছিল কারণ সেখানে বহু রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীরা আইরিশ ও রুশ সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস থেকে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করতেন। ভারতীয় অবস্থা অনুধাবনের জন্য তদানীন্তনকালে ভারত ভ্রমণ করে 'দি টাইমস্' পত্রিকার সাংবাদিক ভ্যালেণ্টাইন চিরোল এই বিষয় উল্লেখ করে লেখেন, "ভারতীয়দের মধ্যে সন্ত্রাসবাদীরাই সবচেয়ে বেশী পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণকারী। বিশেষ করে আইরিশ সিন-ফিন্ পন্থী এবং নৈরাজ্যবাদীরা। এদের রচনায় এই দুই দলের উল্লেখ বারংবার করা হয়। তিলক দাক্ষিণাত্যে 'কর দেব না' আন্দোলন করেন আয়ারল্যাণ্ডের অনুকরণে এবং বাঙালীরা বিদেশী দ্রব্য

বর্জন করা আন্দোলনে বিশ্বাসী হয় সাম্প্রতিক আয়ারল্যাণ্ডের ইতিহাস থেকে। যখন আলিপুর জেলের মধ্যে রাজসাক্ষী গোঁসাইকে গুলি করা হয় তখন জাতীয়বাদীরা সে ঘটনাকে এই বলে গৌরবান্বিত করে তুলতে চেয়েছিল যে ফিনিক্স পার্ক খুনের মামলার রাজসাক্ষী জেম্‌স্ কেরীকে যে প্যাট্রিক ওকোনেলি হত্যা করেছিলেন তার চেয়েও এই ঘটনা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। গোঁসাইয়ের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু কেরীর হত্যায় শুধু প্রতিহিংসাই নেয়া হয়েছে, তা অতীতকে মুছে দিতে পারে নি। সারা পৃথিবীর সব সন্ত্রাসবাদীই বোমা-বারুদ ব্যবহার করেছে, কিন্তু বিদ্রোহীদের সংগ্রাম তহবিলের জন্য ডাকাতির পদ্ধতি ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীরা কয়েক বছর আগেকার রুশ আন্দোলন থেকে নেয়। ইতালীয় বিদ্রোহের ইতিহাস থেকেও তারা অনুপ্রেরণা পেয়েছিল এবং যদিও কাভ্যুরের কোন ভারতীয় জীবনী পাওয়া যায় না, তবু লাজপৎ রায়ের ম্যাট্‌সিনীর জীবনী এবং বিনায়ক সাভারকর অনূদিত ম্যাট্‌সিনীর আত্মজীবনী বিপ্লবীদের সাধারণ পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত হয়ে গিয়েছিল। পুলিশ যখনই জাতীয়বাদীদের আস্তানায় তল্লাসী করেছে তখনই অন্য অনেক বিপ্লবাত্মক রচনার মধ্যে ইউরোপের ইতিহাসের বিভিন্ন বিদ্রোহের পর্যায়ের বই তারা পেয়েছে।"[২৭]

কেবলমাত্র আয়ারল্যাণ্ডেই নয় ইংল্যাণ্ডেও ধিংরার প্রাণনাশের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। উইলফ্রিড ব্লান্ট, যিনি রাষ্ট্রদূতের কাজ করেছিলেন এবং ভারতেও বহুস্থানে ভ্রমণ করেছিলেন, তিনি লিখেছিলেন, "লয়েড জর্জ উইনস্‌টন্ চার্চিলের কাছে দেশপ্রেমী হিসেবে ধিংরার প্রভূত প্রশংসা করেন। চার্চিলও তাঁর সঙ্গে একমত হন এবং ধিংরার শেষ উক্তি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে ওই পঙ্‌ক্তি অন্যতম। তাঁরা ধিংরাকে প্লুটার্কের অমর নায়কদের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।"[২৮]

ধিংরা প্রসঙ্গে উইলফ্রিড ব্লান্ট একবার ইংরেজ সম্রাটের বন্ধু লাইন স্টিভেন্‌সের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ব্লান্ট লিখেছিলেন, "তিনি (স্টিভেন্‌স) ধিংরার খুনের ব্যাপারে সম্রাটের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন এবং বোধ হয় অবশেষে সম্রাটের মনে হয়েছিল যে ভারতের পরিস্থিতিতে একটা গোলযোগ আছে। লোকে বলে যে রাজনৈতিক খুন তার নিজের উদ্দেশ্যকেই বিনষ্ট করে, কিন্তু তা সর্বৈব ভুল। স্বার্থপর শাসকদের এমনি আচম্‌কা একটা আঘাত দরকার, যাতে তারা বুঝতে পারে যে স্বার্থপর মূর্খতার একটি সীমা আছে। অনেকে এও বলেন যে ইংল্যাণ্ড নাকি কখনও ভয় দেখানোর কাছে নতি স্বীকার করে না। আমার অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমার মনে হয় যে ইংল্যাণ্ডের গালে যখন জোর চড় পড়ে তখনই সে মাপ চায়, তার আগে নয়।"[২৯]

এমনকি অ্যানি বেসান্ট, যিনি পরবর্তী কালে 'হোমরুল' আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী হয়েছিলেন, তিনিও বলেছিলেন, "ইংল্যাণ্ডে রাজনৈতিক সংস্কারের অন্যতম স্বীকৃত পথ হল বলপ্রয়োগ . . . যদি জমিদারদের গুলি করা না হত আর তাদের গরু-মহিষ নষ্ট করে না দেয়া হত তাহলে 'হোমরুল' বিল আসত না, দাঙ্গা আর রক্তপাত ছাড়া ১৮৩২ সালের

সংস্কারের আইন পাস হত না। পরবর্তী আইন-সংস্কারও হত না যদি হাইড পার্কের রেলিঙ ভেঙে না পড়ত। "অন্যত্র, মহিলাদের ভোটাধিকার আন্দোলনের পক্ষে যে কিছু বলপ্রয়োগ হয়েছিল সে প্রসঙ্গে বেসান্ট জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এ ছাড়া আর কিসে রাজনীতিকরা নতি স্বীকার করেছেন ?"[৩০]

যদিও অ্যানি বেসান্ট বলেছিলেন যে বলপ্রয়োগের ফলে অনেক সময়েই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, তবুও ভারতে তিনি এই পদ্ধতির প্রয়োগ কখনই সমর্থন করেন নি। চরমপন্থী নেতা অরবিন্দ ঘোষ সন্ত্রাস-বাদীদের প্রশ্রয় দেন এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বেসান্ট ঘোষণা করেন, "অরবিন্দ ঘোষ, যাঁকে এখনই ছেড়ে দেয়া হয়েছে, তিনি ম্যাট্‌সিনীর মতো মানুষ, পার্থক্য শুধু তিনি উন্মাদ আর ম্যাট্‌সিনী তা ছিলেন না। ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্র হলেন তিনি। তাঁর উদ্দেশ্য সাধু ও নিঃস্বার্থ। তাঁর স্বার্থসিদ্ধির কোনো অভিলাষ নেই। কিন্তু তিনি হলেন বিপজ্জনক, কেননা ব্রিটিশ শাসন তুলে দেয়ার জন্য তিনি সব কিছু করতে পারেন।"[৩১]

অরবিন্দ, যিনি গভীরভাবে ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি বহু বিপ্লবীকে অনুপ্রাণিত করেছেন। কিছু কিছু ধর্মীয় নেতা আয়ারল্যাণ্ডের মতই ভারতেও সন্ত্রাসবাদীদের প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে উৎসাহ দিতেন। আবার কয়েকটি সংবাদপত্রে হিংসার পথকে খোলাখুলি সমর্থন জানানো হয়। মুজঃফরপুরে এক ইংরাজ বিচারকের জীবননাশের প্রচেষ্টায় যখন দুটি ইংরাজ মহিলার প্রাণ যায় তখন 'যুগান্তরে' লেখা হয়, "যদি শত্রুনাশের প্রয়াসে ঘটনাচক্রে এক রমণীর প্রাণ যায়, তাহলে ইংরাজদের অসন্তোষ হতে পারে কিন্তু ভগবানের অসন্তোষের কোন কারণ ঘটবে না . . . পৃথিবীর বুক থেকে অসুর জাতির বিনাশের জন্য অনেক রাক্ষসীর প্রাণ হয়ত যাবে।"[৩২] বিপ্লবী পত্রপত্রিকাগুলিতে নৈরাজ্যবাদী পদ্ধতির এবং বোমা-বারুদ ব্যবহারের প্রশস্তি করা হত। বলা হত যেন মাতৃভূমির হত্যার প্রতিহিংসায় রক্তদান করা হয়। আহ্বান জানানো হত যেন ভারতের বিরাট যজ্ঞানলে ঘৃতাহুতি না দিয়ে রক্তাহুতি দেয়া হয়, কারণ কেবলমাত্র এই পথেই শক্তি ও ধ্বংসের হিন্দু দেবী কালীকে তুষ্ট করা যাবে।[৩৩]

এমনকি ভগদ্‌গীতাতেও হত্যার সমর্থনে যুক্তি খোঁজা হত। হত্যাকে বলা হত মায়ের লীলা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জননীর জ্ঞানাতীত লীলা। এতেও যাঁরা দ্বিধাগ্রস্ত বা সন্দেহী তাঁদের জন্য বারীন্দ্র ঘোষ বলেছিলেন, "বেদ ভুলে যাও, বেদান্ত ভুলে যাও। উপনিষদ ভুলে যাও, মাতৃভূমিকে রক্ত দিয়ে মুক্ত করো।"

অনেক সন্ত্রাসবাদীই ছিলেন বিশেষ ভাবে ধর্মভীরু। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে পাশ্চাত্যে যাই হোক না কেন, ভারতে ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করা যাবে না। বিবেকানন্দ ও অন্যান্যদের রচনা পাঠ করে তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে ভারতের মানুষকে কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক কাজে অনুপ্রাণিত করা যাবে তখনই যখন তাদের বিশ্বাস করানো যাবে যে এই সব কাজের একটা ধর্মীয় অর্থ আছে।[৩৪] তাঁদের এই ধারণা জন্মেছিল যে মৃত্যু-ভয়কে তুচ্ছ করার জন্য যে সাহসিকতার প্রয়োজন তা কোনো ধরনের ধর্মীয় অনুশীলন ছাড়া সম্ভব নয়।[৩৫]

নূতন শিক্ষানবীসদের সন্ত্রাসবাদে দীক্ষিত করার জন্য কিছু কিছু নেতৃস্থানীয় সন্ত্রাসবাদী সাধুদের সাহায্যও নিয়েছিলেন।[৩৬] শিক্ষানবীসদের ভগবদ্‌গীতা, বিবেকানন্দের রচনাবলী[৩৭] ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' পড়ানো হত। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ পরিস্থিতিতে 'ধর্মযুদ্ধের'[৩৮] সমর্থন করেছিলেন। বিদেশী শাসকদের হত্যার সমর্থনে সন্ত্রাসবাদীরা গীতার এই কথা উল্লেখ করতেন। 'আনন্দমঠ'-ও সেই একইভাবে উল্লিখিত হত। আনন্দমঠের[৩৯] 'সন্তানেরা' ঈশ্বরের শত্রুকে হত্যা করা তাঁদের ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন।[৪০] অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বলপ্রয়োগ বা বিপ্লবী কর্মসূচীতে বিশ্বাস করতেন এরকম কোন প্রমাণ নেই, বরঞ্চ আনন্দমঠের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন যে তাঁর এই বইটি লেখার উদ্দেশ্য, ব্রিটিশ যে বাঙলাদেশকে নৈরাজ্যের হাত থেকে বাঁচিয়েছে এবং বিপ্লবাত্মক পদ্ধতি অনুসরণে যে মৃত্যু এবং ধ্বংস ছাড়া আর কোন ফললাভ হয় না তাই দেখানো। কিন্তু এ কথাও অনস্বীকার্য যে লেখকের যে সন্তানদের সহিংস কর্মপদ্ধতির প্রতি সহানুভূতি নেই সে কথা বইটির শেষ অবধি না পৌঁছলে মনে হয় না।

সন্ত্রাসবাদীরা পাশ্চাত্যের বিদ্রোহের ইতিহাস ও হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পড়তেন এবং উভয় দিক থেকেই সমর্থন ও অনুপ্রেরণা পেতেন। সন্ত্রাসবাদীরা মনে করতেন যে একমাত্র ধর্ম থেকেই রাজনৈতিক জাতীয়তাবোধের শক্তি সঞ্চারিত হতে পারে। ধর্মচিন্তা থেকে দেশপ্রেম সঞ্চারের বহুল দৃষ্টান্ত বাঙলা দেশে আছে। কলিকাতায় স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষা দেয়া হত কালীমন্দিরের চত্বরে সাধারণ সভা ডেকে। গীতায় অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন রাজনৈতিক হত্যার সমর্থনে ব্যবহার করা হত। রুশ নৈরাজ্যবাদের বোমা-বারুদের পথের সাথে ধ্বংসের দেবতা শিবের ধর্মাচরণের পথকে মিশিয়ে দেওয়া হোতো।

জঙ্গী জাতীয়তাবাদী ও সন্ত্রাসবাদীরা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে এতই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন যে তাঁরা মনে করতেন, রাজনীতিতে শান্তি ও ক্ষমার নম্রগুণগুলির কোন স্থানই থাকতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় এই চিন্তারই প্রতিফলন দেখা যায়ঃ

> "ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
> দয়াহীন সংসারে।
> তারা বলে গেল, ক্ষমা করো সবে, বলে গেল, ভালোবাসো
> অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো।
> স্মরণীয় তারা বরণীয় তারা তবুও বাহির দ্বারে
> আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।"

সন্ত্রাসবাদীদের কোনো স্পষ্ট রাজনৈতিক দর্শন ছিল না। তাঁদের মধ্যে মুষ্টিমেয় ব্যকুনিনের নৈরাজ্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।[৪১] কিছু কিছু সন্ত্রাসবাদী অস্পষ্ট সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাস করতেন, কেউ কেউ করতেন বিবেকানন্দের ধর্মীয় চিন্তাধারায়, কিন্তু বেশীর ভাগ সন্ত্রাসবাদীরই কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দর্শন ছিল না।[৪২] তাঁরা ছিলেন জঙ্গী জাতীয়তাবাদী। তাঁদের প্রাথমিক বা মূল লক্ষ্যে কোন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা

ছিল না, ছিল এমন এক সরকার প্রতিষ্ঠা যা ভারতীয়দের হাতে থাকবে, বিদেশীদের হাতে নয়। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে পরিস্থিতির ঘটনাপ্রবাহই ঠিক করবে সফল বিপ্লবের ফলে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সরকারের প্রধান কে হবেন---একজন সার্থক সৈনিক অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধরনে এক রাষ্ট্রপতি বা আর কেউ।[৪৩]

সন্ত্রাসবাদীরা পদ্ধতির দিক থেকে ইউরোপীয় নৈরাজ্যবাদীদের কিছুটা অনুসরণ করতেন কিন্তু তাঁরা রাষ্ট্রীয় দর্শনে নৈরাজ্যবাদের উদ্গাতা ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন অনুভূতিপ্রবণ দেশপ্রেমিক। তাঁরা যে ইউরোপীয় সন্ত্রাস-বাদী ও নৈরাজ্যবাদীদের অনুসরণ করতেন সেটা তাঁদের রাজনৈতিক তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন বলে নয়, তাঁদের বোমা-বারুদের রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন বলে। পরবর্তী পর্যায়ে মাঝে মাঝে সংগ্রামী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ব্ল্যাংকিবাদের পথ নিয়েছিল, ব্ল্যাংকির বিদ্রোহী সৈন্যদলের মত তাঁরাও অতর্কিত আক্রমণে ক্ষমতা অধিকারের প্রয়াসী হয়েছিলেন।

ইউরোপে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা এই সময়ে বিদেশের সহায়তায় ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রয়াস করেছিলেন। এইসব বিপ্লবীর মধ্যে ছিলেন 'গাদর' দলের সভ্যরা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পাঞ্জাব থেকে যাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে গিয়েছিলেন, প্রধানতঃ সেই লোকদের নিয়ে এই গাদর দল গঠিত হয়েছিল। প্রবাসী ভারতীয় ছাত্ররা এইসব লোকের মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রচার করতেন বিপ্লবাত্মক পত্রপত্রিকার মাধ্যমে, যেমন শ্যামাজী কৃষ্ণ বর্মার 'ইণ্ডিয়ান সোসিয়োলজিস্ট' বা মাদাম কামার 'বন্দে মাতরম্' রচনা-গুলো পড়ে এবং বুঝিয়ে দিয়ে। এই সময়ে এই সব পত্রিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উন্মুক্তভাবে প্রবেশ করার কোন বাধা ছিল না। ১৯১৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'গাদর' দলের জন্ম হয়।

'গাদর' দল প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব নেয়া হয় তার মধ্যে বলা হয়েছিল যে এই দলের উদ্দেশ্য হবে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিতাড়ন ও জাতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এই উদ্দেশ্যে পৌছানোর পদ্ধতি হবে সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লব। 'গাদর' দলের প্রত্যেক সভ্যকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যাতে তারা বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।[৪৪] ১৯১৩ সালের ১লা নভেম্বর সানফ্রানসিস্কোতে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গাদর' প্রথম প্রকাশিত হয়। এর প্রথম সংখ্যায় লেখা হয়েছিল, "আজ এই বিদেশ ভূমি থেকে শুরু হল.. ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম...আমাদের নাম কি? বিপ্লব। আমাদের কাজ কি? বিপ্লব। বিপ্লব কোথায় শুরু হবে? ভারতে। সময় এসেছে যখন কাগজ আর কালির জায়গা নেবে রাইফেল আর রক্ত।"[৪৫]

'গাদর' দলের লক্ষ্য ছিল ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে ভাঙন আনা, রাজভক্ত প্রজা ও আমলাদের হত্যা করা, জেল ভাঙা, রাজকোষ ও থানা লুঠ করা, রাজদ্রোহমূলক পত্রপত্রিকা বিতরণ করা, বোমা বানানো, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও ডাকাতি করা, গুপ্ত সমিতি স্থাপন করা, রেল যোগাযোগ ও টেলিগ্রাফ ধ্বংস করা, বিপ্লবী যুবকদের দলে আনা এবং ব্রিটিশের শত্রুদের সঙ্গে মিতালি করা।

যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধে তখন ভারতীয় বিপ্লবীরা প্রধানতঃ ছিলেন জর্মানীতে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল দুটি : এক, ভারতে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানো, যাতে ব্রিটিশ শক্তি ভারতীয় সেনানীদের পাশ্চাত্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভারতে ফেরত পাঠাতে বাধ্য হয়, এবং, দুই, ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে হিন্দুদের জাতীয়তাবাদী আবেগ জাগিয়ে এবং মুসলমানদের তুরস্কের স্বপক্ষে ধর্মীয় আবেদন করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তোলা, যাতে তারা ব্রিটিশের পক্ষে অথবা জর্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে।

বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এই সময়ের ঘটনাবলী সম্বন্ধে একটি বিবরণী রেখে গেছেন.। তিনি লিখেছিলেন যে যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীরা সেখানকার জর্মান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রস্তাব দেন যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বৈরীভাব এবং জর্মানীর পক্ষে তাঁদের বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য একটি ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক দলকে অ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদি নিয়ে যেন জর্মানীতে যেতে দেয়া হয়। এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং লাহোর কংগ্রেসের সম্পাদক থানচাঁদ ভার্মা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত জর্মান রাষ্ট্রদূত এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তা বার্লিনে পাঠিয়ে দেন; আর তিনি এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে ও তার সমস্ত ব্যয় বহন করতে সম্মত হন। এই বিপ্লবীরা তখন ক্যালিফর্নিয়ার 'গাদর' দলের নেতা রামচন্দ্রকে শিখ সম্প্রদায় থেকে এই সব স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ জানান। কিন্তু রামচন্দ্র এতে অসম্মত হন এবং বলেন যে এই সৈন্যদের ভারতে পাঠালে আরও অনেক বেশী উপকার হবে। রামচন্দ্রকে বোঝানোর জন্য বলা হয় যে, যেহেতু ব্রিটিশরা ভারতীয় সৈন্যদের ব্যবহার করবেই এবং দুনিয়াকে বলবে যে ভারতীয়রা রাজভক্ত, সেই কথা মনে রেখে এবং এই প্রচার বন্ধ করার জন্য এদের জর্মানীতে পাঠানোতেই বেশী কূটনৈতিক যুক্তি আছে। কিন্তু রামচন্দ্র তাতে সম্মত হতে পারেন নি এবং ফলে প্রস্তাবটি কার্যকরী হয় নি।[৪৬]

মানবেন্দ্রনাথ রায় আর একজন বিপ্লবী, তাঁর স্মৃতিচারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন ভারতীয় বিপ্লবীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে লিখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধার পর নির্বাসিত ভারতীয় বিপ্লবীরা জর্মানীতে বহু প্রত্যাশা নিয়ে যান। কিছুদিন পর ভারতেও খবর পেঁছয় যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য জর্মান সরকার বার্লিনে বিপ্লবী কমিটিকে অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ দিতে রাজী হয়েছে। আগুনের মত এ খবর চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। ভারতে গুপ্ত বৈঠকের পর আসন্ন বিদ্রোহের জন্য সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত হয় এবং যতীন মুখোপাধ্যায় তার প্রধান সেনানায়ক নির্বাচিত হন। বার্লিনে দূত পাঠানো হয় এই কথা বলে যে জর্মান সরকার ভারতের কাছাকাছি এক নিরপেক্ষ দেশে অর্থাৎ ওলন্দাজ ঈস্ট ইণ্ডিজে যেন ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেন।

১৯১০ সালের শেষভাগে মানবেন্দ্রনাথ জাভায় যান এবং দুইমাস পরে তিনি সামান্য কিছু অর্থ নিয়ে ফিরে আসেন। পরে, ১৯১৫ সালের গোড়ায় মানবেন্দ্রনাথ আবার ভারত ত্যাগ করেন। এবার তিনি জাপানে যান এই

আশায় যে রাসবিহারী বসু, যিনি জাপানে সেই একই উদ্দেশ্যে আগেই গিয়েছিলেন, তিনি তাঁকে কিছু সাহায্য করতে পারবেন। কিন্তু জাপানেও মানবেন্দ্রনাথ কোন সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি।

বিপ্লবী 'বার্লিন কমিটি'র প্রাণশক্তি ছিলেন সরোজিনী নাইডুর ভাই বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ইংল্যাণ্ডে ছাত্রাবস্থায় তিনি সাভারকরের নেতৃত্বে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। সাভারকরের গ্রেপ্তার ও নির্বাসনের পর তিনি ফ্রান্সে আশ্রয় নেন এবং সেখানে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচারের নেতা মাদাম কামা ও কৃষ্ণ বর্মার সংস্পর্শে আসেন। বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় হয় নিজের চেষ্টায় অথবা জর্মানদের আমন্ত্রণে বার্লিনে চলে আসেন। মানবেন্দ্রনাথ লেখেন, "বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছাড়া হরদয়ালই ছিলেন বার্লিন কমিটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতা। বুদ্ধিগত দিক থেকে যদিও তাঁর স্থান বেশ উপরে তবু তাঁর অনুভূতিগত দিক ছিল খামখেয়ালী এবং রাজনৈতিক দিক অসংবদ্ধ। এক গোঁড়া হিন্দু থেকে তিনি নৈরাজ্যবাদী হয়ে যান এবং তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলেকজাণ্ডার বার্কম্যান ও এম্মা গোল্ডম্যানের সহচর ছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদই ছিল তাঁর প্রবলতম প্রেরণা। তিনি বার্লিনে যান সেখানকার ভারতীয় বিপ্লবী কমিটিতে যোগ দিতে, কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বেধে যায়।"[৪৭]

১৯১৫ সালের গোড়ায় জর্মান পররাষ্ট্র দপ্তর আফগানিস্তানে একদল প্রতিনিধি পাঠান। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্তানকে ব্রিটিশ প্রভাবের বাইরে নিয়ে আসা এবং সেখান থেকে ভারতে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচার চালানো। উত্তর প্রদেশের হাথরাশের রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ এই প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য ছিলেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ইউরোপে গিয়েছিলেন এবং যুদ্ধ হওয়ার ফলে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে আটকে পড়েছিলেন। তিনি বার্লিন যেতে রাজী হন কাইজার স্বয়ং তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন এই শর্তে। জর্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের অনুমতি নিয়ে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের এই শর্তে সম্মত হন। মহেন্দ্রপ্রতাপ বার্লিনে আসেন এবং ভারতীয় বিপ্লবী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন, কিন্তু কাইজারের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার শেষ পর্যন্ত ঘটে নি।[৪৮]

ভারতীয় ও জর্মান যে প্রতিনিধি দলের আফগানিস্তানে যাবার কথা ছিল, সেই দল পারস্যের মধ্য দিয়ে কাবুল পৌঁছায়। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন জর্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্যারন ভন্ হেনটিগ্। ১৯১৫ সালের ২রা অক্টোবর এই প্রতিনিধিদল কাবুল পৌঁছায় এবং তার কয়েকদিন পরই তাঁরা আফগানিস্তানের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরে ১৯১৫ সালের ১লা ডিসেম্বর কাবুলে এক অন্তর্বর্তীকালীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ তার রাষ্ট্রপতি, বরকতুল্লা তার প্রধানমন্ত্রী এবং ওবেদুল্লা তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হন।[৪৯] এই বিপ্লবী দলের আশা ছিল যে ব্রিটিশ যুদ্ধে পরাজিত হবে এবং ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও সামরিক বিদ্রোহ সংঘটিত হবে। মিত্রশক্তি যুদ্ধে জয়ী হওয়ার ফলে বিপ্লবীদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থই হয়ে গেল।

গান্ধীজী ও আইন অমান্য আন্দোলন

১৯১৯ সালে গান্ধী রাওলাট বিলের প্রতিবাদে ভারতবর্ষে প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই বিলে প্রচারের উদ্দেশ্যে যে-কোন সরকার-বিরোধী কাগজপত্র কাছে রাখা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হয়।

যখন বিলটি উত্থাপিত হয় তখন গান্ধী আমেদাবাদে রোগমুক্তির পর বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। বল্লভভাই প্যাটেলের জিজ্ঞাসার উত্তরে গান্ধী বলেন, "যদি মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকও সত্যাগ্রহের শপথে স্বাক্ষর করে এবং তা সত্ত্বেও বিলটি আইনে পরিণত করা হয়, তাহলে আমাদের উচিত তৎক্ষণাৎ সত্যাগ্রহ শুরু করা। আমি যদি এই রকম শয্যাশায়ী হয়ে না থাকতাম তাহলে আমি একাই এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করতাম এবং আশা করতাম যে অন্যেরাও আমাকে অনুসরণ করবে।"[১]

গান্ধী নিজেই একটি সত্যাগ্রহ শপথের খসড়া তৈয়ারী করেন এবং ১৯১৯ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তাতে স্বাক্ষর করেন। এতে বলা হয়েছিল যে সত্যাগ্রহীরা শান্তিপূর্ণভাবে আইন অমান্য করবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে এ একটা যুগ-পরিবর্তনের মুহূর্ত।

১৯১৯ সালের মার্চ মাসে সত্যাগ্রহ-সভা নির্দেশ দেয় যে প্রাথমিকভাবে তাঁরা নিষিদ্ধ পত্রাদি রাখার এবং সংবাদপত্র প্রকাশ করার আইন অমান্য করবেন। সত্যাগ্রহ-সভা যে ক'টি নিষিদ্ধ পত্র-পত্রিকা প্রচার করবার সিদ্ধান্ত নিলেন, সেগুলি হল গান্ধীর 'হিন্দ স্বরাজ', 'সর্বোদয়' ('আনটু দি লাস্ট' গ্রন্থের অনুবাদ), 'স্টোরী অফ্ এ সত্যাগ্রহী' (প্লেটোর 'ডিফেন্স অ্যাণ্ড ডেথ অফ্ সক্রেটিস' গ্রন্থের অনুবাদ) এবং মুস্তাফা কামাল পাশার জীবনী ও বক্তৃতার সঙ্কলন।[২]

আইন অমান্যের নীতিকে রূপায়িত করার জন্য গান্ধী কর্তৃক সম্পাদিত অরেজিস্ট্রিকৃত একটি সাপ্তাহিক পত্র, 'সত্যাগ্রহ' প্রকাশ করা শুরু হয় এবং এক পয়সা দামে বিক্রয় হতে থাকে। এর প্রথম সংখ্যায় (১৯১৯ সালের ৭ই এপ্রিল) গান্ধী লেখেন যে প্রত্যেক সত্যাগ্রহ-কেন্দ্র থেকে একটি করে অরেজিস্ট্রিকৃত সংবাদপত্র প্রকাশের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। এর পরে গান্ধীর নেতৃত্বে বহু সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছায় কারাবাস বরণ করে নেন। এই-ভাবেই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার—'সত্যাগ্রহ' জন্ম নেয়। অবশ্য ব্রিটিশ শাসনের অবসান ও দেশের রাজ-নৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী এই হাতিয়ারটিকে অব্যবহৃত রাখেন নি।[৩]

ভারত সরকার ১৯১৯ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী রাওলাট বিলটি উত্থাপন করেন। গান্ধীর অনুপ্রেরণায় এর প্রতিবাদে ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল এক সর্বভারতীয় হরতাল পালিত হয়। তারপরই ৯ই এপ্রিল দুই জাতীয়তাবাদী নেতা, ডঃ সত্যপাল ও ডঃ কিচ্‌লু দ্বীপান্তরিত হন এবং অমৃতসরে গোলযোগ শুরু হয়।[৪]

১৯১৯ সালের ১১ই এপ্রিল জেনারেল ডায়ার অমৃতসরে পৌঁছান। তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করতে থাকেন এবং সমস্ত সভা শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে দেন। ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে একটি জনসভা আহূত হয়। সভা শুরু হওয়ার পর জেনারেল ডায়ার সেখানে সেনাবাহিনী ও সাঁজোয়া গাড়ী নিয়ে উপস্থিত হন। তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রবেশপথের সন্নিহিত উঁচু জমির ওপর সৈন্য সমাবেশ করেন এবং কারুকে সাবধান না করেই জনসভায় আগত বিরাট জনতার ওপর গুলিবর্ষণের আদেশ দেন। ডায়ারের নিজের হিসেবে সেখানে ৬০০০ মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন, অন্য হিসেবে এই সংখ্যা হবে ১০,০০০। ১,৬৫০ বার গুলি চালানো হয়। সরকারী হিসেবেই সেখানে প্রথমে ২৫০ জন নিহত হন বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়, পরে সেটা বাড়িয়ে বলা হয় ৫০০ জন। বে-সরকারী হিসেবে নিহতের সংখ্যা ১০০০। সমস্ত ভারতবর্ষ এই পাশবিক হত্যাকাণ্ডে বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে যায়। এই হত্যাকাণ্ড স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস সুনিশ্চিতভাবে পরিবর্তিত করে দেয়।

পরবর্তী কালে লর্ড হান্টারের নেতৃত্বে পাঞ্জাবে বিশৃঙ্খলা ও হত্যা-কাণ্ডের সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। ১৯১৯ সালের অক্টোবরে এই কমিটি কাজ শুরু করে। তার অব্যবহিত পরে, ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে, গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট্ ১৯১৯, (যাতে আইন সভাগুলিকে কিছু পরিমাণ ক্ষমতা দেয়া হয়) রাজকীয় অনুমতি পায়। কিন্তু আইনের এই সংস্কার জাতীয়তাবাদী প্রত্যাশার তুলনায় খুবই নগণ্য ছিল।

১৯২০ সালের মে মাসে তুরস্ককে যে শর্তে শান্তি-চুক্তির প্রস্তাব দেওয়া হয় তাকে মুসলমানেরা ব্রিটিশ সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করেন। ভারতীয় মুসলমানেরা এতে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। গান্ধী তাঁদের অসহযোগ আন্দোলন শুরু করতে পরামর্শ দেন। কিছুদিন পরে, ১৯২০ সালের ২৮শে মে, বোম্বাইতে এক জনসভায় কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটি অসহযোগের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। পরে ১৯২০ সালের ১লা আগস্ট কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটি গান্ধীর নেতৃত্বে এক সর্বভারতীয় হরতালেরও ডাক দেন। খিলাফৎ আন্দোলনে গান্ধীর সমর্থন ভারতীয় মুসলমানদের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুখ্য ধারায় নিয়ে আসে।

১৯২০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের এক বিশেষ সভায় সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার প্রস্তাবটি বিবেচিত হয়। এই সমাবেশে গান্ধী একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন যে খিলাফৎ প্রশ্নে ব্রিটেন মুসলমানদের প্রতি তার কর্তব্য পালন করে নি এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে নি, সুতরাং এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস মনে করে যে, যে আন্দোলন গান্ধীর নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে সেই অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ক্রমবর্ধমানভাবে যতদিন না এই দুই অন্যায়ের প্রতিকার হয় ততদিন চালিয়ে যাওয়া উচিত। এই প্রস্তাবে জনসাধারণকে অনুরোধ করা হয় সরকারী সমস্ত খেতাব

পরিত্যাগ করতে, সরকারী অনুষ্ঠানে যোগ না দিতে, ক্রমে ক্রমে সরকারী বিদ্যালয় ও আদালত থেকে সরে আসতে, পরিশোধিত আইন সভায় সদস্য না হতে, এবং বিদেশী পণ্যদ্রব্য বর্জন করতে।

১৯২০ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর কলকাতা কংগ্রেসের প্রকাশ্য সমাবেশে চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিন পাল, অ্যানি বেসান্ট, মালব্য, জিন্না এবং অন্যান্যদের বিরোধিতা সত্ত্বেও এই প্রস্তাব পক্ষে ১৮৮৬ ও বিপক্ষে ৮৮৪ ভোটে গৃহীত হয়ে যায়।

রীতি অনুসারে কলকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের গৃহীত প্রস্তাব সাধারণ অধিবেশনে পরবর্তী কালে অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অসহ-যোগ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটি পুনর্বার বিবেচিত হবে এই বিশ্বাসে ১৪০০০-এরও বেশী সদস্য এই অধিবেশনে যোগদান করেন। চিত্তরঞ্জন দাশও গান্ধীর এই অসহযোগ নীতির বিরোধিতা করার জন্য এক শক্তিশালী সদস্য দল নিয়ে এসেছিলেন; কিন্তু নাগপুরে নেমে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন এবং বিপিন পাল প্রমুখদের বিরোধিতা সত্ত্বেও গান্ধীকে সমর্থন করেন। বিপিন পাল, অ্যানি বেসান্ট, মালব্য ও জিন্না অসহযোগ নীতির বিরোধিতা করলেন কিন্তু তাঁরা পুনরায় ব্যর্থ হলেন।

এইভাবে গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন চলে। এই আন্দো-লনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিক ছিল। ইতিবাচক দিকে ছিল স্বদেশী দ্রব্যের প্রসার, বিশেষ করে হস্তচালিত সুতা ও বয়নশিল্পের পুন-র্জাগরণ, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবিধান, মাদকদ্রব্য বর্জন এবং তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে কয়েক কোটি টাকা সংগ্রহ। নেতি-বাচক দিক মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত: আইন সভা, আদালত ও সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বর্জন।

সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বর্জনের কার্যক্রম ছাত্রদের ধর্মঘটের ফলেই সফল হয়। মাদকদ্রব্য ও বিদেশী পণ্য পরিহারও ধর্মঘটের ফলে বহুলাংশে সফল হয়। আইনসভা বর্জনের ফলে স্বাভাবিকভাবেই অকংগ্রেসীরা এই সভাগুলিতে নির্বাচিত হয়ে গেলেন। আর আইন আদালত বর্জনের ব্যাপারে নেতৃত্ব দিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহেরু—যাঁরা দুজনেই আইন ব্যবসায়ের মাধ্যমে রাজকীয় অর্থোপার্জন স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করলেন।

১৯২১ সালের জুলাই মাসে ইংল্যাণ্ডের যুবরাজের ভারত পরিভ্রমণ বর্জন করার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১৯২১ সালের নভেম্বরে যুবরাজ যখন বোম্বাইতে পদার্পণ করলেন তখন সমগ্র ভারতবর্ষে হরতাল পালিত হল।

১৯২১ সালের ডিসেম্বরে আমেদাবাদে কংগ্রেসের বার্ষিক সমাবেশে মাত্র ৪,৭৬২ জন সদস্য যোগদান করেন—নাগপুরের ১৪,৫৮৩ জনের তুলনায়। অবশ্য ইতিমধ্যে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য প্রায় ৪০,০০০ কংগ্রেসকর্মী কারাগারে বন্দী হয়েছেন। এই অধিবেশনে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী গান্ধী ভাইসরয়কে লেখেন যে ব্যাপক অসহ-

যোগ আন্দোলন শুরু করা হবে গুজরাটের সুরাট জেলার ৮৭,০০০ অধিবাসি-বিশিষ্ট একটি ছোট তহশিল, বরদৌলি থেকে।

গান্ধী এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার জন্য বরদৌলি যাত্রা করলেন। কিন্তু ১৯২২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী চৌরিচৌরা থেকে সহিংস ঘটনার সংবাদ এসে পৌঁছালো। সেখানে পুলিস একটি শোভাযাত্রার ওপর গুলি চালনা করে, কিন্তু তাদের অস্ত্র ফুরিয়ে যাবার পর তারা একটি বাড়িতে আত্মগোপন করে। উত্তেজিত জনতা বাড়িটিতে আগুন দেয় এবং পরে বাইশ জন পুলিসকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। এই ঘটনার পর গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন থামিয়ে দেন।

গান্ধী গ্রেপ্তার হন এবং সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারের অভিযোগে ১৯২২ সালের মার্চ মাসে তাঁর বিচার হয়। বিচারক মন্তব্য করেন যে যদিও তিনি যত মানুষের বিচার করেছেন এবং ভবিষ্যতে করবেন তাদের থেকে গান্ধী একজন স্বতন্ত্র মানুষ—তবুও আইন ব্যক্তিকে সম্মান দেয় না। গান্ধীর জরিমানা এবং কারাদণ্ড দুই-ই হয়। ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কারাভোগ করার পর গান্ধী ছাড়া পান।

এদিকে অসহযোগ আন্দোলন ও অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক ঘটনা দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। ১৯২৬ সালে যখন লর্ড রীডিং-এর উত্তরাধিকারী লর্ড আরউইন কার্যভার গ্রহণ করেন তখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটছিল। শুধু-মাত্র অবদমন নীতির দ্বারা রাজ্যচালনা সম্ভব হবে না—এই উপলব্ধির ফলে ১৯২৭ সালে নভেম্বর মাসে ব্রিটিশ সরকার স্যার জন সাইমনের সভাপতিত্বে একটি আইনানুগ কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশনকে গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট্ ১৯১৯-এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিবরণ প্রস্তুত করতে বলা হল যাতে আরও সংস্কারের কথা বিবেচনা করা সম্ভব হয়। সাইমন কমিশনে কোন ভারতীয়কে সদস্য করা হয় নি, এবং তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের প্রায় সব রাজনৈতিক দল এই শ্বেতাঙ্গ-সর্বস্ব কমিশনকে বর্জন করলেন। ১৯২৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী, যেদিন সাইমন কমিশন বোম্বাই পৌঁছলো, সেদিন দেশব্যাপী হরতাল পালন করা হয়।

এই পরিস্থিতিতে ১৯২৮ সালে দিল্লীতে বিভিন্ন ভারতীয় রাজনৈতিক দলের এক সম্মেলন হয় ভারতের জন্য একটি নূতন সংবিধানের খসড়া তৈয়ারী করার জন্য। এর ফলে মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে একটি বিবরণী প্রস্তুত হয়, যার নাম দেয়া হয় 'নেহেরু রিপোর্ট'। এই রিপোর্টে ঘোষণা করা হল যে ভারতীয় রাজনৈতিক প্রয়াসের লক্ষ্য হবে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' লাভ। কিন্তু এই বিবরণী কংগ্রেসের মধ্যেই এক তিক্ত মতদ্বৈধের সৃষ্টি করে। বয়োজ্যেষ্ঠরা এই বিবরণীকে সমর্থন করলেন কিন্তু বয়ঃ-কনিষ্ঠরা, মতিলালের পুত্র জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস'-এর পরিবর্তে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুললেন।

মালব্য, জিন্না এবং কংগ্রেসের অন্যান্য অগ্রজ নেতারা বললেন যে কংগ্রেসের লক্ষ্য যে 'স্বরাজ' তার অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতা নয়, 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস'। তাঁদের মতে রক্তপাত ছাড়া ইংরেজ কখনই পূর্ণ স্বাধীনতা দেবে

না, আর 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' হল, ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে মতিলাল নেহেরুর ভাষায় "a considerable measure of freedom bordering on complete independence."[৫]

অগ্রজ নেতারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীদের আন্তঃসাম্রাজ্য সম্পর্ক কমিটির 'ডোমিনিয়ন' সংক্রান্ত মতামতের উল্লেখ করলেন, যাতে এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছিল, "Autonomous communities within the British Empire equal in status and in no way subordinate one to another in any aspect of their domestic or external affairs though united by the common allegiance to the Crown and freely associated as members of the British Commonwealth of Nations".[৬] তারা যুক্তি দেখালেন যে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাসে' যে ক্ষমতা থাকবে কার্যকরী দিক থেকে স্বাধীনতায় তার চেয়ে বেশী কিছু পাওয়া যাবে না অথচ সংগ্রাম ছাড়া পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া সম্ভব হবে না। অ্যানি বেসান্ট ১৯২৮ সালের কংগ্রেসে বলেছিলেন যে ভারতীয়রা সেই ধরনের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত নয়।[৭]

এই সমস্যা সম্বন্ধে গান্ধীর মতবাদ ছিল প্রজ্ঞাপরিমিত। ১৯২৮ সালে তিনি বলেছিলেন, স্বরাজের অর্থ 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' না পূর্ণ স্বাধীনতা, এ নিয়ে জনসাধারণের মাথাব্যথা নেই। যদি ভারতবাসী শক্তিশালী হয় ডোমিনিয়ন স্টেটাস স্বাধীনতার বেশী হয়ে উঠবে আর দুর্বল হলে পূর্ণ স্বাধীনতাও এক প্রহসন হয়ে দাঁড়াবে।[৮]

অনুজ নেতারা অবশ্য স্বাধীনতার দাবি তুলেছিলেন। আর বিপ্লবী সত্যমূর্তি পূর্ণ স্বাধীনতার সপক্ষে বলতে গিয়ে একথাও বলেছিলেন যে ভারতবর্ষ এত বৃহৎ দেশ যে ভারতীয় ডোমিনিয়ন হলে ভারতই হবে আসল রাজধানী আর ব্রিটেন হবে তার উপনিবেশ।[৯] অনুজ নেতারা, যাঁরা চেয়েছিলেন যে কংগ্রেস দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করুক, তাঁরা সকলে কিন্তু একথা মনে করতেন না যে বাস্তবের দিক থেকে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' স্বাধীনতার থেকে খুব কিছু পৃথক্, তবু তাঁরা বলেছিলেন, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুললে কংগ্রেস জনসাধারণের মনে এক জঙ্গী চেতনা ও বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী জাগাতে পারবে। এ. এফ. ব্রকওয়ে লিখেছিলেন, "I asked Jawaharlal Nehru why he insisted upon the independence of India, when in actual fact Dominion Status represents independence for all practical purposes. His answer was a revelation of his political outlook. He maintained that the Indian people require to be stirred into a revolutionary attitude, they must be brought to a state of mind where they are ready to make a decisive break with the past. The demand for Dominion Status represents a slow growth without a fundamental change of mental attitude ; the demand for independence represents a challenge to tradition".[১০]

নেহেরু বলেছিলেন যে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' স্বীকার করার অর্থ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে স্বীকার করে নেওয়া এবং সাম্রাজ্যবাদের ধারণা ও মনোভাবকে স্বীকার করে নেয়া।[১১] নেহেরু নিজে ইংল্যাণ্ডে শিক্ষা পেয়েছিলেন এবং ইংরেজদের অনেক কিছুরই সঙ্গে তিনি মনের দিক থেকে খুব কাছাকাছি ছিলেন; কিন্তু তবুও ভারতীয় জনগণের মধ্যে জঙ্গী, আপোসহীন চেতনাকে জাগরূক করার জন্য তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা চাইলেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে এটা তিনি চেয়েছিলেন "almost in spite of myself" [১২]

সুভাষচন্দ্র বসুও নেহেরুর মত পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন এবং প্রায় একই যুক্তিতে। সুভাষচন্দ্র বলেন যে ভারতবর্ষের অবনতির কারণ তার স্বাধীন মানসিকতার অভাব; সুতরাং দেশের সামনে যদি পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে পরবর্তী পুরুষেরা একটা স্বাধীন জঙ্গী মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে। সেইজন্য ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরের কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র গান্ধীর প্রস্তাবের এক সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে এলেন এই বলে যাতে কংগ্রেসের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা বলে স্বীকৃত হয়। যে সরকারী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র এই সংশোধনী প্রস্তাব আনেন তাতে বলা হয়েছিল যে ব্রিটেন যদি ভারতকে এক বৎসরের মধ্যে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' না দেয় তাহলে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করা হবে।

সুভাষচন্দ্র এই সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে আসার ফলে পুরাতন এবং নূতন গোষ্ঠীর মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্যটা প্রকাশ্যে বেরিয়ে পড়ল। সুভাষচন্দ্র পুরাতনীদের এই সংশোধনী মেনে নেওয়ার অনুরোধ করে বলেছিলেন, "I and Pandit Jawaharlal are regarded as the moderates among the extremists, and if the elder leaders are not prepared to compromise with these moderates, then the breach between the old and the new will be irreparable" [১৩] তিনি বলেন যে, এক বৎসরের মধ্যে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' পাওয়ার কোনো যুক্তিপূর্ণ আশা নেই এবং মতিলাল নেহেরু সেকথা স্বীকারও করে নিয়েছেন; তাই যদি হয় তাহলে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস'-এর জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিকে কেন খর্ব করা হবে?

সুভাষচন্দ্র ও জওহরলালের বক্তৃতা ছিল স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। জওহরলালের পিতা, মতিলাল, উত্তরে বলেছিলেন, "Subhas and Jawahar have told you . . that in their opinion we old-age men are no good . . . and are hopelessly behind the times" কিন্তু এতে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন নি কারণ "the young always regard the aged men as behind times".

মতিলাল দেশবাসীকে দুটি ধার-করা বিদেশী শব্দ 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্'ও 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' ভুলে যেতে পরামর্শ দেন এবং 'স্বরাজ' ও 'আজাদী' এই দুটি শব্দ ব্যবহার করতে বলেন। আর বলেন যে, 'স্বরাজ'-এর জন্য আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে---তা যে নামেই হোক না কেন।[১৪] এই বলে মতিলাল কংগ্রেসকর্মীদের গান্ধী-উত্থাপিত প্রস্তাব সমর্থন করতে অনুরোধ জানান।[১৫]

১৯২৯ সালের ৩১শে অক্টোবর ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভাইসরয়

লর্ড আর্‌উইন্‌ ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন।[১৬] লর্ড আর্‌উইন বলেন যে ১৯১৭ সালের ঘোষণা থেকে স্বাভাবিক-ভাবেই সূচিত হয়েছিল যে ভারতীয় সাংবিধানিক পদক্ষেপের লক্ষ্য হবে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস'. কিন্তু যেহেতু ১৯১৭ সালের এই ঘোষণার সত্য তাৎপর্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে সেইজন্য পরিষ্কার করে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, "That it is the desire of the British Government that India should, in the fullness of time, take her place in the Empire in equal partnership with the Dominions".[১৭] লর্ড আরউইন আরও বললেন যে, সাইমন কমিশনের বিবরণী প্রকাশের পর ভারতের সাংবিধানিক সংস্কার বিষয়ে আলোচনার জন্য লণ্ডনে একটি গোল-টেবিল বৈঠক বসবে।

যদিও লর্ড আরউইনের ঘোষণাকে সাধারণভাবে ভারতে স্বাগত জানান হয়, তবু এই ঘোষণা সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডে এমন কিছু কিছু মন্তব্য শোনা যায় যাতে কংগ্রেস এর সততা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠে এবং তার ফলে কংগ্রেসের ভেতরের জঙ্গী অংশ আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই পরি-প্রেক্ষিতে ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে জওহরলালের সভাপতিত্বে অগ্রজদের এতদিনের আকাঙ্ক্ষিত 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' পরিত্যক্ত হয় এবং কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসেবে পূর্ণ স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বরাজ স্বীকার করে নেওয়া হয়।

১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারীতে কংগ্রেসের কার্যকরী পরিষদ গান্ধীকে পূর্ণ স্বরাজ লাভের উদ্দেশ্যে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার দায়িত্ব দেয়। গান্ধী স্থির করেন, তাঁর সবরমতী আশ্রম থেকে ২০০ মাইল দূরে গুজরাটের এক সমুদ্রকূলবর্তী গ্রাম, দণ্ডী থেকে এই আন্দোলন শুরু করবেন এবং সেখানে তিনি নিজে ব্রিটিশ সরকারের লবণ আইন অমান্য করে লবণ তৈয়ারী করবেন। ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ, ৭৮ জন অনুগামী নিয়ে গান্ধী দণ্ডীর উদ্দেশ্যে পদযাত্রা শুরু করেন।

১৯৩০ সালের ৫ই এপ্রিল গান্ধী দণ্ডী পৌঁছান। তাঁর এই দীর্ঘ পদ-যাত্রা এক বিজয়-যাত্রার রূপ নেয়। গ্রামবাসীরা পদযাত্রীদের সামনে নতজানু হয়ে শ্রদ্ধা জানায়। প্রায় ৩০০ জন গ্রামের কর্তৃস্থানীয় লোক তাঁদের চাকরিতে ইস্তফা দেন এবং সমগ্র গ্রামাঞ্চল স্বরাজ্যের জন্য ঘনায়মান সংগ্রাম সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। দণ্ডী যাত্রার সংবাদ সমস্ত পৃথিবীতে প্রচারিত হয়ে যায় এবং ভারতব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৩০ সালের ৪ঠা মে গান্ধী গ্রেপ্তার হন; কিন্তু তার আগেই সারা দেশ জেগে উঠেছিল, এবং বহু লোক গান্ধীকে কারাগারে অনুসরণ করলেন।

১৯৩০ সালের নভেম্বরে ভারতবর্ষে যখন ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন চলছে তখন লণ্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সভাপতিত্বে ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য গোলটেবিল বৈঠক বসল। কংগ্রেস এই বৈঠক বর্জন করে। পরে ১৯৩১ সালের ১৯শে জানুয়ারী এই বৈঠক অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারীতে কারামুক্ত গান্ধী ও লর্ড আরউইনের মধ্যে রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হয়। ১৯৩১ সালের ৫ই মার্চ গান্ধী-আরউইন

চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে ঠিক হয়, কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখবে এবং সাংবিধানিক সংস্কারের জন্য ভবিষ্যৎ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবে।

এই চুক্তিতে আসার জন্য গান্ধীকে এমন কয়েকটি শর্ত মেনে নিতে হয় যাতে কংগ্রেসের অনেকেই (যার মধ্যে নেহেরুও একজন) ব্যথিত হন। নেহেরু গান্ধীকে বলেছিলেন, "What frightens me is your way of springing surprises on us. . . Although I have known you for fourteen years, there is something unknown about you which I cannot understand. It fills me with apprehension". গান্ধী উত্তরে বলেন, 'Yes, I admit the presence of this unknown element and I confess that I myself cannot answer for it nor fortell what it might lead to".[১৮]

১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বরে গান্ধী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। নূতন সংবিধানে মুসলমান-দের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে এই বৈঠকে এক সমস্যা দেখা দেয়। পরে, ১৯৩২-এর আগস্ট মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাক্‌ডোনাল্ড তাঁর বিখ্যাত 'সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত' ঘোষণা করেন। এতে শুধু মুসলমানদের জন্যই নয়, শিখ এবং অনুন্নত শ্রেণীদের জন্যও পৃথক্ প্রতিনিধিত্ব ঘোষিত হয়। গান্ধী উপলব্ধি করেন যে এইভাবে অনুন্নত শ্রেণীদের সঙ্গে পার্থক্য সৃষ্টি করলে দেশের ক্রমবর্ধমান ঐক্য ধ্বংস হয়ে যাবে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি আমরণ অনশন করার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন।

১৯৩২ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বরে, অনশনের ষষ্ঠদিনে, অনুন্নত শ্রেণীদের নেতা ডঃ আম্বেদকরের সঙ্গে পুণাতে এক আপোস হয়। এই পুণা চুক্তিতে স্থির হয় যে অনুন্নত শ্রেণীদের জন্য কোন পৃথক্ নির্বাচকমণ্ডলী থাকবে না, থাকবে যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী। কিন্তু এই নির্বাচকমণ্ডলী অনুন্নত শ্রেণীদের আসনের জন্য এমন এক নামের তালিকা থেকে নির্বাচন করবেন যেটা ঠিক করে দেবেন ওই শ্রেণীর লোকেরাই। অবশ্য এই চুক্তির দ্বারা অনুন্নত শ্রেণীদের প্রাপ্য আসন-সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেল—প্রাদেশিক আইন সভায় পূর্ব-স্থিরীকৃত ৭১টি সংরক্ষিত আসনের জায়গায় তারা পেল ১৪১টি। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে গান্ধী হিন্দুদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ কমিয়ে আনতে চেয়েছিলেন।

পরের বৎসর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ১৯৩৩ সালের ৩১শে মার্চ কলকাতায় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন বসে এবং এই অধিবেশনে হাজারেরও বেশী সদস্য যোগদান করেন। এই সংবাদ পেয়ে পুলিস সেখানে গিয়ে লাঠি-চালনা করে। তা সত্ত্বেও অধিবেশন কিছুকাল শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তার সভাপতিত্বে চলে এবং এতে আইন অমান্য, ব্রিটিশ পণ্য বর্জন ও স্বরাজের সমর্থনে প্রস্তাব সমর্থিত হয়। নির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত মালব্য তাঁর লিখিত ভাষণে বলেন যে যদিও নারী-শিশু-সমেত প্রায় ১,২০,০০০ মানুষ কারাবরণ করেছেন এবং যদিও পনরো মাস ধরে ব্রিটিশ অত্যাচার অব্যাহত আছে, তবুও আইন অমান্য আন্দোলন অবদমিত হয় নি, হবেও না।

এই সময়ে গান্ধী অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য এক আন্দোলন শুরু করার কথা ভাবছিলেন এবং ১৯৩৩ সালের ৮ই মে তিনি ঘোষণা করেন যে হরিজনদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে কাজ শুরু করার আগে তিনি আত্মশুদ্ধির জন্য ২১ দিন অনশন করবেন। এরপর সরকার গান্ধীকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়। কারামুক্তির পরে গান্ধী কংগ্রেস সভাপতিকে এক মাস বা ছয় সপ্তাহ আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখতে অনুরোধ করে এক বিবৃতি দেন। সেই একই বিবৃতিতে তিনি সরকারের কাছে আবেদন করেন যে তাঁরা যেন অবদমনমূলক আইনগুলি রদ করেন এবং আইন অমান্যকারী বন্দীদের মুক্তি দেন। কিন্তু ইতিমধ্যে লর্ড আরউইনের পরিবর্তে ভাইসরয় হয়ে এসেছিলেন লর্ড উইলিংডন; তিনি অনমনীয় সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ঘোষণা করেন যে সরকার কারাবন্দীদের মুক্তি বা আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের ব্যাপারে কংগ্রেসের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে প্রস্তুত নয়।

গান্ধীর অনুরোধ অনসারে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতির স্থলাভিষিক্ত অ্যানি বেসন্ট ছয় সপ্তাহের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখলেন এবং পরে তা আরও ছয় সপ্তাহ বাড়িয়ে দিলেন। ১৯৩৩ সালের ১২ই জুলাই পুণাতে কংগ্রেসকর্মীদের এক বেসরকারী সভায় ঠিক হল যে, গান্ধী ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার প্রয়াস নেবেন। তারপর ঠিক হল গণ-সত্যাগ্রহ বন্ধ করে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ শুরু করা হবে।

গান্ধী ১৯৩৩ সালের ১লা আগস্ট ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলনের উদ্বোধন করবেন ঠিক করেছিলেন কিন্তু তার আগের রাত্রেই তিনি গ্রেপ্তার হলেন। তাঁকে দু-এক দিনের মধ্যে ছেড়ে দেয়া হল বটে কিন্তু পুণার মধ্যে বসবাস করতে হবে এই বলে তাঁর উপর এক আদেশ জারী করা হল। গান্ধী এই আদেশ অমান্য করলেন, আবার গ্রেপ্তার হলেন এবং এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

এই পুরো বৎসর ধরে সরকার কঠিন অত্যাচার চালাল---অনেককে কারারুদ্ধ করে, গুলি চালিয়ে, পুলিস হাজতে মারধর করে, কারাবন্দীদের হত্যা করে, মহিলাদের উপর অত্যাচার করে, গ্রাম অবরোধ করে, এমন কি লুন্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করে।[১৯] লেঃ কঃ আর্থার অসবর্ন তাঁর গ্রন্থ, 'মাস্ট্ ইংল্যাণ্ড লুস ইণ্ডিয়া'তে লিপিবদ্ধ করেন যে যখন একজন সরকারী প্রতিনিধি দাবি করেন যে গ্রামে শাস্তিমূলক পুলিস প্রহরার ব্যবস্থা করা হলে কঠিনতম রাজনৈতিক আন্দোলনও থেমে যাবে, তখন তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, তা কি করে সম্ভব। তাতে উত্তর পেয়েছিলেন, "Well, they (the punitive police) will help themselves to everything. Within twentyfour hours there will not be a virgin or a two anna piece left in the village".

আইন অমান্য আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হল বটে, কিন্তু ১৯৩৪ সালে দেখা গেল যে তাতে আর বিশেষ জীবনীশক্তি নেই। ১৯৩৪ সালের গোড়ার দিকের কথা উল্লেখ করে কংগ্রেসের সরকারী ঐতিহাসিক লেখেন, "The progress of . . . Civil Disobedience was none too satisfactory. The

prisoners who were released fagged . . . (and) found themselves unable or unwilling to face another conviction".[২০]

১৯৩৪ সালে যখন আইন অমান্য আন্দোলন শেষ হয়ে আসছে তখন গান্ধী কংগ্রেসকর্মীদের কাছে একটি গঠনমূলক কার্যক্রমে যোগ দিতে আবেদন করেন, যেমন---হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্প্রসারণ, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং চরকা-কাটা।

১৯৩৫ সালের ব্রিটিশ আইনসভা 'গভর্নমেন্ট অফ্ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৩৫' পাশ করে। এর মধ্যে ভারতের সবকটি প্রদেশ ও যে-সব দেশীয় রাজ্য এতে আসতে চায় তাদের নিয়ে এক যৌথরাষ্ট্র গড়ার কথা বলা হল। কিন্তু ১৯৩৫ সালের এই আইন অনুসারে যে রকম যৌথরাষ্ট্র গড়ার কথা ভাবা হয়েছিল তার বিরোধিতা দেশীয় রাজ্যগুলি এবং কংগ্রেস উভয়েই করার ফলে তা বাস্তবে রূপ পেল না।

গভর্নমেন্ট অফ্ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৩৫-এর ফলে ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারে যে দ্বৈতশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল তার অবসান ঘটল এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হল। দায়িত্বশীল সরকার গঠনের ভিত্তিতে যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হল, তাতে ভারতীয়দের হাতে কিছু ক্ষমতা আসে এবং প্রদেশগুলিকে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ ও খবরদারির হাত থেকে কিছুটা মুক্ত করা হয়। কিন্তু এই আইন কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন রেখে দিল এবং কেন্দ্রের হাতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, ধর্মীয় ব্যাপার ও আদিবাসী এলাকার শাসন সরাসরি থেকে গেল। উপরন্তু এই আইন ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো সংস্কারের প্রবর্তিত সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব-ব্যবস্থাও কায়েম করল।

১৯৩৫ সালের ১লা জানুয়ারী তৎকালীন ভারত-সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর একটি বেতার বক্তৃতা দেন যাতে তিনি স্বীকার করেন যে পুরোনো অভিভাবক সরকার-ব্যবস্থা ভারতে চলতে পারে না। তিনি বলেন যে তার মানে এই নয় যে স্বায়ত্তশাসন প্রকৃষ্ট শাসনের থেকে ভালো, তবে "the old system of paternal government cannot survive a century of western education, a long period of free speech and of a free press and our own deliberate policy of developing parliamentary government".[২১]

ব্রিটিশ আইনসভায় 'গভর্নমেন্ট অফ্ ইণ্ডিয়া বিলের' উইন্‌স্টন চার্চিল, যাঁর ধারণা যে এতে অনেক বেশী ক্ষমতা ছেড়ে দেয়া হচ্ছে, এবং ক্লিমেন্ট এট্‌লি, যাঁর ধারণা এতে যথেষ্ট ক্ষমতা ছেড়ে দেয়া হচ্ছে না, উভয়েই বিরোধিতা করেন। ১৯৩৫ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ আইনসভায় চার্চিল যে বক্তৃতা দেন তাতে তিনি পরিষ্কার করে বলেন যে ভারতবর্ষ শাসন করতে হবে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসারেই। চার্চিল অভিভাবক সরকারে (paternal government) বিশ্বাস করতেন, যে বক্তব্য 'টাইম্‌স্' পত্রিকার ১৮৮৩ সালের ১লা মার্চ সংখ্যায় স্যার জেম্‌স্ ফিট্‌স্ জেমস্ স্টীফেন লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং যে নীতি লর্ড কার্জন ভাইসরয় থাকাকালীন সময়ে একনিষ্ঠভাবে প্রতিপালিত হয়েছিল। চার্চিল ব্রিটিশ

আইনসভায় বলেন যে স্বায়ত্তশাসন প্রকৃষ্ট শাসনের চেয়ে সব সময় বেশী কাম্য, অথবা ব্রিটেনের ভারত থাকবার কোন অধিকার নেই, এসব কথা অর্থহীন প্রলাপ মাত্র। তিনি বলেন, ইংরেজ ভারত ছাড়লে সেখানে ভয়ঙ্কর বিপদ দেখা দেবে এবং দাবি করলেন যে ইংরেজদের "(had) as good a right to be in India as any one there except, perhaps the depressed classes who are the original stock". তিনি সাবধান করলেন যে ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষ থেকে অপসৃত হলে "India will descend, not quite into the perils of Europe but into the squalor and anarchy of India in the sixteenth and seventeenth centuries. It seems to me that the present infatuation of the liberal mind and I must say of the more intellectual part of the socialist mind, is at this moment very serious Their error is an undue exaltation of the principle of self-government".[২১]

১৯৩৫ সালের চার্চিলের মনোভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার চার্চিলের মনোভাবের থেকে কিছু পৃথক্ ছিল না। এই সময়েও তিনি আটলান্টিক চার্টার থেকে ভারতকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে ব্রিটিশ সরকারের ভারত সাম্রাজ্যের উপসংহার রচনার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী হন নি। এট্‌লি, যিনি পরবর্তী কালে ১৯৪৭ সালে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিয়েছিলেন, তিনি ১৯৩৫ সালের ৪ঠা জুন ব্রিটিশ আইনসভায় এই বিলের উপর বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন যে বিলটি এমনভাবে তৈয়ারী হয়েছে যাতে ভারতের পরিস্থিতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কংগ্রেসকে, সচেষ্টভাবে বাদ দেয়া হয়েছে যাতে তারা এতে কোনোরকমে ক্ষমতায় না আসে। এমন সব শর্ত সংযোজন করা হয়েছে যাতে ভারতবর্ষের প্রাণবন্ত শক্তিগুলি ও কংগ্রেসকে নিষ্প্রাণ করা যায়। তিনি বলেন, "This is done at the centre by giving an undue weight to the Princes The Princes are represented as a conservative element to keep left wing elements in check. It has been done by the creation of a reactionary unrepresentative Council of State at the Centre and by the creation of reactionary second chambers in the Provinces, and also in the formation of the British side of the Assembly by the method which sets a premium on communalism . . . the electing chambers are split on communal lines The bill makes the worst of both worlds".[২৩]

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চালু হয় ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে। তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড লিন্‌লিথগো, ১৯৩৭ সালের ২২শে জুন একটি বিবৃতি দিয়ে নূতন সংবিধানে গভর্নররা যে দৈনন্দিন শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করবেন না এ কথা পরিষ্কার করে দেন।[২৪] এই আশ্বাসের ভিত্তিতে কংগ্রেস নূতন সংবিধানের প্রাদেশিক অংশটুকুতে অংশগ্রহণ করতে সম্মত হয়। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়ী হয় এবং আটটি প্রদেশে সরকার স্থাপন করে।

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং ব্রিটেন নাৎসী জর্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধে ব্রিটেন ভারতবর্ষকেও টেনে নিয়ে যায়। কংগ্রেস তখন ব্রিটেনের যুদ্ধ-প্রয়াসের উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে ঘোষণা করতে বলে এবং ভারতকে স্বাধীন জাতির মর্যাদা দিতে অনুরোধ করে। ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে কোন প্রত্যুত্তর না পেয়ে ১৯৩৯-এর অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে এর প্রতিবাদে সমস্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকার পদত্যাগ করে। কংগ্রেস-বিরোধী মুসলিম লীগ নেতা জিন্না এই ঘটনায় অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং ১৯৩৯ সালের ২২শে ডিসেম্বরকে 'মুক্তি ও ধন্যবাদজ্ঞাপনের দিন' হিসেবে পালন করার আহ্বান জানান।

১৯৪০ সালের ৮ই আগস্ট তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড লিন্‌লিথগো একটি ঘোষণা করেন যা 'আগস্ট ঘোষণা' বলে বিখ্যাত। এই ঘোষণায় তিনি বলেন যে এখনি ভারতের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার কোন অভিরুচি ইংরেজ সরকারের নেই, তবে, "His Majesty's Government authorise me to declare that they will most readily assent to the setting up after the conclusion of the war with the least possible delay of a body representative of the principal elements in India's national life in order to devise the framework of the new constitution."[১]

১৯৪০ সালের ৩১শে আগস্ট মুসলিম লীগ এই ঘোষণাকে স্বাগত জানায়। কিন্তু এই আগস্ট ঘোষণা কংগ্রেস বা জাতীয়তাবাদী ভারতের মধ্যে কোন সাড়াই জাগায় নি। জাতীয়তাবাদী নেতারা লিন্‌লিথগোকে বিশেষ পছন্দ করতেন না। লিনলিথগো সম্বন্ধে নেহেরু লিখেছিলেন, "Heavy of body and slow of mind, solid as a rock and with almost rock's lack of awareness, possessing the qualities and failings of an old fashioned British aristocrat, he sought with integrity and honesty of purpose to find a way out of the tangle But his limitations were too many ; his mind worked in the old groove and shrank back from any innovations ; his vision was limited by the traditions of the ruling class out of which he came : he saw and heard through the eyes and ears of the civil service and others who surrounded him ; he distrusted people who talked of fundamental political and social changes ; he disliked those who did not show a becoming appreciation of the high mission of the British Empire and its Chief representative in India"[২]

আগস্ট ঘোষণার প্রত্যাখ্যান ব্রিটেন ও জাতীয়তাবাদী ভারতের দূরত্বকে আরও বাড়িয়ে তোলে। কংগ্রেস তখন গান্ধীর নেতৃত্বে আবার

আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত নেয়। গান্ধী অবশ্য গণ-আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ না করে ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৪০ সালের ১৭ই আগস্ট এই আন্দোলন শুরু হয় এবং যেই একজন সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হতেন তাঁর জায়গায় আর একজন সত্যাগ্রহ করতেন। এইভাবে গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৬০০-তে পেঁৗছায়। ১৯৪০ সালের ১৭ই ডিসেম্বর গান্ধী আন্দোলন স্থগিত রাখেন এবং ১৯৪১ সালের ৫ই জানুয়ারী তা আবার শুরু করেন। ২০,০০০-এরও বেশী লোক কারাবরণ করেন। এই আন্দোলন খুব ব্যাপকভাবে শুরু করা হয় নি কারণ তখনও কংগ্রেস নেতারা ব্রিটিশ যুদ্ধপ্রয়াসকে ব্যাহত করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন।

কিন্তু এই সময়ে ভারতে রাজনৈতিক হতাশা বাড়তে থাকে। এই আশাহীনতা চার্চিলের ১৯৪১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরের ঘোষণাতে আরও বেড়ে যায়। 'আটলান্টিক সনদ'এ মিত্রশক্তির যুদ্ধপ্রয়াসের লক্ষ্য বলা হয়েছিল যে প্রত্যেক জাতি তার নিজস্ব শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলবে---চার্চিল ঘোষণা করলেন যে তা ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য হবে না। এদিকে অক্ষশক্তি ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যতই জয়ী হতে থাকে পরিস্থিতি ততই ঘনিয়ে ওঠে। ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাপান পার্ল হারবার বন্দরে বোমাবর্ষণ করে এবং তৎক্ষণাৎ ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৪২ সালের অগ্রসরমান জাপানী বাহিনীর কাছে সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুন সমর্পিত হয়। জাপান বাহিনী শুধু সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুন দখলই করল না, তারা ভারতের পূর্ব-সীমান্তে এসে হানা দিল। জাপানের বিরুদ্ধে ভারতে কোন ঐক্যবদ্ধ বা জন-সমর্থিত যুদ্ধপ্রয়াস গড়ে ওঠে নি। বরঞ্চ চার্চিলের ঘোষণা যে আটলান্টিক সনদ ভারতের জন্য প্রযোজ্য নয়, তাতে ভারতে হতাশা ও ক্ষোভই বেড়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় ভারতের সম্বন্ধে কিছু করতেই হবে এ-কথা বুঝতে পেরে ইংরেজ সরকার ১৯৪২-এর মার্চে ক্রীপ্স মিশনকে ভারতে পাঠায়।

ক্রীপ্স পরিকল্পনায় মেনে নেয়া হল যে যুদ্ধের পরে ভারতকে 'ডোমি-নিয়ন স্টেটাস' দেয়া হবে এবং সংবিধান রচনার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে; তবে যুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় জনতার সহ-যোগিতা নিয়ে ভারতকে পুরো অংশীদার করে যুদ্ধপ্রয়াস নিয়ন্ত্রণ করবে। এই পরিকল্পনায় বলা হল যে যুদ্ধ অবসানের পর যত শীঘ্র সম্ভব ভারতকে স্বায়ত্ত-শাসন দেয়া হবে এবং ভারত হবে একটি "Dominion, associated with the United Kingdom and the other Dominions by a common allegiance to the Crown, but equal to them in every respect, in no way subordinate in any aspect of its domestic and external affairs".[৩]

একেবারে শেষ দশায় পেঁৗছিয়ে ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়ে এই ক্রীপ্স্ প্রস্তাব আসে। ১৯৪২ সালের ১১ই এপ্রিল কংগ্রেস কার্যকরী পরিষদ এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে। কংগ্রেস বলে যে এই প্রস্তাবে দেশীয় রাজ্যের ৯৫ লক্ষ লোকের স্বাধীনতার কোন কথাই নেই এবং এতে প্রদেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার নীতি আগে থেকেই বিসর্জন দেওয়ার এক অদ্ভুত বাধ্যতামূলক শর্ত সংযোজন

করা হয়েছে। গান্ধী এই প্রস্তাবকে "a postdated cheque on a falling bank" আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেন।

ক্রীপ্‌স্ মিশনের ব্যর্থতা দেশে গভীর নিরাশা নিয়ে আসে। ১৯৪২ সালের ২৬শে এপ্রিল গান্ধী তাই ভারত থেকে ব্রিটিশ শক্তির অপসারণ দাবি করলেন। দেশীয় রাজ্যের ও সংখ্যালঘুদের প্রতি কর্তব্যবোধেই ব্রিটেনের পক্ষে ভারত ছেড়ে চলে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না এই ওজর সম্বন্ধে ব্যঙ্গ করে গান্ধী বলেন, "All talk of treaties with the Princes and obligations towards minorities are a British creation designed for the preservation of the British rule and British interests."[8]

এই সময়ে প্রশ্ন ওঠে যে যখন নাজী জর্মানী ও ফ্যাসী ইতালীর বিরুদ্ধে ব্রিটেন যুদ্ধ করছে সেই সময়ে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করা কংগ্রেসের অতীত নীতির পরিপন্থী হবে কিনা। যুদ্ধের আগে কংগ্রেস বহুবার ফ্যাসীবাদের নিন্দা করেছে, বিশেষ করে নেহেরুর নেতৃত্বে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরও নেহেরু বলেছিলেন যে ফ্যাসীবাদের জয় পৃথিবীর পক্ষে এক ট্র্যাজেডি হয়ে দাঁড়াবে। ভারতীয়রা যদি মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করতে পারত তাহলে নেহেরু খুশীই হতেন, কিন্তু এটা তিনি ভালভাবেই জানতেন যে ভারতবর্ষের মানুষ নিজে স্বাধীন না হয়ে স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধ করতে পারবে না। তবু এই রকম অবস্থায় ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু করা সম্বন্ধে অনেক কংগ্রেস নেতার, বিশেষ করে জওহরলাল নেহেরু ও মওলানা আবুল কালাম আজাদের, মনে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব ছিল।

আজাদ বিশেষ করে এই প্রস্তাবিত আন্দোলন সম্বন্ধে অস্বস্তি বোধ করছিলেন। যদি জাপান ভারত আক্রমণ করে, তাহলে তাঁর মতে সমস্ত শক্তি দিয়ে ভারতবাসীদের তার প্রতিরোধ করা উচিত। তিনি লিখেছেন, "I felt that it would be intolerable to change an old master for a new one. In fact it would be far more inimical to our interests if a new and virile conquerer replaced the old Government which in course of time had become effete and was gradually losing its grasp".[৫]

কিন্তু ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি সময়ে গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলনের আহ্বান দিতে কৃতসঙ্কল্প হন। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে যখন এই প্রশ্নটি কংগ্রেস কার্যকরী পরিষদে আলোচিত হয়, তখন আজাদ গান্ধীর বিরোধিতা করেন। আজাদ বলেন যে কার্যকরী পরিষদের সভ্যদের মধ্যে একমাত্র জওহরলাল নেহেরু তাঁকে সমর্থন করেন এবং তাও কিছুদূর পর্যন্ত মাত্র। অন্য সভ্যরা পুরোপুরি আশ্বস্ত না হলেও গান্ধীর বিরোধিতা করতে চান নি। জওহরলাল, যিনি মাঝে মাঝে আজাদের সঙ্গে একমত হতেন, তিনি ছাড়া অন্য সভ্যরা গান্ধীর নেতৃত্ব পুরোপুরি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। আজাদের মতে, "Sardar Patel, Dr. Rajendra Prasad and Acharya Kripalani had no clear idea about the war. They rarely tried to judge things on their own, and in any case they were accustomed

to subordinate their judgement to Gandhiji. As such discussion with them was almost useless".[৬]

আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার ব্যাপারে আজাদ ও গান্ধীর মধ্যে মতপার্থক্য এত গভীর হয়ে দাঁড়ায় যে গান্ধী তাঁকে পদত্যাগ করতে লেখেন। গান্ধীর মনোভাব সম্বন্ধে আজাদ লিপিবদ্ধ করেন, "If Congress wanted Gandhiji to lead the movement, I must resign from the Presidentship and also withdraw from the Working Committee. Jawaharlal must do the same I immediately sent for Jawaharlal and showed him Gandhiji's letter Sardar Patel had also dropped in and he was shocked when he read the letter. He immediately went to Gandhiji and strongly protested against his action".[৭]

প্যাটেল মনে করেন যে আজাদ যদি সভাপতিত্ব থেকে পদত্যাগ করেন এবং জওহরলাল যদি কার্যকরী পরিষদ থেকে চলে যান তাহলে দেশব্যাপী ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এবং কংগ্রেস সংগঠনের ভিত্তি কেঁপে উঠবে। পরে গান্ধী বলেন যে তিনি চিঠিটি অনাবশ্যক সত্বরতায় লিখেছিলেন এবং তিনি সেটি প্রত্যাহার করে নেন।[৮] তবে যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার ব্যাপারে গান্ধী দৃঢ় রইলেন। তাই ১৯৪২-এর আগস্ট মাসে গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিল। আজাদ ও নেহেরু তাঁদের ফ্যাসীবাদের ঘোরতর অনীহা সত্ত্বেও মেনে নিলেন যে ওই পরিস্থিতিতে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগ দেয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।

১৯৪২ সালের জুলাই মাসে কংগ্রেস কার্যকরী পরিষদ অবিলম্বে ইংরেজ শাসনের অবসানের জন্য ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ করে, "not because foreign domination even at its best was evil in itself but in order to enable India to play its effective part in defending herself and in affecting the fortunes of the war, and . . . for . . . ending . . . Nazism, Fascism, Militarism and other forms of Imperialism and the aggression of one nation over another". কিন্তু ব্রিটেনকে ও মিত্রশক্তিকে যুদ্ধ প্রয়াসে বিপদ্‌গ্রস্ত না করার জন্য কংগ্রেস "(was) agreeable to the stationing of the armed forces of the Allies in India should they so desire, in order to ward off and resist Japanese or other aggression and to protect and help China".

১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বোম্বাই অধিবেশনে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব সমর্থন করল এবং ভারত থেকে ব্রিটিশ শক্তির অপসারণ দাবি করল। তার ঠিক পরের দিনই গান্ধী-সমেত কংগ্রেস কার্যকরী পরিষদের সকল সভ্য কারারুদ্ধ হলেন এবং কংগ্রেস সংগঠন নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

সরকারী পরিসংখ্যানে ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট থেকে শেষ পর্যন্ত যত লোক গ্রেপ্তার, দণ্ডিত ও বিনাবিচারে বন্দী হন তার সংখ্যা হল যথাক্রমে

প্রায় ৬০,২০০, ২৬,০০০ এবং ১৮,০০০।[৯] কেন্দ্রীয় আইনসভায় সরকারী বক্তব্যে বলা হল যে ১৯৪২ সালে ৫৩৮টি ঘটনায় গুলিবর্ষণ করা হয়, যার ফলে ৯৬০ জন নিহত ও ১,৬৩০ জন আহত হয়।[১০]

জনসাধারণ আইন অমান্য আন্দোলনে বিপুল সংখ্যায় যোগদান করে কিন্তু তারা সব সময়ে অহিংস ছিল না। নেহেরু পরে দুঃখের সঙ্গে বলেন যে কুড়ি বছর ধরে যে কথা বারবার বলা হয়েছিল জনসাধারণ তা ভুলে গিয়েছিল।[১১] কংগ্রেসের সরকারী বক্তব্যে এই আন্দোলন সম্বন্ধে বলা হয়, "The people grew insensate and grew maddened with fury, when the slightest acts of disobedience of orders prohibiting meetings, processions and demonstrations, freedom of association and opinion were put down, not with mere lathi but with the rifle and revolver, with the machine-gun and aerial firing Within less than twelve hours of arrest, the old story of bullets and brickbats got abroad . . . , the mob on their part began to stone running railways and stop trains and cars, damage Railway stations and set fire to them and property therein, loot grain shops, cut telegraph wires, rip open the tyres of cars, harass Victoria, bullockcarts and tongas Besides these excesses initiated by the people at large, there were hartals throughout India despite the Ordinance prohibiting them, in which the school and college students took a big hand in picketing. Educational institutions and Universities very soon emptied, and closed from one end of the country to another, from Dacca to Delhi excepting Aligarh and from Lahore to Madras".[১২]

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ সঙ্কল্প প্রতিষ্ঠিত করে। ইতিমধ্যে ১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্র বসু নাটকীয় ভাবে ভারতবর্ষ থেকে জর্মানী চলে যান এবং ১৯৪৩ সালে জাপান কর্তৃক বন্দী ও পরে মুক্ত ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে সিঙ্গাপুরে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর প্রতিষ্ঠা করেন। এই সৈন্যবাহিনী ভারতের সীমান্ত অবধি পৌঁছে, ভারতের মধ্যেও ঢুকে পড়ে; তবে তারপর বাধার সম্মুখীন হয়।

১৯৪৩ সালে লর্ড ওয়েভেল ভাইসরয় হিসেবে লর্ড লিনলিথগোর উত্তরাধিকারী হলেন। ওয়েভেল ১৯৪৫ সালে লণ্ডনে যান এবং নূতন সংবিধান প্রণয়ন সাপেক্ষে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের এক পরিকল্পনা নিয়ে ফিরে আসেন। তারপর ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতীয় নেতাদের নিয়ে এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। মুসলিম লীগের সঙ্গে কাজ করার যে তিক্ত অভিজ্ঞতা এই সরকারে থাকাকালীন কংগ্রেসের হয় তাই বোধ হয় পরবর্তী কালে লীগের দেশবিভাগের দাবি মেনে নিতে কংগ্রেসকে সম্মত করাতে সহায়ক হয়।[১৩]

১৯৪৫ সালের আগস্টে চার্চিল ব্রিটেনের শাসনক্ষমতা থেকে অপসৃত

হন এবং লেবার সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সি. আর. এট্‌লি ক্ষমতাসীন হন। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ও পরবর্তী কালে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাপতিদের বিচার দেশের পরিস্থিতিকে বিস্ফোরক করে তোলে। এমন কি ভারতীয় নৌবাহিনীতেও ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই সময়ে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে ইংরেজদের নাগরিক ও সামরিক দুই শাসনব্যবস্থাই ভেঙ্গে পড়ার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া যুদ্ধের ফলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সম্বন্ধে ভয় বহুলাংশে দূরীভূত হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে এট্‌লি ঘোষণা করেন যে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য মন্ত্রিসভার একটি দল ভারতে যাবেন।

এই ক্যাবিনেট মিশনের ভারতযাত্রার প্রাক্কালে এট্‌লি ঘোষণা করেন যে ভারত যদি পূর্ণ স্বাধীনতা চায় তাহলে সে তাই পাবে। তিনি বলেন, "I hope that the Indian people may elect to remain within the British Commonwealth . But . . if . . . she elects for independence in our view she has a right to do so."[১৪]

১৯৪৬ সালের ১৬ই মে এই ক্যাবিনেট মিশন এক বিবৃতিতে দেশীয় রাজ্য ও ব্রিটিশ ভারত নিয়ে এক ভারতীয় রাষ্ট্র গঠন, ভারতের সংবিধান প্রণয়নের জন্য এক সংবিধান পরিষদ প্রতিষ্ঠা এবং বৃহৎ রাজনৈতিক দল-গুলি নিয়ে এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সুপারিশ করেন।

সংবিধান পরিষদ প্রতিষ্ঠার এই সুপারিশ ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটি বহু দিনের দাবি স্বীকার করে নিল। ১৯২২ সালেই গান্ধী বলেছিলেন যে স্বরাজ আসবে "from the people of India as expressed through their freely chosen representatives." ১৯৩৪ সালে, যখন ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত ইংরেজ সরকারের শ্বেতপত্র (যা থেকে ভারতে সরকার আইন ১৯৩৫-এর সৃষ্টি হয়) কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করে, তখনও এই সংবিধান পরিষদ স্থাপনের দাবি কংগ্রেস করেছিল। ১৯৩৪ সালের একটি কংগ্রেস কার্যকরী পরিষদের প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, "The only satisfactory alternative to the White Paper is a constitution drawn up by a Constituent Assembly elected on the basis of adult franchise or as near as possible, with the power, if necessary, to the important minorities to have their representatives elected exclusively by the electors belonging to such minorities".[১৫] তারপরেও কংগ্রেস ১৯৩৭ সালে ফৈজপুর অধিবেশনে, ১৯৩৮ সালে হরিপুরা অধিবেশনে এবং ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী অধিবেশনে এই দাবি পুনরুত্থাপন করে। ১৯৪৫-এর সিমলা অধিবেশনেও এইরূপ সংবিধানের দাবির পুনরুল্লেখ করা হয়।

১৯৪৬ সালে যে ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসে তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল যাতে ভারতীয়রা তাঁদের নিজস্ব সংবিধান প্রণয়ন করতে পারেন তার একটা ব্যবস্থা করা। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় বলা হয় যে ভারত একটি রাষ্ট্র হবে, কেন্দ্রের ক্ষমতা থাকবে শুধু বৈদেশিক

সম্পর্ক, যানবাহন ও পরিবহণ এবং প্রতিরক্ষার ব্যাপারে, আর প্রদেশগুলিকে ভৌগোলিক ভিত্তিতে তিনটি এলাকায় ভাগ করে দেয়া হবে যাতে একটিতে হিন্দু, একটিতে মুসলমান এবং তৃতীয়টিতে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই সমপরিমাণ প্রাধান্য থাকে।[১৬] ১৯৪৬ সালের জুন মাসে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ উভয়েই দ্বিধা সত্ত্বেও এই পরিকল্পনা স্বীকার করে নেয়। জিন্না মনে করেন যে পৃথক্ মুসলমান রাষ্ট্রের নীতি এই বাধ্যতামূলক এলাকা-বন্টনের মধ্যে সংরক্ষিত হয়েছে।

পরে কিন্তু জিন্না এই এলাকা ভাগের ব্যাপারে ও সংবিধান পরিষদে কংগ্রেসের ভূমিকা সম্বন্ধে নেহেরুর কয়েকটি মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় তাঁর সমর্থন প্রত্যাহার করেন এবং লীগের প্রতিনিধিদের সংবিধান পরিষদ পরিত্যাগ করার পরামর্শ দেন। নূতন প্রাদেশিক আইনসভাগুলি সাংবিধানিক পরিষদের নির্বাচকমণ্ডলী হিসেবে কাজ করে। এই আইনসভাগুলিতে মুসলমান আসনের অধিকাংশই লীগ প্রতিনিধিরা দখল করেছিলেন। ১৯৪৫ সালের ৯ই ডিসেম্বর সংবিধান পরিষদ প্রথম বসে এবং সেখানে মুসলিম লীগ প্রতিনিধিরা অনুপস্থিত থাকেন। পরিষদে কংগ্রেসই আধিপত্য করে।

এই সব রাজনৈতিক জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে কবে যে সর্বদলের পক্ষে স্বীকারযোগ্য সংবিধান প্রণয়ন সম্ভব হবে তা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী এট্‌লী তাঁর ঐতিহাসিক ঘোষণায় বলেন যে ব্রিটিশ সরকার সংবিধান প্রণয়নের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে না এবং ১৯৪৭ সালের জুন মাসের মধ্যে দায়িত্বশীল ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে ব্রিটিশ সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।[১৭] চার্চিল তাঁর পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত ও বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই ঘোষণায় দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বিপজ্জনক ফলাফলের ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন, "India is to be subjected not merely to partition, but to fragmentation ...in handing over the Government of India to these socalled political classes we are handing over to men of straw, of whom, in a few years, no trace will remain".[১৮]

ক্রীপ্‌স্ মিশনের নেতা স্যার স্টাফোর্ড, 'ক্যাবিনেট মিশনের'ও সভ্য ছিলেন। তিনি ১৯৪৭ সালের ৫ই মার্চ ব্রিটিশ সরকারের এই ক্ষমতা হস্তান্তরের কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে যুদ্ধকালীন অবস্থার সময় ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারত-সচিবের বিভিন্ন কাজে ইউরোপীয়দের নিয়োগ করা সম্ভব হয় নি, অথচ এই সময়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছে এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যা বেশ বেড়ে গেছে। এর ফলে ভারতসচিবের কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়েছে।[১৯] অতীত ভারতশাসন-ব্যবস্থা এই সব ভারত-সচিবের কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হত, আর আপৎকালে ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ও তাদের উচ্চপদস্থ সেনানীদের দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত হত। ভারতীয় উচ্চপদস্থ সেনানীরা ক্রমেই ব্রিটিশ কর্তাদের চেয়ে ভারতীয় নেতাদের কথা বেশী শুনতে শুরু করেন যেহেতু

তাঁরা জানতেন যে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তাঁরা ভারতীয় বাহিনীতেই থাকবেন ও কাজ করবেন। এই সমস্ত বিবেচনা থেকে ভারতীয় রাজকর্মচারীদের ওপর প্রচণ্ড চাপ আসতে থাকে এবং ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় যখন ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে সরকারের মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় তখন এই চাপ প্রকাশ্য হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতি থেকে এটা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে ভারতের ওপর ব্রিটিশ আধিপত্য অনির্দিষ্ট কালের জন্য থাকতে পারে না।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে একটি প্রার্থনা সভায় গান্ধীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে ব্রিটিশের ভারত-ত্যাগের আসল উদ্দেশ্য কী। প্রশ্নকারী এইভাবে প্রশ্নটি করেছিলেন, "The question was, George Bernard Shaw has remarked that 'an Englishman is never in the wrong. He does everything on principle ; he enslaves you on imperial principles ; he robs you on business principles ; he fights you on patriotic principles : he supports his king on loyal principles and cuts off his king's head on republican principles'. I am eagar to know from you under which of these principles the Englishman is now quitting India. Is the Englishman glad over the present economic and political conditions of our beloved country? Does he feel satisfied in the secession of Travancore and Hyderabad States from the Indian Union ? Has he any axe to grind in scrapping the May 1946 paper and bringing forward in its place the recent partition plan ? Does he feel for the horrible happenings in Noakhali, in Behar and the Punjab, which happenings have forced the Congress to accept the plan? What can be the reason or idea behind Mr Churchill and company endorsing the plan ?'[২০] Gandhi replied saying that Shaw's banter was by no means exhaustive, nor were the Englishman's resources, and that he had no doubt that the Englishman was quitting India on principle 'because he had discovered that it was wrong on economic and political grounds to hold India in bondage . . . (but) before quitting, he was setting the seal of approval on the policy of playing off one community against another'.[২১]

যুদ্ধের অবসানের সময় থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের দিন ফুরিয়ে আসছে। বেশীর ভাগ ইংরেজরাও বুঝেছিলেন যে, যে স্বাধীনতার জন্য ইংরেজ ও ভারতীয় সৈনিকরা এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে পাশাপাশি প্রাণ দিয়েছিলেন, পরবর্তী কালে ভারতীয়রা সেই স্বাধীনতার দাবি করবে। ১৯৪৫ সালে ব্রিটেনে 'লেবার' সরকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই একথাও সুনিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে ভারতে স্বাধীনতা আসছে। শুধু সমাজবাদীরাই নয়, অনেক রক্ষণশীলরাও বুঝতে পেরেছিলেন যে আর বেশী দিন ভারতে ব্রিটিশ শাসন টিকিয়ে রাখার চেষ্টা খুব বাস্তব নীতি হবে

না। ভারতবর্ষে এমন পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিল যে ভারতীয় সৈনিকদের দিয়ে তাদেরই নিজের দেশবাসীদের দমন করা আর সম্ভব ছিল না, বেয়নেটের ডগায় উৎপীড়ন করা তো নয়ই। যদি ভারতীয় সৈনিকদের দিয়ে একাজ সম্ভব না হয় তাহলেও কি ভারতে যথেষ্ট ব্রিটিশ সৈনিক ছিল যাদের দিয়ে এ কাজ করা যেত? এর উত্তর খুব পরিষ্কার, "না, ছিল না।" যুদ্ধক্লান্ত ব্রিটেনও চাইছিল যে তাদের ছেলেরা সাম্রাজ্যের বিদ্রোহ থামাতে দূর-দূরান্তে পড়ে না থেকে যেন দেশে ফিরে আসে। তাছাড়া ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদের অহমিকা এই যুদ্ধ চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল। এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, "After Singapore, Burma and the sinking of her finest ships by the Japanese, Britain would never again be able to demonstrate in Asia the background of strength and influence—the *macht politic*—which had far so long enabled her to rule a million people with one man on-the-spot".[২২]

১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে লর্ড মাউন্টবেটেন ভাইসরয় পদে লর্ড ওয়েভেলকে অনুসরণ করলেন। ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন তিনি কিভাবে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে সেই বিষয়ে একটি বিবৃতি দেন।[২৩] মাউন্টবেটেন তাঁর পরিকল্পনায় ভারত বিভাগের কথা সুনিশ্চিতভাবে বলায় লীগ তাঁকে স্বাগত জানালো। অবশেষে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ব্রিটিশ সংসদ ভারতীয় স্বাধীনতা আইন পাশ করে এবং ভারত ও পাকিস্তান এই দুটি 'ডোমিনিয়ন' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উভয়ের সীমানা চিহ্নিত হয়। এই স্বাধীনতা সাম্রাজ্যবাদের একটি যুগের অবসান সূচিত করল।

ভারতীয় স্বাধীনতা বিলের সপক্ষে বলতে গিয়ে ব্রিটিশ হাউস অফ্ কমনস্-এ প্রধানমন্ত্রী এট্‌লি বললেন যে যদিও ইতিহাসে বহু দৃষ্টান্ত আছে যখন তরবারির সামনে সাম্রাজ্যের অবসান ঘটেছে, কিন্তু বহুদিন ক্ষমতা উপভোগের পর কোন জাতি তার অধীন জাতিকে স্বাধীনতা দিয়েছে এ দৃষ্টান্ত বিরল। এট্‌লি উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতে স্বায়ত্তশাসন অবশ্যম্ভাবী এবং ব্রিটেনের পক্ষে ভারতে তার অধিকার চিরকাল রাখার স্বপ্ন অবাস্তব। তবু তিনি শুধু আশা করেছিলেন যে স্বাধীনতার পরে এমন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে যা ভারত ও ব্রিটেন উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর হবে এবং ১৮৫৪ সালে লেখা মাউন্ট স্টুয়ার্ট এল্‌ফিন্‌স্টোনের একটি চিঠি থেকে তিনি একটি উদ্ধৃতি দেন, "The moral is that we must not dream of perpetual possession, but must apply ourselves to bring the nation into a state that will admit of their governing themselves in a manner that may be beneficial to our interests as well as their own . . ."[২৪]

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা অর্জন করল। ১৪ই আগস্ট রাত্রে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এই বহু-প্রতীক্ষিত স্বাধীনতাকে বন্দনা করে বলেন, "Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we

shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially... At the stroke of the midnight hour when the whole world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out of the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take a pledge of dedication to the service of India and to her people and to the still larger cause of humanity."[২৫] তারপর তিনি বললেন, "The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality... The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but so long as there are tears and suffering, so long our work will not be over".

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের পনেরো তারিখ ভারতের পক্ষে এক মিশ্রিত অনুভূতির দিন। স্বাধীনতা-প্রাপ্তি আনন্দ এনেছিল, উৎফুল্ল করেছিল সত্য, কিন্তু একথাও ভোলার উপায় ছিল না যে ভারত বিভক্ত হল এবং স্বাধীনতা এল এই ভারত-ভাগের ভিত্তিতে। তা ছাড়া এরপরই যে বীভৎস সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড ঘটে তাতে আনুমানিক পাঁচ লাখ মানুষের মৃত্যু হয় এবং বহু লক্ষ মানুষ গৃহহীন বা গৃহহারা হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর পাকিস্তানের ওপর দিয়ে কাশ্মীরে হানাদাররা আক্রমণ করে। এই ঘটনায় সদ্যোজাত ভারত ও পাকিস্তান 'ডোমিনিয়ন' দুটি পরস্পরের সঙ্গে প্রায় এক যুদ্ধের সীমায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অপরিসীম। এশিয়া উপকূল ভাগের অন্যতম বৃহৎ অংশে ইউরোপীয় আধিপত্যের এতে অবসান ঘটল। এরপরই এশিয়া ও আফ্রিকাতে একের পর এক ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের পতন হতে লাগল। যুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মত পাশ্চাত্য উপনিবেশবাদী শক্তিগুলির অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা ভেঙে পড়ে। জাপানী সেনাবাহিনীর পূর্ব এশিয়া বিজয় প্রাচ্যদেশের মানুষের কাছে ইউরোপের অহঙ্কার চূর্ণ করে দিয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির পতন এবং আমেরিকা ও রাশিয়ার মত বিশ্বশক্তির উত্থান সূচিত করে। পাশ্চাত্য শক্তিগুলির পতনের ফলে প্রাচ্যে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যগুলি একে একে শেষ হয়ে গেল, ভারতে ১৯৪৭ সালে, সিংহল ও বর্মায় ১৯৪৮ সালে এবং ইন্দোনেশিয়াতে ১৯৪৯ সালে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ ফৌজ

স্বাধীনতা অর্জনের পদ্ধতি হিসেবে গান্ধী সত্যাগ্রহ ও অহিংস অসহযোগ আন্দোলন উদ্ভাবন করেন। অহিংসার আদর্শে পুরোপুরি বিশ্বাসী না হয়েও নেহেরু গান্ধীর নেতৃত্ব স্বীকার করে অহিংস অসহযোগ সমর্থন করেন। আর সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে পথ নিয়েছিলেন তা ছিল এ থেকে আমূল পৃথক্। তিনি অক্ষশক্তির সহায়তা আদায় করে এক আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তোলেন এবং ভারতের ব্রিটিশ শাসন সবলে উৎপাটিত করতে ব্রতী হন।

সুভাষচন্দ্র ও নেহেরুর সঙ্গে গান্ধীর সম্পর্ক ছিল দুই ধরনের। যুব ভারতের অন্যতম নেতা নেহেরু, যাঁকে তিনি নিজের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে গান্ধীর সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ ও কর্মসাহচর্যের, আর যুব ভাবতের অন্য নেতা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে গান্ধীর সম্পর্ক ছিল ভিন্ন ধরনের। মানসিকতার দিক ধরলে সুভাষচন্দ্র গান্ধীর থেকে অনেক পৃথক্ ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে এই মানসিকতার পার্থক্য গান্ধীর ধর্মপ্রবণতা এবং সুভাষের ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য নয়। সঙ্গীতজ্ঞ সাধক দিলীপকুমার রায়, যিনি সুভাষচন্দ্রকে তাঁর কলেজ-জীবন থেকে জানতেন, বলেছেন যে সুভাষের মানসিকতা ছিল তপস্যার।[১] বাস্তবিকই সুভাষ যখন ছাত্র ছিলেন তখন ধর্মোপলব্ধির জন্য তিনি একবার গৃহত্যাগ করে হিমালয় পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু অন্তরে ধর্মপ্রবণ হলেও সুভাষচন্দ্র মনে করতেন যে রাজনীতিতে ধর্মের স্থান নেই। ১৯২৯ সালের অক্টোবরে সুভাষ বলেছিলেন, "a subject race has nothing but politics."[২]

ষোল বছর বয়সে সুভাষ উত্তর ভারতের শহরগুলিতে গুরুর সন্ধানে ঘুরেছিলেন, কিন্তু মনের মত গুরু না পেয়ে তিনি পরে ঘরে ফিরে আসেন। ভারতে পড়াশুনা শেষ করে তিনি ইংল্যাণ্ডে যান এবং সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন। ১৯২০ সালে তিনি এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হন এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনের 'লৌহ কাঠামোতে' প্রবেশের অধিকার লাভ করেন। কিন্তু তাঁর জাতীয়তাবাদী সত্তা তাঁকে ব্রিটিশের অধীনে তাঁবেদারির চাকরি নিতে বাধা দিল। ১৯২১ সালের মে মাসে তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করেন এবং মাত্র ২৪ বছর বয়সে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেন। তিনি দশ বার কারাদণ্ড ভোগ করেন এবং প্রায় আট বছর কারাকক্ষে অবরুদ্ধ ছিলেন।

সুভাষচন্দ্র আপোষহীন সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন।[৩] তিনি ছিলেন চরমপন্থী, যাঁর চাওয়া ছিল হয় সবটা, নয় কিছুই না।[৪] তিনি বলতেন, "there is nothing that lures me more than a life of adventure."[৫]

কিন্তু সুভাষচন্দ্র চিরকালই বাস্তববাদী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, রাজনীতিতে বড় বড় নীতি-বচনের স্থান নেই। তিনি তাই বলতেন যে এই বস্তুবাদী দুনিয়ার পক্ষে গান্ধীর পদ্ধতি বড় বেশী উঁচুতে এবং রাজনৈতিক

নেতা হিসেবে তিনি তাঁর বিরোধীদের সঙ্গে একটু বেশী রকমের খোলাখুলি ব্যবহার করেন।[৬]

গান্ধীর অহিংসদর্শনে সুভাষচন্দ্র বিশেষ আকৃষ্ট হন নি। ভারতের পতনের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন, "After all what has brought about India's downfall in the material and political sphere ? It is her inordinate belief in fate and in the supernatural, her indifference to modern scientific development, her backwardness in the science of modern warfare, the peaceful contentment engendered by her latter-day philosophy and adherence to *ahimsa* carried to the most absurd length"

১৯২০ সালে ছাত্রদের কাছে এক ভাষণে সুভাষচন্দ্র গান্ধী ও অরবিন্দের দার্শনিক তত্ত্বের কিছু সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে পণ্ডিচেরী থেকে অরবিন্দের নামে যে চিন্তাধারার উদ্ভব হচ্ছে এবং সবরমতীতে গান্ধীর নামে যে চিন্তাধারার উদ্ভব হচ্ছে, দুই-ই নিষ্ক্রিয়তার দিকে নিয়ে যায়; আর ভারতের প্রয়োজন আধুনিক, সংগ্রামী ও উচ্চাশার ভাবধারা। তিনি বলেন, আমাদের এই পুণ্য দেশে আশ্রম কিছু নূতন প্রতিষ্ঠান নয়, আর সাধু-যোগীরা কিছু অভিনব জিনিস নন। তাঁর মতে কেবল মাত্র তাঁদেরই নেতৃত্ব অনুসরণ করে ভারতকে স্বাধীন, সুখী ও মহৎ করা যাবে না।[৭]

যখন ভারতের প্রয়োজন সক্রিয়তর দর্শন ও গতিশীলতার মনোভাব, তখন সুভাষচন্দ্র অভিযোগ করলেন, যে গান্ধীর অহিংসা-মন্ত্র ও চরকা-কাটার নেতৃত্ব নিষ্ক্রিয় পশ্চাৎমুখিতার জন্ম দেবে। ভারতকে সময়ের সঙ্গে চলতে হবে, সে গরুর গাড়ী বা চরকার যুগে ফিরে যেতে পারে না, স্বাধীন ভারতকে তার শত্রুদের মোকাবিলা করতে হবে আধুনিক অস্ত্র ও পদ্ধতি দিয়ে, অহিংসার নাম করে সে তার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব এড়াতে পারবে না।[৮]

গোড়া থেকেই সুভাষচন্দ্র গান্ধীর বহু রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। তিনি বলতেন গান্ধীবাদের অসম্পূর্ণতা হল তার পুরোপুরি অহিংসার ওপর নির্ভরতা। পরবর্তী কালে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধীর নেতৃত্বের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। তাঁর বিজয়-গৌরবের শৃঙ্গারোহণ ঘটল তখন, যখন ১৯৩৯ সালে তিনি গান্ধীর আশীর্বাদ-ধন্য পট্টভি সীতারামিয়াকে পরাজিত করে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। পট্টভির পরাজয়, গান্ধী নিজেই ঘোষণা করেন, তাঁর নিজের পরাজয়। গান্ধীর সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে কার্যকরী পরিষদের বেশীর ভাগ সদস্য পদত্যাগ করেন। নিজেকে গান্ধীপন্থীদের মধ্যে একাকী দেখে সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্ব থেকে পদত্যাগ করা ছাড়া উপায় রইল না। তারপর থেকে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সরকারী কংগ্রেসের পার্থক্য বেড়েই চলল। অবশেষে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ছেড়ে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে একটি আলাদা দলের পত্তন করেন।

সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগের পূর্বে যে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয় তা থেকে ত্রিপুরী কংগ্রেসের মুখ্য অভিনেতাদের মনোভাব বেশ ভালভাবে বোঝা যায়। সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস সভাপতিত্বে পুনর্নির্বাচনের পরই প্যাটেল ও

অন্যান্য গোঁড়া গান্ধীপন্থীরা পদত্যাগ করে যে চিঠি দেন সেটা গান্ধীর জীবনীকার তন্দুলকারের মতে গান্ধীর নিজের মুসাবিদা করা।[৯] যে দুটি মাত্র লোক পদত্যাগ করেন নি তাঁরা হলেন শরৎচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্রের সহোদর ভাই, আর নেহেরু। অবশ্য নেহেরু একটি স্বতন্ত্র বিবৃতিতে জানিয়ে দেন যে তিনি নূতন কার্যকরী পরিষদে কাজ করবেন না।

নেহেরু তাঁর 'এ বাঞ্চ অফ ওল্ড লেটার্স' বইতে যে চিঠিপত্র প্রকাশ করেন তা থেকে সুভাষ-নেহেরু ও সুভাষ-গান্ধী সম্পর্কের ওপর যথেষ্ট আলোকপাত ঘটে। ১৯৩৯ সালের ২৮শে মার্চ সুভাষচন্দ্র নেহেরুকে লেখেন, "I find that for some time past you have developed tremendous dislike for me. I say this because I find that you take up enthusiastically every possible point against me ; what could be said in my favour you ignore, what my political opponents urge against me you concede, while you are almost blind to what could be said against them. On my side, ever since I came out of internment in 1937, I have been treating you with the utmost regard and consideration, in private life and in public. I have looked upon you as politically an elder brother and leader and have often sought your advice".[১০]

নেহেরু এই চিঠির উত্তর দেন ১৯৩৯ সালের ৩রা এপ্রিল। তিনি বলেন, স্পষ্টবাক্য মাঝে মাঝে কষ্ট দেয় বটে কিন্তু সহকর্মীদের মধ্যে খোলাখুলিই কথা হওয়াই ভাল। কেন সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের বিরোধিতা করেন তার কারণ বলতে গিয়ে তিনি লেখেন, "I was against your standing for election for two major reasons : it meant under the circumstances a break with Gandhiji and I did not want this to take place. Why this should have necessarily happened I need not go into. I felt that it would happen. It would mean also, I thought, a set back for the real Left. The Left was not strong enough to shoulder the burden by itself and when a real contest came in the Congress, it would lose and then there would be a reaction against it. I thought it probable that you would win the election as against Pattabhi, but I doubt very much whether you could carry the Congress with you in a clear contest with what is called Gandhism".[১১] পরবর্তী কালে, ১৯৩৯ সালের ১৭ই এপ্রিল, নেহেরু গান্ধীকে একটি চিঠি লেখেন। এতে তিনি বলেন যে কংগ্রেসের পুনর্নির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্রের উচিত গান্ধীকে কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের নাম নির্ধারণ করতে দেয়া এবং তাতে যদি সুভাষচন্দ্র রাজী হন "then the responsibility rests with you (Gandhi) and ... you should accept Subhas as President. To try to push him out seems to me to be an exceedingly wrong step".[১২]

গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য ধরা পড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। গান্ধী তখনও অহিংসায় ব্রতী. কিন্তু সুভাষচন্দ্র দেশ ছেড়ে গেলেন জর্মানীতে ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াইয়ে বিদেশী সাহায্য সংগ্রহ করতে। ১৯৪১ সালে নাটকীয়ভাবে কলকাতার পুলিশপ্রহরা এড়িয়ে সুভাষচন্দ্র আফগানিস্তান এবং রাশিয়া ঘুরে জর্মানী পৌছেন। ১৯৪১-এর মার্চ মাসে জর্মানী পৌছে সুভাষচন্দ্র হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠন করায় তাঁর সমর্থন আদায় করেন। পরে একটি জর্মান সাবমেরিনে সুভাষচন্দ্র ইন্দোনেশিয়া যান এবং সেখান থেকে বিমানে জাপানে পৌছান। জাপান-এ জেনারেল তোজো তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। তার পরই সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আসেন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠা করেন।

স্বাধীনতা অর্জনের পদ্ধতি সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের মতামত ছিল গান্ধীর মতামতের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বিশ্বাস করতেন, সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না। ১৯৪২ সালের ২রা অক্টোবর ব্যাঙ্কক থেকে এক বেতার ভাষণে সুভাষচন্দ্র সকলকে মনে করিয়ে দেন যে ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপুর কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে অসহযোগের প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে গান্ধী বলেছিলেন---ভারতবর্ষের আজ যদি তরবারি থাকত তাহলে সে তরবারি উন্মুক্ত করে দাঁড়াত। "Mahatmaji then said that since armed revolution is out of the question, the only other alternative before the country was that of non-cooperation or *satyagraha*. Since then times have changed and it is possible for the Indian people to draw the sword".[১৩]

সুভাষচন্দ্র বলেন যে ১৯০৫ সালের যুদ্ধে জাপান যখন রাশিয়াকে পরাজিত করে তখন ভারতের মানুষ বুঝতে পেরেছিল যে শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। তখনই অসহযোগের পথ অনুসরণ করা হয়। কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে বহু ভারতীয় যুবক ফ্রান্স এবং সুইজারল্যাণ্ড যায় অস্ত্রনির্মাণের কৌশল শিখতে এবং তারই ফলে ১৯০৭ সালের রাজনৈতিক আন্দোলনে রিভলবারের মত ক্ষুদ্র অস্ত্র ব্যবহৃত হয়।[১৪] সুভাষচন্দ্র স্বীকার করেন যে সেই যুগে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করার সময় আসে নি, কিন্তু তিনি দাবি করেন যে সে সময় পরিবর্তিত হয়েছে এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রামের দিন এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সুভাষচন্দ্র প্রথমে জর্মানী থেকে ও পরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ভারতীয়দের সশস্ত্র বিদ্রোহের আহ্বান জানান এবং ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ বিতাড়নের জন্য অক্ষশক্তিকে সাহায্য করতে বলেন।

সুভাষচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কোন রকম বাইরের সাহায্য ছাড়া স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। তিনি বলেন, গত ২০০ বৎসরের পৃথিবীর সকল স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস তিনি অধ্যয়ন করেছেন এবং এমন একটি দৃষ্টান্তও তিনি পান নি যেখানে বাইরের সাহায্য সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে স্বাধীনতা আন্দোলন সফল হয়েছে। তাছাড়া যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য একটি শক্তিশালী বিশ্বব্যাপি উপনিবেশ, যেটা, সুভাষচন্দ্রের ভাষায়,

"buttressed by a combination of several other powers," ... (then) it would be height of folly not to accept any assistance that may be offered to us."[১৫] তিনি বিশ্বাস করতেন যে দেশের মধ্যে থেকে যত চেষ্টাই করা যাক্ তাতে ব্রিটিশ শক্তির উৎখাত সম্ভব হবে না এবং সেই জন্যেই তাঁর দেশ ছাড়া অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল। তিনি বলেন, "If the struggle at home had sufficed to achieve liberty for our people, I would not have been so foolish as to undertake this unnecessary risk and hazard .. my object in leaving India was to supplement from outside the struggle going on at home."[১৬]

সুভাষচন্দ্র বলতেন, তাঁর রাজনৈতিক জীবনে তিনি সব সময়ই অনুভব করতেন যে অন্য সব দিক্ থেকে ভারত স্বাধীনতার জন্য তৈরী, শুধু তার নেই একটি মুক্তিফৌজ। তাঁর ভাষায়, "George Washington of America could fight and win freedom, because he had his army. Garibaldi could liberate Italy because he had his armed volunteers behind him." তাই ১৯৪৩ সালের ৫ই জুলাই সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের পরিদর্শনকালে ঘোষণা করলেন, "It is your privilege and honour to be the first to come forward and organise India's National Army. By doing so, you have removed the last obstacle in our path to freedom."[১৭]

১৯৪২ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে ৪০ হাজার ভারতীয় যুদ্ধবন্দী ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগদান করে। ১৯৪৩ সালের নভেম্বরে সিঙ্গাপুর থেকে সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ বা স্বাধীন ভারতের যুদ্ধকালীন সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন। তিনি নিজে এই সরকারের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, যুদ্ধ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করেন।[১৮] ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ফলে তখন প্রায় সব ভারতীয় নেতা কারারুদ্ধ ছিলেন, সেইজন্য ভারতের মধ্যে যুদ্ধকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিল না। সুভাষচন্দ্র তাই দাবি করেন যে পূর্ব-এশিয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেনডেন্স লীগের কর্তব্য হল ভারতের ভিতরের ও বাইরের সমস্ত দেশপ্রেমিক ভারতীয়দের সহায়তায় এই আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা করা এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের দ্বারা স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম পরিচালনা করা।

১৯৪৩ সালের নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রী তোজো আজাদ হিন্দ সরকারকে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে দেবার জাপান সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১৯৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সুভাষ ব্রিগেড---ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর প্রথম ব্যাটালিয়ন, রেঙ্গুন থেকে প্রোম অভিমুখে যাত্রা করে। ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে এই সৈন্যদল ব্রিটিশ বাহিনীর পশ্চিম আফ্রিকা সৈন্যদলকে পরাস্ত করে। ১৯৪৪ সালের ১৯শে মার্চ ভারতীয় জাতীয় বাহিনী ভারতের মাটিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। ১৯৪৪-এর মে মাসে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী মোওডক দখল করে। কিন্তু তারপরই যুদ্ধজয়ের মোড় ঘুরে যায়। ১৯৪৪-এর জুন মাসে জাপানীরা বর্মা পরিত্যাগ

করে। ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বরে ব্রিটিশ বাহিনী মোওডাক পুনরায় দখল করে নেয়, ১৯৪৫-এর ৪ঠা মে মিত্রশক্তি রেঙ্গুন পুনরধিকার করে এবং ৭ই মে জর্মানী আত্মসমর্পণ করে। জর্মানীর আত্মসমর্পণের পরেও জাপান কয়েক মাস যুদ্ধ চালায়, কিন্তু ১৯৪৫-এর ৬ই আগস্ট হিরোসিমাতে পারমাণবিক বোমা ফেলা হয় আর তারপর এই বোমা ফেলা হয় নাগাসাকিতে। তিন দিন পরে জাপান শান্তি-চুক্তির প্রার্থনা জানায়। জাপানের আত্মসমর্পণের পরেই ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর ভারত-মুক্তির আশার অবসান ঘটে।

সুভাষচন্দ্র ভারত ছেড়ে যখন জর্মানীতে হিটলারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন তখনই ব্রিটিশ সরকার তাঁকে শত্রুপক্ষের দালাল বলে ঘোষণা করেছিল। ভারতের কম্যুনিস্টরা, যারা রাশিয়া ব্রিটেনের পক্ষে যুদ্ধ শুরু করার পর ব্রিটিশ যুদ্ধপ্রয়াসকে সমর্থন করত, তারাও সুভাষচন্দ্রকে ফ্যাসিস্ট বলে সমালোচনা করে। সুভাষচন্দ্র জানতেন যে ফ্যাসিজম্-এর বিরুদ্ধে ভারতে যথেষ্ট বিরোধিতা আছে এবং তাঁর অক্ষশক্তির সহায়তা নেওয়াটা ভারতে অনেক জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করতে পারে। তাই ১৯৪০ সালের ২০শে এপ্রিল বার্লিন থেকে এক বেতারভাষণে তিনি ঘোষণা করেন যে তিনি অক্ষ-শক্তির উমেদার নন, তাঁর একমাত্র প্রয়াস হল ভারতের স্বাধীনতা। তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের দালাল বলে যে অভিযোগ দেয়া হয়েছিল সেটা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "I need no credentials when I speak to my own people. My whole life is one long, persistent, uncompromising struggle against British Imperialism, and is the best guarantee of my bonafides".[১৯] তিনি বলেন অক্ষশক্তির কাছ থেকে তিনি সহায়তা পাচ্ছেন কারণ অক্ষশক্তির স্বার্থেই ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের অবলোপ প্রয়োজন।

১৯৪২ সালের এপ্রিলে যখন জাপান ভারতে বোমা ফেলতে শুরু করে তখন সুভাষচন্দ্র বলছিলেন যে জাপান ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর বাধা দূর করে দিচ্ছে এবং জাপান ভারতীয়দের মিত্র ও সহায়ক।[২০] তাঁর মতে ব্রিটিশ আধিপত্য অবসানের জন্য জাপানের সাহায্য প্রয়োজন। তাই রাজ-নৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় বা নিরপেক্ষ থাকা উচিত হবে না। তিনি বলেন, "If we do so we shall either continue to be enslaved in spite of the dismemberment of the British Empire or we shall receive freedom as a gift from the victorious Tripartite powers. We want neither. The Indian people must, therefore, fight and win their liberty. But in this fight some help from abroad will be necessary."[২১]

গান্ধী বহিঃশক্তির সহায়তা বা সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাস করতেন না। ১৯৪২-এর আগস্ট মাসে তিনি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু করেন, কিন্তু তিনি ভারতীয়দের অহিংস থাকতে বলেন। পরবর্তী কালে ভারতের স্বাধীনতা এসেছিল অনেক কারণের যোগফলে, যার মধ্যে ছিল গান্ধীর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন, যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ শক্তির অবক্ষয়, আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের বিচারে দেশের মধ্যে প্রতিক্রিয়া, ভারতীয় নৌবিদ্রোহ এবং এমনি আরো অনেক কারণ। গান্ধী স্বাধীনতা চেয়েছিলেন অহিংস অসহযোগের পদ্ধতিতে, আর সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন সশস্ত্র প্রতিরোধের মাধ্যমে।

মৌলানা আজাদ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতীয় মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে চিন্তার দুটি ধারা ছিল। প্রথমটি হল আলিগড় গোষ্ঠীর চিন্তা---যেটি পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহী ও আধুনিক, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে রক্ষণশীল, এমনকি কিছুটা সামন্ততান্ত্রিক। অন্য চিন্তাধারাটি মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এক নিখিল ইসলাম-বোধের জন্ম দেয় এবং এই চিন্তার মাধ্যমে তুরস্কের জাতীয়তাবাদীদের অনুসরণে সাংবিধানিক ও সামাজিক সংস্কারের প্রবণতা আসে। আলিগড় গোষ্ঠীর মুখ্য মুখপাত্র সৈয়দ আহমেদ ভারতীয় মুসলিমদের তুরস্কের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিতে বা আগ্রহী হতে নিষেধ করেন। তবুও ভারতীয় মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের এক ক্রমবর্ধমান অংশ তুরস্কের অনুপ্রেরণায় সাংবিধানিক ও সামাজিক সংস্কারের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই নূতন ধারার অন্যতম নেতা হলেন আবুল কালাম আজাদ।

আজাদ ছিলেন এক আশ্চর্য ধরনের মানুষ এবং একজন অতিশয় পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর জীবনীকার মহাদেব দেশাই ধরে নিয়েছিলেন যে আজাদ কায়রোর 'অল জাহার' বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছিলেন[১] এবং নেহেরুও তাঁর 'ডিস্কভারি অফ্ ইণ্ডিয়া'[২] গ্রন্থে সেই কথাই বলেছেন। আসলে আজাদ কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষা নেন নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন আরবী ও পারসী ভাষায় একজন বিরাট্ পণ্ডিত। আজাদ ঐসলামিক ঐতিহ্যে গড়ে উঠেছিলেন। তিনি ইসলাম শাস্ত্রকে যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল আধুনিক ও জাতীয়তাবাদী এবং তিনি সাংবিধানিক ও সামাজিক সংস্কারের প্রচার করতে চেয়েছিলেন।

আজাদ তুরস্ক ও অন্যান্য ঐসলামিক রাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদের বিকাশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং ভারতেও জাতীয়তাবাদের সূত্রপাতকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। খুব পরিষ্কারভাবে তিনি উপলব্ধি করে-ছিলেন যে ইসলাম ও বিভিন্ন ঐসলামিক রাষ্ট্রের প্রতি সহানুভূতিশীলতার সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের কোন বিরোধ নেই। ১৯০৫ সালে আজাদ বাঙলাদেশের বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে ও তিনি বিপ্লবী গোষ্ঠীতে যোগ দেন।[৩] সেই সময়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মুসলিম সমাজের এত কম অংশ এসে-ছিলেন যে বিপ্লবী গোষ্ঠীতে আজাদের উপস্থিতি প্রথমে সন্দেহের চোখে দেখা হয়। আজাদ লিখেছিলেন, "সেই সময়ে বিপ্লবী গোষ্ঠীতে শুধুমাত্র হিন্দু মধ্য-বিত্তরাই যোগ দিতেন। বস্তুত বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলি মুসলিম-বিরোধী ছিলেন। তাঁরা ভাবতেন, ইংরেজ সরকার মুসলিমদের ভারতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছেন এবং মুসলিমরাও সরকারের সেই কৌশলে অংশ নিচ্ছে। পূর্ববঙ্গকে একটি পৃথক্ প্রদেশ করা হয়েছিল এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নর বামফিল্ড ফুলার প্রকাশ্যভাবে বলেছিলেন যে সরকার মুসলিম সম্প্রদায়কে তাঁর সুয়োরাণী বলে মনে করেন। বিপ্লবীরা তাই মনে করতেন

য ভারতের স্বাধীনতালাভের পথে মুসলিমরা একটা বাধা এবং অন্যান্য বাধার মতই এদের সরিয়ে দিতে হবে।"[৪]

১৯০৮ সালে আজাদ ইরান ও মিশর ভ্রমণে যান। ভারতীয় মসলিমরা কেন জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে না এই বিষয়ে সেখানে আরব ও তুর্কী জাতীয়তাবাদীরা আজাদের কাছে বিস্ময় প্রকাশ করেন। আজাদ লিখে-ছিলেন, "তারা বুঝতে পারে নি কেন ভারতীয় মুসলমানরা ইংরেজদের ধ্বজাধারী। সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে আমার দৃঢ় প্রত্যয় জাগে যে ভারতীয় মুসলমানদের দেশের রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করা উচিত।"[৫]

১৯১২ সালে দেশে ফেরার পর আজাদ তাঁর বামপন্থী চিন্তা প্রচারের জন্যে 'অল হিলাল' সংবাদপত্রটি প্রকাশ করেন এবং এই পত্রিকায় লেখাগুলিতে মুসলিম যুবসমাজে একটা সাড়া পড়ে যায়। কিন্তু আলিগড় গোষ্ঠীর রক্ষণ-শীল নেতারা এই লেখাগুলিকে ভাল নজরে দেখতে পারেন নি, কারণ তাঁরা জানতেন যে এই সব লেখার অনিবার্য ফল এই হবে যে ভারতীয় মুসলিমরা জাতীয়তাবাদ এবং সাংবিধানিক ও সামাজিক সংস্কারের দিকে আকৃষ্ট হবে এবং তাতে আলিগড় ঐতিহ্য, যার ভিত্তি ছিল অবিচল ব্রিটিশ রাজভক্তির পথে মুসলমান শিক্ষার প্রসার, সেই রাজভক্তির নীতি দুর্বল হয়ে পড়বে। এইসব সংগ্রামী রচনার জন্য আজাদ শীঘ্রই ব্রিটিশ সরকারের কোপে পড়েন এবং ১৯১৪ সালে 'অল হিলাল'-এর ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করা হয়। তারপর আজাদ 'অল বলাঘ্' নামে আর একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। কিন্তু তার অস্তিত্বও খুব স্বল্পস্থায়ী হয় কারণ ১৯১৬ সালে আজাদকে ব্রিটিশ সরকার অন্তরীণ করেন। আজাদ ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে এক সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন এবং বহুবার কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি অনেক বৎসর ধরে কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবির তিনি ছিলেন আপোসহীন বিরোধী।

কংগ্রেস বরাবরই মুসলিম লীগের এই দাবির বিরোধিতা করেছে। কিন্তু ১৯৪৬ সালের কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যৌথ অন্তর্বর্তী সরকারের অভিজ্ঞতা থেকে সর্দার প্যাটেলের এই স্থির বিশ্বাস জন্মায় যে লীগের সঙ্গে কাজ করা সম্ভব হবে না। লীগের মনোনীত লিয়াকৎ আলি খান অর্থমন্ত্রকের ভার পেয়েছিলেন এবং সর্দার প্যাটেল আবিষ্কার করলেন যে লিয়াকৎ আলির সম্মতি ছাড়া তিনি একটি চাপরাসীর পদও সৃষ্টি করতে পারেন না।[৬] এই থেকে সংঘর্ষ ও তিক্ততার সৃষ্টি হয়, আর ভাইসরয় মাউন্টবেটেনকে ভারত-ভাগের প্রস্তাব আনার সুযোগ করে দেয়।

মুসলিম লীগের সঙ্গে এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলে কাজ করার তিক্ত অভিজ্ঞতা সর্দার প্যাটেলকে এতই বিরক্ত ও বিচলিত করেছিল যে তিনি মনে করলেন, দেশবিভাগ মেনে নেওয়া এর চেয়ে ভাল। আজাদ লেখেন, "মুসলিম লীগকে অর্থমন্ত্রক দেবার প্রস্তাব করেছিলেন সর্দার প্যাটেলই, আর সেই জন্য লিয়াকৎ আলি খাঁর কাছে অসহায়তা তাঁরই সবচেয়ে বেশী বেজেছিল। যখন লর্ড মাউন্টবেটেন বললেন যে দেশভাগ করলে হয়ত এই সমস্যার সমাধান হবে, সর্দার প্যাটেলের মন সেটা মেনে নেয়ার জন্য তৈরী

হয়েই ছিল। তিনি খোলাখুলি বললেন যে লীগকে তাড়াবার জন্য দরকার হলে তিনি তাদের দেশের একটা অংশ দিয়ে দিতেও রাজী।"[৭]

একই ভাবে নেহেরুও এই সিদ্ধান্তে আসেন যে লীগের সঙ্গে কাজ করা সম্ভব নয়। যদি ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র গড়া হয় তাহলে বিভিন্ন প্রদেশগুলির হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকবে এবং যে যে প্রদেশে মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে, তারা এই যুক্তরাষ্ট্র পরিচালনা অসম্ভব করে তুলবে, আর তাহলে তো নেহেরুর অতি প্রিয় প্রগতিশীল অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলি সারাদেশে কার্যকরী করা সম্ভবই হবে না।

আজাদ অবশ্য শেষ অবধি দেশভাগের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। দেশভাগ অনিবার্য বলে নেহেরুর যে ধারণা হয়েছিল তাতে আজাদ অবাক্ হয়ে যান। তিনি মনে করেছিলেন যে মাউন্টবেটেনের পরামর্শেই বুঝি নেহেরু এই মতবাদে উপনীত হয়েছেন। নেহেরু এবং প্যাটেল দুজনকেই তিনি এ ব্যাপারে আরও বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আজাদ লিখেছিলেন, "আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম, আর খুব বেদনাও পেয়েছিলাম, যখন প্যাটেল বললেন যে আমরা চাই বা না চাই, ভারতে দুটি আলাদা জাতি বাস করছে। নেহেরুও মনে করেছিলেন যে দেশভাগ অনিবার্য, আর যা হবেই, তাকে বাধা দেয়া অর্থহীন।"[৮]

আজাদ এই সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে দেশভাগে সম্মত হলে ইতিহাস কোনদিন কংগ্রেসকে ক্ষমা করবে না। দেশভাগের দায়িত্ব ইতিহাসের রায়ে মুসলিম লীগের মত কংগ্রেসকেও নিতে হবে।[৯] বহু বছর পর, ১৯৫৬ সালে, তাঁর জীবনীকার মাইকেল ব্রেচারকে কংগ্রেসের দেশভাগ স্বীকার করে নেয়ার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নেহেরু বলেছিলেন, "Well, I suppose it was the compulsion of events and the feeling that we could not get out of that deadlock or morass by pursuing the way we had done ; it became worse and worse. Further, a feeling that even if we get freedom for India with that background it would be a very weak India, that is a federal India with far too much power in the federating units. A larger India would have constant disintegrating pulls. And also the fact that we saw no other way of getting our freedom in the near future . And so we accepted it . . . And if others do not want to be in it, well, how can we and why should we force them in it . . . "

লেয়োনার্ড মোসলের সঙ্গে কথোপকথনে ১৯৬০ সালে নেহেরু তাঁর মতবাদ আরও বেশী স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "সত্য কথা হল এই যে আমরা ছিলাম পরিশ্রান্ত, আর বয়েসও বেড়ে যাচ্ছিল। আমাদের মধ্যে কেবলমাত্র অল্প কয়েকজনই আবার জেলে যেতে তৈরী ছিল ; আর আমরা যদি আমাদের স্বপ্নের অবিভক্ত ভারতের সংকল্পে অবিচল থাকতাম, তাহলে স্পষ্টতঃই আমাদের জায়গা জেলেই হত। আমরা দেখলাম, পাঞ্জাবে আগুন জ্বলছে, প্রতিদিন খুনোখুনির খবর শুনতে পাচ্ছিলাম দেশভাগের প্রস্তাবে এইসব থেকে বেরুনোর একটা পথ পাওয়া গেল, আমরা

সেই পথই নিলাম।"[১০] কিন্তু সেই সঙ্গেই জওহরলাল একথাও বলেছিলেন যে গান্ধী যদি কংগ্রেস সভ্যদের দেশভাগ মেনে নিতে মানা করতেন, তাহলে "আমরা লড়াই চালিয়ে যেতাম এবং অপেক্ষা করে থাকতাম। কিন্তু আমরা শেষ অবধি দেশভাগ স্বীকার করে নিলাম। আমাদের আশা ছিল দেশভাগ হবে সাময়িক, পাকিস্তান আমাদের মধ্যে ফিরে আসতে বাধ্য। আমাদের মধ্যে কেউ ভাবতেই পারেনি যে এই খুনোখুনি হবে, আর কাশ্মীর-এর ঘটনা আমাদের সম্পর্ক এত খারাপ করে দেবে।"[১১]

দেশভাগ অনিবার্য নয়—একথা প্যাটেল আর নেহেরুকে বোঝাতে না পেরে আজাদ গান্ধীর কাছে যান। আজাদ যখন গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি দেশভাগ মেনে নেবেন কি-না, গান্ধী বলেছিলেন, "What a question to ask If the Congress wants to accept partition it will be over my dead body. So long as I am alive, I will never agree to the partition of India. Nor will I, if I can help it, allow Congress to accept it."[১২]

১৯৪৭ সালের ৩রা মে একটি প্রার্থনা সভায় গান্ধী ঘোষণা করেছিলেন, "যদি সারা ভারতবর্ষও জ্বলতে থাকে, যদি তরবারির মুখেও দেশভাগের দাবি আসে, তাহলেও আমরা পাকিস্তান মেনে নেব না।"[১৩]

কিন্তু অবশেষে গান্ধীও নরম হয়ে যান, আর কংগ্রেস দেশভাগ মেনে নেয়। আজাদ লিখেছিলেন, "লর্ড মাউন্টবেটেন উপদেশ দেন যে উত্তর-পূর্ব দিকে কিছু অংশ ছেড়ে দিয়ে এক শক্তিশালী সংহত ভারত গড়া উচিত। দেশ-ভাগ না হলে মুসলিম লীগ ভারতের ঐক্য ও শক্তি বানচাল করে দেবে এই ভেবে সর্দার প্যাটেল দেশভাগ মেনে নিলেন। আমার মনে হয়েছিল এই যুক্তি শুধু সর্দার প্যাটেলকে নয়, জওহরলালকেও প্রভাবান্বিত করেছিল। আর এই একই যুক্তি সর্দার প্যাটেল আর লর্ড মাউন্টবেটেন বারে বারে ব্যাখ্যা করে গান্ধীর দেশভাগের বিরোধিতা দুর্বল করে দেয়।"[১৪]

আজাদ বিশ্বাস করতেন যে কংগ্রেস যদি আরও কিছুকাল অপেক্ষা করত তবে হয়ত দেশভাগ এড়ানো যেত। বস্তুতঃ গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েভেল চেয়েছিলেন, ব্রিটিশ সরকার ভারত ছেড়ে যাওয়ার জন্য কোনও সময় নির্দিষ্ট করবে না, কিন্তু লেবার দলের নূতন প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট এট্‌লি এতে সম্মত হন নি। পরে লর্ড ওয়েভেল পদত্যাগ করেন এবং লর্ড মাউন্ট-বেটেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। মাউন্টবেটেনের পরামর্শে ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ সাল স্থির করা হয়—সেই ঘটনার প্রায় দশ বছর পরে আজাদ লিখেছিলেন, "এই দুই বিকল্পের— মিঃ এট্‌লি যা করেছিলেন অথবা লর্ড ওয়েভেল যা চেয়েছিলেন—কোন্‌টি ভারতের পক্ষে বেশী ভাল হত তা বলা মুস্কিল। যদি লর্ড ওয়েভেলের পরামর্শ মত ভারতীয় সমস্যার সমাধান আরও দু-এক বছর পেছিয়ে দেয়া হত, তবে সম্ভবতঃ লীগ তার বিরোধিতার নীতিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ত। এমনকি লীগ না বদলালেও, ভারতের মুসলিম জনসাধারণ হয়ত মুসলিম লীগের এই নেতিবাচক প্রয়াসকে প্রত্যাখ্যানই করত। ফলে হয়ত ভারত-বিভাগের ট্র্যাজেডী এড়ানো সম্ভব হতে পারত। এ বিষয়ে কেউ নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারে না, কিন্তু

একটা জাতির জীবনে এক বা দু-বছর সময় বেশী কিছু নয়। হয়ত ইতিহাসের বিচারে লর্ড ওয়েভেলের পথই বিজ্ঞতর বলে বিবেচিত হবে।"[১৫]

নেহেরু ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা দেশভাগ মেনে নিয়েছিলেন এই আশায় যে দেশভাগের ফলে সাম্প্রদায়িক হানাহানির অবসান ঘটবে। কিন্তু দেশভাগের পর দেখা গেল তার বিপরীত। সীমান্তরেখার দুই পাশে, বিশেষ করে পূর্ব-পাঞ্জাব সীমান্তরেখার ধারে, হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নেহেরু বলেছিলেন, "যখন আমরা দেশভাগের সিদ্ধান্ত নেই, তখন আমরা কেউই দেশভাগের পর নূতন সীমান্তরেখার দুধারে এই ভয়ঙ্কর খুনোখুনির কথা ভাবতেও পারি নি। বলতে গেলে এই জিনিসটা এড়ানোর জন্যেই আমরা দেশভাগে রাজী হয়েছিলাম। দেশভাগে রাজী হয়ে আমরা দুদিক থেকেই মূল্য দিয়েছি---একবার মূল্য দিয়েছি রাজনৈতিক ও আদর্শের দিক থেকে, আর দ্বিতীয়বার মূল্য দিয়েছি এই কারণে যে যা এড়াতে চেয়েছিলাম তা এড়াতে পারলাম না।"[১৬]

যদিও মুসলিম লীগ দেশভাগের দাবি ধর্মীয় ভিত্তিতে তুলেছিল এবং যদিও ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আইন পরিষদ নির্বাচনে মুসলিম আসনের অধিকাংশই মুসলিম লীগ পেয়েছিল, তাহলেও ভারতীয় মুসলমান-দের মধ্যে এই বিভেদনীতির বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী চিন্তাধারা সব সময়েই ছিল।

বিভিন্ন সময়ে বহু নেতৃস্থানীয় মুসলমান কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। যে সব মুসলমান কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন---বদরুদ্দীন তায়েবজী (১৮৮৭), মহম্মদ রহিমতোল্লা সায়ানি (১৮৯৬), নবাব সৈয়দ মহম্মদ বাহাদুর (১৯১৩), হাসান ইমাম (১৯১৮), হাকিম আজমল খান (১৯২১), মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (১৯২৩-এর দিল্লী অধিবেশনে এবং ১৯40 সালে), মৌলানা মহম্মদ আলি (১৯২৩ সালের কোকোনদ অধিবেশনে) এবং এম. এ. আনসারি (১৯২৭)।

২৬শে জানুয়ারী ১৯৫০ সালে স্বাধীন ভারতে যে নূতন সংবিধান বলবৎ হল তাতে মুসলিম ও অন্যান্য সকল ধর্মের মানুষের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়া হয়। সংবিধানে এই নীতিই ঘোষিত হল যাতে ধর্মীয় কারণে কারও ওপর অবিচার না হতে পারে।

স্বাধীন ভারতে বহু মুসলিম নেতা রাষ্ট্রের উচ্চতম পদে আসীন হয়ে-ছিলেন। ১৯৬৭ সালে ডঃ জাকীর হোসেন ভারতের রাষ্ট্রপতি হন এবং ১৯৬৮ সালে হিদায়েতুল্লা ভারতের প্রধান বিচারপতি হন। পরে ১৯৭৪ সালে ফক্‌রুদ্দীন আলী আহমেদ ভারতের রাষ্ট্রপতি হন।

স্বাধীন ভারতে বহু খ্যাতনামা মুসলিম গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। জওহরলাল নেহেরুর প্রধান মন্ত্রিত্বের কালে মৌলানা আজাদ ও রাফী আহমেদ কিদোয়াই কেন্দ্রীয় মন্ত্রসিভার যথাক্রমে শিক্ষা ও খাদ্য মন্ত্রকের দায়িত্ব বহন করেন। আজাদের সঙ্গে নেহেরুর সাহচর্য ছিল তিন দশকেরও বেশী। যদিও নেহেরু ছিলেন পাশ্চাত্য ধারার নিরীশ্বরবাদী

এবং আজাদ ধর্মপ্রাণ মুসলমান; দু'জনেই বিজ্ঞান ও আধুনিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন।

বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অন্যান্য যে-সব মুসলিম নেতা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন হুমায়ুন কবীর—আজাদের একজন বিশ্বস্ত সহকারী, পণ্ডিত ও শিক্ষাবিৎ, এবং হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম। আরও সাম্প্রতিককালে যে সমস্ত মুসলিম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন ফক্‌রুদ্দীন আলি আহমেদ খাঁন-- বর্তমানে ভারতের রাষ্ট্রপতি।

জিন্না, পাকিস্তান এবং বাঙলাদেশের অভ্যুদয়

জিন্না একদা কংগ্রেসের সদস্য এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে জিন্না মুসলিমদের জন্য পৃথক্ রাষ্ট্র স্থাপনের দাবি তোলেন। ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি প্রথম এই দ্বিজাতি-তত্ত্বের কথা বলেন 'টাইম অ্যাণ্ড টাইড' নামক এক ইংরেজী পত্রিকায়। তারপর ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে তিনি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়নে বক্তৃতাদান কালে ঘোষণা করেন, "একটা জিনিস এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে যে আমরা আর সংখ্যালঘু নই; আমরা নিজেরাই একটি পৃথক্ ও বিশিষ্ট জাতি, আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের নিজেদের।"[১]

জিন্না এক সময়ে ভারতীয় জাতীয়তা ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে বিশ্বাসী এক উদারনৈতিক রাজনীতিক ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি ধর্মভিত্তিক পৃথক্ রাষ্ট্রস্থাপনের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। এই ভূমিকা-পরিবর্তন জিন্নার জীবনের এক আশ্চর্য অধ্যায়। জিন্না রাজনীতি শুরু করেছিলেন দাদাভাই নৌরজীর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভ্য হিসেবে। পরে তাঁর গোখলের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব ঘটে। ১৯১৩ সালে মহম্মদ আলীর পরামর্শে তিনি মুসলিম লীগে যোগ দেন। কিন্তু তিনি লীগে যোগ দেন এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে যে লীগের লক্ষ্য কংগ্রেসের লক্ষ্যের থেকে খুব বেশী আলাদা নয়। ১৯১৬ সালে জিন্না লীগের সঙ্গে কংগ্রেস-এর লখনৌ-চুক্তি সম্পাদনে সাহায্য করেন। এই চুক্তির ভিত্তিতে কংগ্রেস মুসলিমদের জন্য পৃথক্ নির্বাচনীমণ্ডলী মেনে নেয়। এই সময়ে জিন্নাকে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের দূত বলেও অভিহিত করা হয়েছিল, যদিও নির্বাচনী-মণ্ডলীর এই পার্থক্য থেকেই কিছু মুসলিম নিজেদের পৃথক্ সম্প্রদায় বলে ভাবতে শেখে এবং জাতীয়তা ভুলে যেতে শুরু করে।

লখনৌ-চুক্তি সম্পাদনের সময় জিন্না একজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। জিন্না সম্বন্ধে ব্রিটিশ ভারতসচিব এডুউইন মণ্টেগুর বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য। সেই সময়কার প্রস্তাবিত সাংবিধানিক সংস্কার, যা পরে '১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কার' নামে অভিহিত হয়, সেই প্রসঙ্গে মন্টেগু বহু ভারতীয় রাজনীতিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি 'অ্যান ইণ্ডিয়ান ডায়েরী' গ্রন্থে লিখেছিলেন, "শেষে এলেন জিন্না, মাঝারি বয়েস, নিখুঁত চালচলন, সুদর্শন, কথাবার্তায় অত্যন্ত সুষ্ঠু। আমি ক্লান্ত ছিলাম, তাই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তার ব্যাপারটা আমি এড়িয়ে গেলাম। চেম্‌স-ফোর্ড তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে গিয়েছিলেন কিন্তু তাতে তিনি একেবারে পর্যুদস্ত হয়ে যান। জিন্না একজন বিশেষ বুদ্ধিমান্ লোক এবং এইরকম একজন মানুষ তাঁর দেশ-পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারছেন না এটা নিশ্চয়ই একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা নয়।"[২]

ভারতীয় রাজনীতিতে যখন নরমপন্থীদের প্রভাব বেশী ছিল তখন জিন্নার প্রভাবও যথেষ্ট ছিল। পরে যখন নরমপন্থীদের প্রভাব ক্রমে আসে

এবং কংগ্রেস যখন গান্ধীনীতি অনুসরণ করতে আরম্ভ করে তখন থেকে জিন্নার প্রভাবও কমে আসতে থাকে। গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস যখন আইন অমান্য ও অন্যান্য আন্দোলনের পথে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগোতে থাকে তখন থেকে জিন্না আর কংগ্রেসের ভেতর খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করছিলেন না।

পরে ১৯৩০ সালে মহম্মদ আলীর মৃত্যুর পর জিন্না মুসলিম লীগের নেতা হলেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস সরকার গঠন করে, কিন্তু মুসলিম লীগের সঙ্গে কোনো যৌথ সরকার করে নি। মুসলিম লীগ সরকারের বাইরেই রয়ে গেল। কংগ্রেসী প্রাদেশিক সরকারের অভিজ্ঞতা জিন্নাকে হতাশ ও তিক্ত করে তোলে। তিনি এও মনে করতে আরম্ভ করেন যে সংখ্যাগুরু শাসন মানে কংগ্রেস শাসন এবং কংগ্রেস শাসন মানেই হিন্দু শাসন। মুসলিমদের জন্য এক পৃথক্ রাষ্ট্রের কল্পনা, যা সৈয়দ আহমেদের পরবর্তী কালের রচনায় অন্তর্নিহিত ছিল, যা রহমৎ আলী আবেগের সঙ্গে প্রচার করেছিলেন, যা ১৯৩০ সালের পর থেকে ইক্‌বালের রচনা ও বক্তৃতায় কিছু পরিমাণে সমর্থন পেয়েছিল, তা ক্রমেই জিন্নাকে আকৃষ্ট করতে থাকে। ১৯৩৯ সালে কেম্‌ব্রিজ থেকে আসা কিছু ছাত্র যখন পাকিস্তানের দাবি তোলে তখন তাদের কাছে জিন্না বলেন, "আমার নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আমার ক্রমেই মনে হচ্ছে যে তোমাদের কথাই ঠিক।"

১৯৪০ সালে ২৬শে মার্চ অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশন মুসলিম লীগ এবং ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঐদিন মুসলিম লীগ সরকারীভাবে পাকিস্তানের দাবি সমর্থন করে। তাঁরা ঘোষণা করলেন যে কোন সাংবিধানিক পরিকল্পনাই এদেশে চলতে পারবে না বা মুসলিমদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না তার মূলভিত্তি হয় মুসলিম সংখ্যাধিক এলাকাগুলি, যেমন ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চল, ভৌগোলিকভাবে সন্নিহিত অঞ্চল হিসেবে (প্রয়োজনে কিছু রদবদল করে), স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সাংবিধানিক অস্তিত্ব পায়। মুসলিমদের জন্য পৃথক্ রাষ্ট্রের দাবি, যা একদা ছাত্র রহমৎ আলীর অবাস্তব কল্পনা বলে অভিহিত হয়েছিল, তাই এবার সক্রিয় রাজনীতিতে উত্থাপিত হল।

১৯৪০ সালের লীগের লাহোর অধিবেশনে জিন্না ঘোষণা করেন যে মুসলিমদের সংখ্যালঘু মনে করা একটা বিশেষ ভ্রান্ত ধারণা। তারা তা নয়, তারা জাতির যে কোন সংজ্ঞা অনুযায়ী একটি পৃথক্ জাতি।[৩] তিনি দাবি করেন যে ইসলাম ও হিন্দুধর্ম কেবলমাত্র ধর্ম নয়, তা হল দুটি বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র সামাজিক সংস্থা এবং তাই ভারতে একটি সর্বজনীন জাতি গড়ে তোলার প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। তিনি বললেন, "হিন্দু ও মুসলিমরা দুটি পৃথক্ ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক আচার এবং সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। তারা নিজেদের মধ্যে বিবাহও করে না, খাওয়া-দাওয়াও করে না; বস্তুত তারা দুটি পরস্পর-বিরোধী চিন্তা ও দুটি পৃথক্ সভ্যতার মানুষ, এবং জীবন সম্বন্ধে তাদের ধারণাও পৃথক্। এটাও পরিষ্কার যে হিন্দু ও মুসলমানরা ইতিহাসের পৃথক্ পৃথক্ উৎস থেকে অনুপ্রেরণা পায়। তাদের পুরাণ, বীরচরিত্র এবং কিংবদন্তী---এ সমস্তই ভিন্ন। প্রায়শই একদল যাকে বীর বলে শ্রদ্ধা করে, অন্যদল তাকে শত্রু বলে ভাবে; তাদের জয় ও পরাজয় পরস্পরবিরোধী।

এই রকম দুটি জাতিকে একসঙ্গে জুড়ে একটি রাষ্ট্র গড়া হলে যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের জন্ম হবে তাতে রাষ্ট্রের সংগঠন ধ্বংস হতে বাধ্য।"[৪]

জিন্নার মতে ভারতের এই সমস্যা সাম্প্রদায়িক নয়, এটা আন্তর্জাতিক সমস্যা। এবং এই সমস্যার একমাত্র সমাধান ভারতকে দুটি স্বয়ংশাসিত জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রে ভাগ করা যাতে দুটি মুখ্যজাতির জন্য পৃথক্ বাসভূমির ব্যবস্থা করা যায়। অতীতের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে জিন্না বলেছিলেন যে ইতিহাসে দেখা গেছে, ভারতীয় উপমহাদেশের চেয়েও অনেক ক্ষুদ্রতর ভূমি-খণ্ড জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ার জন্য সেখানে যতগুলি জাতি আছে ততগুলি ছোট রাষ্ট্রে ভাগ হয়ে গেছে। এই কারণেই বালকান্ অন্তরীপে সাত-আটটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে।

ভারতীয় কংগ্রেসীরা যে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন তা জিন্নার মতে 'গাণিতিক গণতন্ত্র'। তিনি দাবি করেন, ব্রিটেনে যে সংসদীয় গণতন্ত্র সফল হয়েছে তার একমাত্র কারণ ব্রিটেনে একটি মাত্র জাতিই বাস করে, কিন্তু ভারতে এক সরকার গঠনের মানেই হবে হিন্দু আধিপত্য। ব্রিটেনে সরকারের বদল হতে পারে, আজ রক্ষণশীলদের সরকার, কাল উদারপন্থী-দের, আবার পরশু শ্রমিকদলের; কিন্তু ভারতের জনসাধারণ যখন এক জাতি নয়, তখন সরকার মানে হবে হিন্দুদের চিরন্তন আধিপত্য। তিনি বলেছিলেন যে প্রায় হাজার বছরের নৈকট্য সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমানরা পৃথক্-ভাবে বসবাস করেছে এবং কেবল মাত্র ব্রিটিশ সংসদের এক আইনের বলে এবং এক অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম উপায়ে তাদের জোর করে এক জাতিতে পরিণত করা সম্ভব হবে না।[৫] তিনি বলেছিলেন, "গত আড়াই বছর প্রাদেশিক সংবিধানের কার্যক্রম আমরা দেখেছি। এই জাতীয় সরকারের যদি পুনরাবৃত্তি হয় তা হলে গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে... এবং বেসরকারী সৈন্যদল গড়ে উঠবে।"

জিন্নার মতে ভারতের ঐক্য সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিম ও কেবলমাত্র ব্রিটিশ শাসনের ফল। তাই এই ঐক্য একমাত্র ব্রিটিশ বেয়নেটের মাধ্যমেই অটুট থাকবে; আর ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলে গত এক হাজার বছরেও যা হয় নি তার চেয়েও ভয়ঙ্কর এক সংঘর্ষের ফলে ভারত টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে।[৬] এই সব উক্তি বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকের কিছু নরম-পন্থীদের কথা মনে করিয়ে দেয়, যাঁরা বলতেন যে ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করলেই ভারতীয়রা আত্মকলহে নিমগ্ন হবে এবং ব্রিটিশরা এডেন পৌঁছতে না পৌঁছতে তাদের আবার ডেকে আনতে হবে।[৭]

পাকিস্তানের চিন্তা, যা মুসলিম লীগ মাত্র ১৯৪০ সালে সমর্থন করে-ছিল, তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। জিন্না দাবি করেন যে ইতিহাসে কখনও একটি জাতি এত অল্প সময়ে এক সাধারণ আদর্শ ও কার্যক্রমের সামিল হয় নি, যা হয়েছিল ভারতের মুসলিমরা। তিনি বলেন, "Never before has a nation miscalled a minority, asserted itself so quickly and so effectively. Three years ago, Pakistan was a resolution. Today it is an article of faith, a matter of life and death with Muslim India".

শুধু পাকিস্তানের চিন্তাই এই কয় বছরে শক্তি সঞ্চয় করে নি, আরও চরমপন্থী চিন্তাও দেখা দেয়। 'দি মিনিং অফ পাকিস্তান' (১৯৪৪) গ্রন্থের লেখক এফ্. এ, দুরানী শুধু এক ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় কল্পনাকেই উড়িয়ে দিলেন না, তিনি সমগ্র ভারতের বিজয় ও মুসলিম আধিপত্যের স্বপ্নও দেখলেন। তিনি লিখেছিলেন, "আমি স্বাভাবিকভাবেই মনে করতাম যে ইসলাম ভারতকে পুনর্বিজয় করবে এবং সেটাই মুসলিম জাতির রাজনৈতিক লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমি আজও সেই কথাই মনে করি, কারণ, আমার বিশ্বাস ভারতের রাজনৈতিক মুক্তি আসবে একমাত্র ইসলামের মাধ্যমেই।"৮ এই অতি চরমপন্থী কল্পনা মুসলিম লীগও গ্রহণ করে নি।

লীগের পাকিস্তান প্রস্তাবের সমর্থনে এক দশকের মধ্যেই অবশ্য পাকিস্তানের কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হল। ১৯৪৭ সালের মধ্যেই জিন্নাকে গভর্নর-জেনারেল করে পৃথক্ পাকিস্তান রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। পাকিস্তান কল্পনার আদি উদ্গাতা রহমৎ আলি অবশ্য ১৯৪৮ সালে হতাশার মধ্যেই মৃত্যুবরণ করেন, কারণ জিন্নার প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান তাঁর কল্পনার চেয়ে অনেক ক্ষুদ্রতর ছিল।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রশ্ন উঠল যে ইসলাম ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সম্পর্ক কি হবে। পাকিস্তান সংবিধান পরিষদের সামনে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে জিন্না ঘোষণা করেছিলেন যে সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকের অধিকার সমান হবে, "You may belong to any religion, or caste, or creed—that has nothing to do with the State". যদিও পাকিস্তান গঠিত হবার পর জিন্না একথা বলেছিলেন তা হলেও পাকিস্তান যখন ধর্মীয় ভিত্তির উপরই স্থাপিত হয়েছিল তখন তার অনিবার্য ফলাফল এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং পাকিস্তানের সংবিধানে ঘোষিত হবে যে সেটা একটা 'এসলামিক প্রজাতন্ত্র' এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি সংবিধান পরিষদে একটি প্রস্তাব আনেন যাতে বলা হয় যে পাকিস্তানের সংবিধান রচিত হবে "on the basis of the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam." হিন্দু প্রতিনিধিরা যখন আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে ঐসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁরা সমান অধিকার পাবেন না, তখন মুসলিম লীগ সদস্যরা এই আশঙ্কাকে এই বলে উড়িয়ে দেন যে একমাত্র মুসলমানেরাই এই নূতন রাষ্ট্রের নেতৃত্ব করতে পারবে। লিয়াকৎ আলিরও মত ছিল তাই।

১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে লিয়াকৎ আলি গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ হারান এবং তাঁর উত্তরাধিকারী হ'ন একজন বাঙালী, নাজিমুদ্দিন। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে নাজিমুদ্দিনের প্রধানমন্ত্রিত্বে মৌল নীতি নির্ধারক কমিটি সংবিধান বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন এবং তাতে পরামর্শ দেন যে রাষ্ট্রপ্রধান হবেন একজন মুসলিম আর অনধিক পাঁচজন ইসলাম আইন অভিজ্ঞ ব্যক্তি নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধান একটি উপদেষ্টা-মণ্ডলী গঠন করবেন, যাঁরা তাঁকে আইন প্রণয়নের কালে সেগুলি ইসলাম ও সুন্নি-মতসিদ্ধ কিনা সে বিষয়ে পরামর্শ দেবেন।

১৯৫৩ সালে গভর্নর-জেনারেল গুলাম মহম্মদ প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে নাজিমুদ্দিনকে খারিজ করেন এবং অপেক্ষাকৃত অল্পপরিচিত একজন বাঙালী, বগুড়ার মহম্মদ আলিকে, সেই পদে নিয়োগ করেন। পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যেকার উত্তেজনা প্রশমনের উদ্দেশ্যে ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই প্রধানমন্ত্রী এক নূতন সূত্র উদ্ভাবন করেন। এই সূত্রে বলা হল যে ৩০০ সদস্য নিয়ে একটি নিম্ন পরিষদ গঠিত হবে যাতে পূর্ব-বঙ্গের ১৭০টি আসন বা সংখ্যাধিক্য থাকবে, কিন্তু আর একটি উপ-পরিষদও গঠিত হবে যাতে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বালুচিস্তান, ইত্যাদির সঙ্গে পূর্ববঙ্গও একটি একক হিসাবেই গণ্য হবে।

কিন্তু এই জাতীয় সংবিধান রচনা-বিষয়ে কিছু অগ্রগতি হবার আগেই পূর্ববঙ্গে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা ঘটে। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে প্রাদেশিক নির্বাচনে সেখানে শাসক মুসলিম লীগ দল ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক শ্রমিক দল ও এইচ্. এস. সুরাবর্দীর আওয়ামী লীগের এক যুক্তফ্রন্টের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। যুক্তফ্রন্ট জিতেছিল ৩০০টি আসনে, আর মুসলিম লীগ মাত্র ১০টি আসন পেয়েছিল।

পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের সম্পর্ক সুখকর ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দূরত্বে পূর্ব অংশ ছিল ১০০০ মাইলেরও বেশী এবং ভারতীয় এলাকার দ্বারা পৃথক্‌কৃত। দুই অংশের সংখ্যাধিক মানুষের ধর্ম ছিল ইসলাম, কিন্তু এ ছাড়া এই দুই অংশের আর কোন সমভাবাপন্নতা ছিল না। জাতিগতভাবে, সংস্কৃতিগত ভাবে এবং ভাষাগতভাবে এই দুই অংশ ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

পূর্ববাঙলার মানুষ, যাঁদের বাংলা ভাষার সঙ্গে সংযোগ অত্যন্ত গভীর, তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রয়াসকে অত্যন্ত আপত্তিকর মনে করতেন। পূর্ববাঙলার রাজধানী ঢাকায় ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের এক জনসভায় জিন্না উর্দু রাষ্ট্রভাষা হবে এই ঘোষণা করেছিলেন। পাকিস্তানের জনকের এই ঘোষণা জনসভায় সম্পূর্ণ নীরবতা দিয়ে সংবর্ধিত হয়; কিন্তু দু-একদিন পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জিন্না যখন এ কথার পুনরাবৃত্তি করেন তখন প্রতিবাদ শোনা যায়।

জনসংখ্যার শতকরা ৫৪ ভাগেরও বেশী বাঙালীরা স্বভাবতই উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে মেনে নিতে পারে নি। বাংলাকে জাতীয় ভাষার স্বীকৃতি দেয়ার জন্য তাঁরা ১৯৫২ সালে এক আন্দোলন শুরু করেন। এতে সক্রিয় অংশ নেন শিক্ষক ও ছাত্রসম্প্রদায়, কিন্তু সাধারণ মানুষের বিরাট্ সমর্থনও ছিল তাঁদের পেছনে। পশ্চিম পাকিস্তানীদের স্বার্থে বাঙালীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনে, সৈন্যদলে, ব্যবসায়ে ও বাণিজ্যে যে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল[১], তার ফলে শাসক মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমা হতে শুরু করে।

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ববঙ্গে নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের পর বগুড়ার মহম্মদ আলির পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করার বা তার হয়ে কথা বলার আর কোন অধিকার রইল না। এই নির্বাচনের প্রায় ছয় মাস পরে, ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে, গুলাম মহম্মদ পাকিস্তানের সংবিধান

পরিষদ ভেঙে দেন। তারপর অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে এক দ্বিতীয় সংবিধান পরিষদের সৃষ্টি করা হয় এবং সেই পরিষদ ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে প্রথম সম্মিলিত হয়। সেই পরিষদে ৩৫ জন সদস্য-বিশিষ্ট মুসলিম লীগই সর্বাধিক সদস্যের গোষ্ঠী হয়।

১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসে মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা রোগ-গ্রস্ত গুলাম মহম্মদের কাছ থেকে ক্ষমতা হস্তগত করেছিলেন। তার কয়েক মাস পরে সংবিধান পরিষদ পাকিস্তানের জন্য একটি ঐসলামিক প্রজাতন্ত্রের সংবিধান গ্রহণ করে। এই সংবিধানের 'নীতিনির্দেশক পরিচ্ছেদে' 'মুসলিম ঐক্য ও ইসলামনীতি' সম্প্রসারণের কথা বলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে লক্ষ্য হচ্ছে "to enable Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the Holy Koran and Sunna." ঘোষণা করা হয়েছিল যে রাষ্ট্রপতি হবেন একজন মুসলিম, এবং বলা হয়েছিল যেন রাষ্ট্রপতি একটি ঐসলামিক সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলেন এবং এমন একটি কমিশন নিয়োগ করেন যাঁরা ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী চালু আইনগুলিকে ঢেলে সাজানোর পরামর্শ দিতে পারবেন। সংবিধানে এক কক্ষের একটি ৩০০ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদ গড়ে তোলার ব্যবস্থাও ছিল এবং তাতে দুই অংশ থেকে সমানসংখ্যক সদস্য আসার প্রস্তাব ছিল।

১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বরে সুরাবর্দী প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হয়ে সুরাবর্দী পূর্ব পাকিস্তানে যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী করার ও পশ্চিম পাকিস্তানে পৃথক্ নির্বাচকমণ্ডলী রাখার জন্য একটি প্রস্তাব নিয়ে আসেন। পূর্ব-পশ্চিম সমস্যার এই আপোষ মীমাংসা প্রথমে সংবিধান পরিষদে গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু পরে পশ্চিম অংশেও যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী নিয়ে আসার এক সংশোধনী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে পূর্ববঙ্গের আইন সভা সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাবে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয় ও মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত সমস্ত বিষয়ে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য দাবি করে। পশ্চিম পাকিস্তানেও আঞ্চলিক দলগুলি এই সময়ে শক্তি সংগ্রহ করছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে খানসাহেব পশ্চিম পাকিস্তানের একক অঞ্চল ভেঙে চারটি প্রদেশ সৃষ্টির প্রস্তাব করেন। সুরাবর্দী এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। এর অল্পকাল পরই সুরাবর্দী পদত্যাগ করেন অথবা বরখাস্ত হন, এবং আওয়ামী লীগ ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের একটি বড় অংশের সমর্থনে ফিরোজ খান নূন প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হন।

ফিরোজ খান নূনের সরকার খুব অল্পস্থায়ীই হয়েছিল, কারণ ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে ইস্কান্দার মীর্জা সামরিক আইন জারি করে সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে দেন। ইস্কান্দার মীর্জা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলিকে বাতিল করে দেন, সংবিধান খারিজ করেন এবং জেনারেল আয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইনের প্রশাসক নিয়োগ করেন। এর একমাস পরে আয়ুব খান বলপূর্বক রাষ্ট্রপতির আসন দখল করেন এবং ইস্কান্দার মীর্জাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন।

আয়ুব সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রপতির শাসনের পক্ষপাতী। ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে আয়ুব যে সংবিধান চালু করেছিলেন তাতে রাষ্ট্রপতির অধীনে একটি সর্বশক্তিমান কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। আগের মতো এতেও বলা হয়েছিল যে রাষ্ট্রপতি হবেন একজন মুসলিম। এই সংবিধানের উপক্রমণিকায় লেখা হয় যে মুসলিমদের ইসলামের শিক্ষামত বাঁচতে দিতে হবে। আয়ুব ঘোষণা করেছিলেন যে পাকিস্তান চায় বস্তুগত প্রগতি 'ঐসলামিক আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যের ছত্রচ্ছায়ায়'। এই সংবিধানে রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত এক উপদেষ্টা-মণ্ডলীর ব্যবস্থা ছিল যার কাজ হবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় প্রস্তাবিত আইনের ঐসলামিক যাথার্থ্য বিশ্লেষণ করে দেয়া। এতে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত আর এক 'ঐসলামিক গবেষণা পরিষদ' গঠনের ব্যবস্থা ছিল যাঁরা 'সত্যকার ঐসলামিক ভিত্তিতে মুসলিম সমাজের পুনর্গঠনে' সহায়তা করবেন। সংবিধানে উর্দু এবং ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃত বাংলাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে সমমর্যাদা দেয়া হয়। আর ঠিক হয় যে পাকিস্তানের আইন সভা বসবে ঢাকায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের স্থান হবে ইসলামাবাদে।

১৯৬২ সালের জুলাই মাসে আবার পাকিস্তানে রাজনৈতিক দলগুলিকে সক্রিয় হবার অনুমতি দেয়া হয়। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে পাকিস্তানে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন হয়। আয়ুবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন কুমারী ফাতিমা জিন্না—পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাতার ভগ্নী। আয়ুব পশ্চিম পাকিস্তানের শতকরা ৭২·৬ ভাগ এবং পূর্ব পাকিস্তানের ৫৩·১ ভাগ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন।

পূর্ব পাকিস্তানে কিন্তু আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগল। মুজিবুর রহমান এই দলের নেতৃত্ব দিলেন। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মুজিবুর রহমান তাঁর বিখ্যাত ছয় দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করলেন। এতে দাবি করা হল যে পাকিস্তানে সংসদীয় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গড়া হোক, নির্বাচনের ভিত্তি হোক সমগ্র প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, আর কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় রেখে অন্য সব ক্ষমতা অঙ্গরাজ্য-গুলিকে দেয়া হোক। এর অব্যবহিত পরেই এপ্রিল মাসে মুজিবুরকে কারারুদ্ধ করা হল। কিছুদিন পরে তাঁকে মুক্তি দেয়া হল, কিন্তু আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করা হয়।

১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানে আয়ুব-শাসনের বিরুদ্ধে এক গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে এক সাধারণ ধর্মঘটে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান অচল হয়ে যায়। আয়ুব ঢাকায় যান কিন্তু তাঁকে কৃষ্ণপতাকা দেখানো হয়। তাঁর বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ দেখে ১৯৬৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে আয়ুব অবসর-গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। ঠিক তার পরদিন মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য বহু বন্দীর মুক্তি দেয়া হয়। ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ আয়ুব পদত্যাগ করেন আর সামরিক-প্রধান এহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। পাকিস্তানে আবার সামরিক শাসন জারি হয় এবং প্রাদেশিক আইন সভাগুলিকে ভেঙে দেয়া হয়।

১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে এহিয়া খান ঘোষণা করেন যে সকল

প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন হবে। ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাসে কম্যুনিস্ট দল ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলের উপর থেকে সর্বপ্রকার নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হল। ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে পশ্চিম পাকিস্তানের একক অঞ্চল ভেঙে পূর্বতন চারটি প্রদেশে ভাগ করে দেয়া হয়।

১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানে ঝঞ্ঝা ও সাংঘাতিক বন্যা ঘটে এবং তাতে আনুমানিক ১০,০০,০০০-এরও বেশী মানুষ প্রাণ হারায়। বন্যাপীড়িতদের ত্রাণকার্যে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা বিশেষ কিছুই করলেন না, আর এর প্রতিক্রিয়া প্রকট হয়ে পড়ল কয়েক মাস পরে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলে।

পাকিস্তানের ইতিহাসে এই প্রথম সকল প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রচণ্ডভাবে জয়ী হল। প্রাদেশিক আইনসভায় লীগ পেল শতকরা ৭২.৫ ভাগ ভোট এবং ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি, আর জাতীয় আইনসভায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সংরক্ষিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি। পূর্ব ও পশ্চিম অংশের আসন মিলিয়ে দেখলেও আওয়ামী লীগের সংখ্যাধিক্য ছিল সম্পূর্ণ, কারণ পাকিস্তান জাতীয় আইনসভার মোট আসনসংখ্যা ছিল ৩১৩টি। নির্বাচনের ফলাফল এমন হয়েছিল যে প্রথমে এহিয়া খান ঘোষণাও করেছিলেন যে মুজিবুর রহমানই হবেন পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী।

মুজিবের দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল ছয় দফা কার্যসূচী ধরে -- যার সারকথা ছিল অধিকতর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। আওয়ামী লীগ বহু বছর ধরে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করছিল। গোড়ার দিকে পাকিস্তানের শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষাকেও অবদমিত করতে চেয়েছিল---এবং কেবলমাত্র উর্দুকেই জাতীয় ভাষা বলে স্বীকার করেছিল। পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষার মর্যাদা রাখার লড়াইয়ে ১৯৫০-এর দশকে বাঙালীরা অনেক রক্ত দিয়েছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানীদের যে আধিপত্য ছিল তা শুধু সংস্কৃতিরই নয়, তা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকও ছিল। সরকার, প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীর বেশীর ভাগ গুরুত্বপূর্ণ পদই পশ্চিম পাকিস্তানীরা দখল করে নিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের ব্যবসায়-বাণিজ্যেরও বেশীর ভাগই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে। সরকারের উন্নয়নমূলক ব্যয়ের ব্যাপারেও পূর্ব পাকিস্তান বঞ্চিত হচ্ছিল, কারণ যদিও পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৪ ভাগ ছিল পূর্ব পাকিস্তানে, তবু তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল উন্নয়ন খাতে ব্যয়ের মাত্র ২০ শতাংশ ১৯৫০--৫১ সালে এবং ১৯৬৯--৭০ সালে তা বেড়ে হয়েছিল মাত্র ৩৬ শতাংশ।[১০]

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী জয় ইস্‌লামাবাদের সামরিক শাসককুল ও পশ্চিম পাকিস্তানের 'পিপল্‌স্ পার্টি'-র নেতাদের, যাঁদের নীতির ভিত্তিই ছিল ভারত-বিদ্বেষ, তাঁদের সন্ত্রস্ত করে তোলে। এটা তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে আওয়ামী লীগ যদি ইস্‌লামবাদে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায়

আসে, তাহলে ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে আসবে। এ ছাড়া তাদের এটাও বুঝতে দেরী হল না যে মুজিবুর রহমান যে রকম ভোটাধিক্য পেয়েছিলেন তাতে তাঁর পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার গড়তে হলে অন্য কোনো দলের ওপর নির্ভর করতে হবে না এবং তার মানেই হল পাকিস্তানে সামরিক শাসনের দিন শেষ হয়ে যাবে।

পাকিস্তানের সামরিক শাসকেরা ভাবল, যদি তাদের ক্ষমতাসীন থাকতে হয় তবে পূর্ব পাকিস্তানের এই গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন ও জাতীয়তার দাবীকে প্রতিরোধ করা ছাড়া আর উপায় নেই। এই পরিস্থিতিতে এহিয়া খান একই সঙ্গে অবদমনের নীতি চালু করলেন এবং আওয়ামী লীগের মুজিবুর রহমান আর পিপল্‌স্ পার্টির ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনার জন্য তিনি ঢাকাও গিয়েছিলেন।

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি এহিয়া খান ঘোষণা করেছিলেন যে পাকিস্তানের জাতীয় আইনসভার অধিবেশন বসবে ঢাকায় ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ। কিন্তু তার কিছু পরেই ভুট্টো আপত্তি করেছেন, এই কারণ দেখিয়ে তিনি এই অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের মত পেছিয়ে দিলেন। ক্ষমতা হস্তান্তর ও সংবিধান গঠনের জন্য জাতীয় আইনসভার অধিবেশন ডাকার দাবিকে প্রত্যাখ্যান করায় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ অধৈর্য হয়ে উঠে-ছিলেন এবং স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ ও মিছিলে তাদের মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। এই বিক্ষোভকারীদের ওপর সামরিক বাহিনী ১লা ও ৩রা মার্চে আক্রমণ চালায় ও বহুজনকে হত্যা করে। এই বিক্ষোভ-আন্দোলনে জনসাধারণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব একতা দেখা গিয়েছিল। এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন শুধুমাত্র রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় যারা তারাই নয়, এমনকি প্রধান বিচারপতিও---যিনি সামরিক প্রশাসককে শপথ দিতে অস্বীকার করেছিলেন, সামরিক বাহিনীর বাঙালীরা---যারা বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করতে অস্বীকার করেছিলেন, আর তা ছাড়া শ্রমিক, কৃষক এবং প্রায় প্রত্যেক মানুষ।

মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলাকালীনই ১৯৭১সালের ২৫শে মার্চ হঠাৎ এহিয়া খান ঢাকা পরিত্যাগ করলেন এবং মুজিবুর রহমানকে বিশ্বাসঘাতক ঘোষণা করে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করে দিলেন। তৎক্ষণাৎ সামরিক বাহিনী যে সব জায়গায় প্রতিরোধ হচ্ছিল সে-সব জায়গায় ঢুকে অত্যাচার শুরু করে দেয়। আওয়ামী লীগের সমর্থকদের, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের, খুঁজে বের করে হত্যা করে এবং বহু গ্রাম ধ্বংস করে।[১১]

সামরিক শাসকেরা মুজিবুর রহমানকে কারারুদ্ধ করে। কিন্তু মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগের অনুগামীরা পূর্ব পাকিস্তানকে 'বাঙলা দেশ' নামকরণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে। ভারতের সীমান্তরেখার অনতিদূরে 'মুজিবনগরে' এই স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

জিন্না বলেছিলেন যে সহস্র মাইলের ব্যবধান সত্ত্বেও ইসলামের ভিত্তিতে পাকিস্তানের দুই অংশের গ্রন্থি রচনা করা সম্ভব হবে। কিন্তু পূর্ব

পাকিস্তানের সংখ্যাধিক লোক যদিও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাধিক লোকের মতই ছিল মুসলিম, তবু, এবং তা সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানের লোকদের পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের বিরুদ্ধে প্রশাসনে, নৌবাহিনীতে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে এবং অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারে বৈষম্যমূলক আচরণ করতে নিরস্ত করে নি। তাই, ১৯৭১ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ প্রচণ্ডভাবে পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে ও মুজিবুর রহমানের পক্ষে রায় দিয়েছিল।

পূর্ববাঙলায় গণহত্যার জন্য এক কোটিরও বেশী মানষ ভারতে এসে আশ্রয় নেয়। ভারত পৃথিবীর অন্য সব রাষ্ট্রের কাছে এই বলে আবেদন করে যেন তারা ইসলামাবাদ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে যাতে কোন রাজনৈতিক সমাধানে তাঁরা আসেন, যার ফলে শরণার্থীরা আবার পূর্ববাংলায় ফিরে যেতে পারে। এহিয়া খান কিন্তু এই আবেদনকে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলে অভিযোগ তুললেন। এই ব্যাপারে তাঁকে সমর্থন করেছিল চীন।

এই সময়ে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। প্রেসিডেন্ট নিক্সন তাঁর ব্যক্তিগত দূত কিসিংগারকে পাকিস্তান হয়ে এক গোপন দৌত্যকর্মে চীনে পাঠান। এই দৌত্যের ফলে চীন নিক্সনকে চীন ভ্রমণে আমন্ত্রণ জানায় এবং তা নিক্সন সাগ্রহে গ্রহণ করেন। এই সমস্তের ফলে পাকিস্তানের দুই সহানুভূতিশীল রাষ্ট্র, যথা চীন ও আমেরিকার মধ্যে সম্পর্কের এক নতন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে ভারত ও সোবিয়েত রাশিয়ার মধ্যে শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহায়তার একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে বলা হয়েছিল যে স্বাক্ষরকারী দেশদুটির বিরুদ্ধে আক্রমণ বা আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিলে পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করে কর্তব্য ঠিক করা হবে। এই চুক্তিটি কোনো সামরিক জোটভুক্তির চুক্তি নয়; ইতিপূর্বে সোবিয়েত রাশিয়া যুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিলেন এটা সেই ধরনেরই। চুক্তিতে বিশেষ করে উল্লেখ করাও হয়েছিল যে সোবিয়েত রাশিয়া ভারতের নিরপেক্ষতার নীতিকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু যদিও চুক্তিটি সামরিক জোটভুক্তির চুক্তি নয়, তবুও এই চুক্তির সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল।

বাঙলাদেশে এই সময়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামী মুক্তিবাহিনীর লড়াই খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এই মুক্তিবাহিনীর শক্তি যখন বাড়ছে তখন পূর্ববঙ্গ থেকে বিশ্বের দৃষ্টি সরিয়ে ফেলার জন্য পাকিস্তানী শাসকরা ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হল। এই জাতীয় একটা সংঘর্ষ বাধিয়ে তোলার জন্য ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাস থেকে পাকিস্তান ভারতের সীমান্ত ঘাঁটিগুলির ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করে। ১৯৭১ সালের ১২ই অক্টোবর এহিয়া খাঁন জাতির প্রতি বেতারভাষণে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন এই কথাও বলেন।

২৩শে নভেম্বরে পাকিস্তানের সামরিক শাসকগণ আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করেন। এই দিনই এহিয়া খান এ কথাও বলেন যে আগামী দশদিনের মধ্যে তিনি আর রাওয়ালপিণ্ডিতে থাকবেন না, যুদ্ধক্ষেত্রে যাবেন।

১৯৭৮ সালের ৩রা ডিসেম্বর যুদ্ধ ঘোষণা না করেই পাকিস্তানী

বোমারুবাহিনী ভারতের অমৃতসর, পাঠানকোট, শ্রীনগর, অবন্তীপর, উত্তরাশি, যোধপুর, আম্বালা ও আগ্রা বিমানবন্দরে আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানী পদাতিক বাহিনীও ভারতের সুলাইমারিকি, খেমকরণ, পুঞ্চ ও অন্যান্য এলাকার প্রতিরক্ষা-ঘাঁটির ওপর আক্রমণ করে। এর অব্যবহিত পরে এক মধ্যরাত্রি বেতারভাষণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ শুরু করে বাঙলাদেশের যুদ্ধকে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে পরিণত করে তুলতে চাইছে এবং এই অবস্থায় তিনি ভারতে আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করেন।[১২] ১৯৭১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর পাকিস্তান সরকারীভাবেই ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে।

পাকিস্তানের যুদ্ধঘোষণার দুই দিন পরে ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর ভারত বাঙলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ভারতীয় সংসদে এই স্বীকৃতি ঘোষণা-কালে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ না করার প্রতিবাদে মুজিবুর রহমান এবং তাঁর দল সরকারের বিরুদ্ধে এক অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন আরম্ভ করে, কিন্তু পাকিস্তানী শাসকেরা এই আন্দোলন অবদমনের জন্য যখন অত্যাচার শুরু করে তখন বাঙলা-দেশের জনসাধারণের স্বাধীনতা ঘোষণা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। 'ঈস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্" এবং "ঈস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট" মুক্তি-ফৌজে রূপান্তরিত হয়। মুক্তিফৌজই পরে মুক্তিবাহিনীতে পরিণত হয়। জেফারসনের সেই বিখ্যাত উক্তি উদ্ধৃত করে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে বাঙলাদেশের সরকারকে সমর্থন করছে 'the will of the nation, substantially expressed.'[১৩]

ভারতের সঙ্গে এই যুদ্ধে পাকিস্তান পরাজিত হয়। বস্তুত মাত্র বারো দিনেই পূর্ববঙ্গ মুক্ত হয়ে যায়। পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানী ফৌজ স্থানীয় জন-সাধারণের কোন সমর্থন না পেয়ে, ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ-শক্তির কাছে অভিভূত হয়ে পড়ে এবং ১৯৭১ সালের ১৬ই নভেম্বর বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করে। তার পরেই ভারত একতরফাভাবে পশ্চিম সীমান্তেও ১৭ই ডিসেম্বর রাত আটটা থেকে যুদ্ধবিরতি করবে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। পাকিস্তানের পক্ষে এই যুদ্ধবিরতি স্বীকার করে নেয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না এবং এর ফলে যুদ্ধেরও অবসান হয়।

বাঙলাদেশের মুক্ত সরকার ঘোষণা করে যে বাঙলাদেশ একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হবে এবং সমাজবাদ ও জোটনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করবে। বাঙলাদেশের এই স্বাধীন সরকার ভারতে অবস্থিত সকল শরণার্থীকে ফিরিয়ে নিতে এবং তাদের নিজেদের সম্পত্তি তাদের হাতে প্রত্যর্পণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সরকার মুসলিম লীগ সমেত সমস্ত ধর্মীয় দলকেও নিষিদ্ধ করে দেয়। এই সরকারের নেতৃবৃন্দ জানান যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তারা ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটতে দেবে না। বাঙলা-দেশের অভ্যুদয় প্রমাণ করে যে শুধ্মাত্র ধর্মীয় ভিত্তির উপর কোন জাতি গড়ে উঠতে পারে না। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের স্রষ্টা জিন্নার দ্বিজাতি-তত্ত্বের অসারতা প্রমাণিত হয়।

অর্থনৈতিক পটভূমিকা

আধুনিক শিল্প-কারখানার উত্থান

ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতে আধুনিক যানবাহন প্রচলন করার পূর্ব পর্যন্ত ভারতে কৃষিভিত্তিক গ্রামগুলি অনেকাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষ-আবাদই ভারতের গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য ছিল। কৃষি উৎপাদনের জন্য বৃহৎ খামার ছিল না। লাঙ্গল এবং বলদ-জোতা গাড়ীই ছিল কৃষির প্রতীক, যেমন চরকা ছিল শিল্পের। সহজ সরল হস্তচালিত যন্ত্রপাতির দ্বারাই শিল্পের প্রয়োজন মিটে যেত।

জমির উৎপাদনের একটা অংশ জমিদার বা হিন্দু রাজা বা দিল্লীর সম্রাটের কাছে সেলামী বা কর হিসেবে চলে যেত, বাকী অংশ গ্রামের মানুষ নিজেদের জন্যই ব্যবহার করত। এই গ্রামগুলি যা উৎপাদন করত তা বাইরের বাজারে বিক্রি করার জন্য নয়। এই উৎপাদন করা হত প্রধানত নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য।

ভারতের গ্রামগুলি তাদের নিজস্ব যা প্রয়োজন তার প্রায় সবকিছুই নিজেরাই উৎপাদন করত। এই গ্রামগুলির অভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রায় বাইরের নিয়ন্ত্রণ খুব কমই ছিল। এই গ্রামীণ সংস্থাগুলির নিজস্ব এমন ক্ষমতা ছিল যার দ্বারা কেন্দ্রীয় পরিবর্তনের ঢেউ তাদের জীবনযাত্রায় বিশেষ ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারত না, এবং ব্রিটিশদের আধিপত্য বিস্তারের পূর্ব সময় এরা এদের স্বকীয়তা অনেকাংশে বজায় রাখতে পেরেছিল।

এই সমস্ত গ্রামে প্রতিযোগিতা অপেক্ষা সহযোগিতার মনোবৃত্তি বেশী গড়ে উঠত এবং ব্যক্তিবিশেষের অধিকারের চেয়ে গোষ্ঠীগত দায়িত্বের বা কর্তব্যের ওপরই বেশী জোর দেওয়া হত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রাচীন ভারতের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভিত্তি ছিল না। বরঞ্চ, ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল পরিবারের, বর্ণের এবং গ্রামের এক অংশ হিসেবে—নিজস্ব স্বকীয়তার ভিত্তিতে নয়। আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পরিবার বা বর্ণগত গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত হত তার নিজস্ব রীতি, নীতি ও ধর্মীয় অনুশাসন এবং আচারের দ্বারা, কোনো রাষ্ট্র বা ধর্মনিরপেক্ষ আইন দ্বারা নয়।

ভারত চিরকালই ছিল গ্রামভিত্তিক। শহরের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। কিছু-কিছু শহরের রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল সরকারী কাজকর্মের কেন্দ্র হিসেবে, কিছু-কিছু ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে, আর অবশিষ্টাংশ ধর্মীয় পীঠস্থান হিসেবে, যেমন বারাণসী অথবা পুরী। কিন্তু ভারতের হৃদয় নিহিত ছিল গ্রামের মধ্যেই এবং এই প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলি বর্তমান শিল্পসভ্যতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রসারের পথে খুব সহায়ক ছিল না। ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যবাদী ও বুর্জোয়া সম্প্রদায় ভারতকে আধুনিক শিল্পকলার সঙ্গে পরিচিত করায় এবং গ্রামের সেই স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে দেয়। ব্রিটিশ শাসক ও ব্যবসায়ীরা যানবাহনের এবং যোগাযোগের নূতন ব্যবস্থা স্থাপন করে এবং আধুনিক শিল্পকলা প্রতিষ্ঠা করে ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে

এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। ভারতের প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি বিশেষভাবে পরিবর্তিত হল ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে।

ব্রিটিশরা ভারতে কৃষি-ব্যবস্থার এক আমূল পরিবর্তন ঘটায়। লর্ড কর্নওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার প্রচলন করলেন বাঙলা, বিহার এবং উড়িষ্যায় ১৭৯৩ সালে; আগে যারা কর আদায় করত---কিন্তু জমির উপর যাদের কোন স্বত্ব ছিল না---তাদের জমির অধিকারী বলে নির্দিষ্ট করা হল। দেশের অন্য কতগুলি অংশে টমাস মনরো রাওয়াতারি প্রথার প্রচলন করে কৃষকদের জমির মালিকানা ভোগ করতে দিলেন। ইংরেজদের আনা নূতন জমিদারী-প্রথার প্রচলনের পর পুরাতন গ্রাম্য গোষ্ঠী বিলুপ্ত হতে লাগল এবং আধুনিক জোতদার এবং জমিদারের সৃষ্টি হল।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে যখন মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙন ধরেছিল তখন ভারতে এক নূতন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উত্থান হচ্ছিল।[1] নগরভিত্তিক বাণিজ্যকেন্দ্র ক্রমেই স্থাপিত হচ্ছিল এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় পণ্যবিনিময় এবং বন্টনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করছিল। আর নগরের বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি ক্রমেই গ্রামের কারিগরদের আকৃষ্ট করছিল। কিন্তু এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নিজেদের সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার পূর্বেই ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শাসন শাসনতান্ত্রিক একতাবদ্ধতা নিয়ে আসে এবং ভারতে শিল্পকেন্দ্রিক অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপনে সহায়ক হয়।

ইংরেজদের আগেও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে নানা জাতি ভারতে এসে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। আরব, তুর্কী, পাঠান, মোগল -- একের পর এক ভারতে এসেছে। কালক্রমে তারা ভারতের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে মিশে গেছে। কিন্তু ব্রিটিশরা ভারতে একটি সম্পূর্ণ পৃথক অর্থনৈতিক পদ্ধতি নিয়ে এসেছিল। ভারতে আগমনের পূর্বে ব্রিটিশরা তাদের নিজেদের দেশে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করেছিল এবং আধুনিক শিল্পাশ্রিত রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল। এই একতাবদ্ধ শিল্পাশ্রিত ব্রিটিশই ভারত জয় করেছিল। আর ব্রিটিশদের এই জয়ের ফলশ্রুতি হল ভারতের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার এবং গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণতার বিলুপ্তি।

ব্রিটিশ কর্তৃক ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি ভারতে রেলপথের স্থাপনা এবং প্রসারের সাথেসাথেই কৃষিকার্য বাণিজ্যিক রূপ নিল এবং সেটা আধুনিক শিল্পের ক্রম-বিকাশের সহায়ক হয়ে দাঁড়াল। লর্ড ডালহৌসী তার বিখ্যাত 'মিনিট অন রেলওয়েজ'-এ ভারতে রেলপথ-স্থাপনের সুবিধার সম্বন্ধে বলেছিলেন, "ইংল্যাণ্ডে তুলার প্রচণ্ড প্রয়োজন, আর ভারতে তা এখনই কিছু পরিমাণে উৎপন্ন হচ্ছে। যদি জাহাজে রপ্তানি করার উপযোগী বন্দরগুলিতে সে তুলা সুদূর সমতল থেকে নিয়ে আসার ভাল বন্দোবস্ত করা যায়, তা হলে ভারতে প্রচুর তুলার উৎপাদন লাভজনক হবে। আমরা এও দেখেছি যে বাণিজ্যের অধিকতর সুযোগ পেলেই ইউরোপে উৎপন্ন পণ্য-দ্রব্যের চাহিদা ভারতের সর্বত্র বেড়ে যাবে। পৃথিবীর এই প্রান্তে এইভাবে যে নূতন বাজার গড়ে উঠবে তার সমস্ত সম্ভাবনা খুব দূরদর্শী লোকের পক্ষেও সঠিক করে ভাবা সম্ভব নয়।"

রেলপথ-ব্যবস্থাই ভারতের আধুনিক শিল্পায়নের পথিকৃৎ। ঊনবিংশ

শতকের মাঝামাঝি ব্রিটিশরা ভারতে বাণিজ্যিক শস্যের চাষ প্রবর্তন করে, যেমন, নীল, চা, কফি। ক্রমে ক্রমে তুলা এবং পাট চাষের উন্নতিও হতে থাকে।

কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু পর্যন্ত কেবলমাত্র রেলপথ সারানোর জন্য ছোটখাট ও সামান্য লৌহশিল্পের প্রতিষ্ঠা ছাড়া কোন ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প ভারতে গড়ে ওঠে নি। ব্রিটেন যে অবাধ বাণিজ্যনীতি (Laissez faire) অনুসরণ করত সেটা তাদের নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থের সহায়ক ছিল, কিন্তু তা ভারতের শিল্পবাণিজ্য উন্নয়নের বিরাট বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। ব্রিটিশ সম্রাটের সরাসরি শাসনভার গ্রহণের সময় থেকে ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত ভারতের শিল্পক্ষেত্রে অবাধ নীতি চালু ছিল। এটা অবশ্যম্ভাবী বলে ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে ভারত কেবলমাত্র কৃষিপ্রধান হয়ে থাকবে, আর ব্রিটিশ সরকার চায় নি যাতে ভারতে কার্পাস বা অন্যান্য শিল্প গড়ে ওঠে, কারণ তাদের ভয় ছিল এই জাতীয় শিল্প ব্রিটেনের শিল্পগুলির প্রতিযোগী হয়ে উঠতে পারে।[২]

বিংশ শতকের প্রথমার্ধে মাদ্রাজ সরকার শিল্পোন্নয়নের জন্য সামান্য কিছু ব্যবস্থা নেয়। মাদ্রাজ সরকারের শিল্পোন্নয়নের এই প্রচেষ্টাকে স্থানীয় ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠী বিরোধিতা করে এবং বলে যে এই প্রচেষ্টার দ্বারা সরকার তার আওতার বাইরে এক অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ করেছে।[৩] ব্রিটিশ উদারনৈতিক দার্শনিক এবং ভারতসচিব মর্লেও এই কথাই ভাবতেন। ১৯১০ সালের ২৯শে জুলাই এক স্মারকলিপিতে তিনি বলেছিলেন যে যদিও প্রাগ্রসর ইউরোপীয় দেশগুলির বৈজ্ঞানিক উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে ভারতীয়দের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য কিছু পরিমাণ সরকারী অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে, কিন্তু অবাধ বাণিজ্যনীতির ব্যতিক্রম করে শিল্পোন্নয়নে সরকারের অংশগ্রহণ করা ঠিক নয়।[৪] এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে হার্ডিঞ্জ মিন্টোর পর ভারতের ভাইসরয় হতে সম্মত হবেন কি-না এই বিষয় যখন মর্লে হার্ডিঞ্জের সাথে আলোচনা করেন তখন তিনি তাঁকে একটিমাত্র প্রশ্নই করেছিলেন যে হার্ডিঞ্জ অবাধ বাণিজ্যনীতিতে বিশ্বাসী কি-না। হার্ডিঞ্জ সম্মতিসূচক উত্তর দিয়েছিলেন এবং ভাইসরয়ও নিযুক্ত হয়েছিলেন।[৫]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতের শিল্পগত দুর্বলতা প্রকট হয়ে পড়ে এবং এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে যদি এই অবাধ বাণিজ্যনীতি পরিহার না করা হয় তবে এই দুর্বলতা দূর করার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। ১৯১৫ সালে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ বলেছিলেন, বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতকে শিল্পায়িত দেশ করে তোলার জন্য এক নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করতে হবে, আর তা না করলে ভারত বিদেশী পণ্যের গুদাম-ঘরে পরিণত হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যে শিল্প-কমিশন বসানো হয়েছিল তা সুপারিশ করল যে ভারতের শিল্পোন্নয়নের জন্য সরকারকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। এই নূতন নীতিকে ভারতীয় রাজনীতিবিদ্‌রা অভিনন্দন জানান, কেননা বহুদিন পূর্ব হতেই তাঁরা দেশীয় শিল্পগুলির জন্য সরকারী সাহায্য এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থার দাবি করে আসছিলেন। ভারতীয় রাজনীতিবিদ্‌রা প্রায়ই বলতেন

যে সরকারী সাহায্য এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফলেই জার্মানী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্রুত শিল্পায়ন সম্ভব হয়েছিল,[৬] এমনকি অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার মতো ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতেও শিল্প-সংরক্ষণের জন্য শুল্ক বসানো হয়েছিল। ব্রিটেনেও অবাধ বাণিজ্যনীতিতে বিশ্বাস ক্ষীয়মাণ হয়ে যাচ্ছিল কারণ চেম্বারলেন সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ পণ্যকে অগ্রাধিকার দিতে চেয়েছিলেন এবং ব্যালফুর শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রতিশোধমূলক কর-নীতির প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন।[৭] উপরন্তু, জাপান পাশ্চাত্যের সমতুল্য শিল্প সাফল্য অর্জন করতে পেরেছিল রাষ্ট্রের সাহায্য এবং সংরক্ষণের ফলে। এই সমস্ত দেখে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের স্থির বিশ্বাস হয়েছিল যে শিল্পকে বাঁচাতে গেলে রাষ্ট্রের সাহায্য এবং সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন।[৮]

১৯১৮ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার-প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা মেটাতে গেলে শিল্পোন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রের এক অগ্রগামী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এই প্রস্তাবে এটাও বলা হয় যে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থেও ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ প্রকৃষ্টতরভাবে ব্যবহার করতে হবে।[৯] উপরন্তু, এই প্রস্তাবে একথাও স্বীকার করা হয়েছিল যে অবাধ বাণিজ্যনীতির পৃষ্ঠপোষক ভারতে প্রায় আর কেউ ছিলই না।[১০]

ভারতীয় ফিসক্যাল বা রাজস্ব কমিশনের সুপারিশ, যে পার্থক্যমূলক সংরক্ষণ নীতি (Discriminating Protection) চালু করা উচিত, তা ভারত সরকার ১৯২৩ সালে গ্রহণ করে[১১] এবং একটি ট্যারিফ বোর্ডও সৃষ্টি করে। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কতগুলি শিল্প, যেমন লৌহ, ইস্পাত, কার্পাস, শর্করা, কাগজ ইত্যাদি সংরক্ষণ নীতির আওতায় নিয়ে আসা হয়। এই সংরক্ষণ নীতির সহায়তায় এই শিল্পগুলি গড়ে ওঠে এবং এর ফলে ১৯৪১ সালে লৌহ-শিল্প থেকে, ১৯৪৭ সালে কার্পাস-শিল্প থেকে এবং ১৯৫০ সালে শর্করা-শিল্প থেকে, সংরক্ষণ নীতি তুলে নেওয়া সম্ভবপর হয়।

এই সংরক্ষণ নীতি কার্যক্ষেত্রে খুব সুচিন্তিতভাবে প্রয়োগ করা হয় নি। বস্তুত, ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় শিল্পের ওপর যে সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগ করা হয়েছিল তা ছিল কিছুটা দায়সারা গোছের।[১২] কারণ ভারতের আধুনিক শিল্পায়ন প্রয়াসে ব্রিটিশ সরকারের আন্তরিকতা ছিল না। উপরন্তু ১৯২৭ সালের পর থেকে ভারতীয় শুল্ক-ব্যবস্থা ইম্পিরিয়্যাল প্রেফারেন্স নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়, যার ফলে ব্রিটিশ পণ্য ভারতীয় বাজারেও ভারতীয় পণ্যের ওপর অগ্রাধিকার পায়।[১৩]

পার্থক্যমূলক সংরক্ষণ নীতির ফলে ভারতীয় শিল্পের কিছুটা উন্নয়ন ঘটে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পায়নের চেহারা এই ছিল যে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের যদিও কিছুটা সুরাহা হয়েছিল, যন্ত্রপাতি নির্মাণে ভারত প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বিদেশী দেশগুলির উপরই নির্ভরশীল ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শিল্পোন্নয়নের প্রসার ঘটেছিল। কার্পাস, পাট, শর্করা, কাগজ, সিমেন্ট প্রভৃতি শিল্পের বিস্তার ঘটেছিল, কিন্তু যন্ত্রপাতি, মোটর গাড়ী, রেল ইঞ্জিন, জাহাজ এবং বিমান তৈরী করার মৌলিক শিল্পগুলি সম্পূর্ণভাবে বাদই পড়ে গিয়েছিল।[১৪] শিল্পক্ষেত্রে ভারতের অনগ্রসরতা

উপলব্ধি করে প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতে ব্রিটিশ সরকার যেমন শিল্পের উন্নয়নের জন্য পার্থক্যমূলক সংরক্ষণ নীতির প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন, তেমনি আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সংরক্ষণ নীতি এবং দ্রুত শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হল। ১৯৪০ সালের জুন মাসে ভারত সরকার একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে ঘোষণা করলেন যে, যে শিল্পগুলি যুদ্ধের সময় অত্যন্ত জরুরী বলে স্বীকৃত হয়েছিল সেগুলি যাতে যুদ্ধের পরেও টিকে থাকতে পারে তার জন্য সেগুলিকে সংরক্ষণ নীতির আওতায় আনা হবে।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা পায়। পুরোপুরি সংরক্ষণ নীতি গ্রহণের পথে এতদিন যে অন্তরায় ছিল স্বাধীনতা-লাভের ফলে তা দূরীভূত হয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভারতীয়দের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা-লাভের সহায়ক হল। স্বাধীনতা-লাভের পর ১৯৪৯ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখে সরকার একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বলে যে পূর্বতন সাময়িক শুল্ক বোর্ডের পরিবর্তে একটি স্থায়ী সংস্থা সৃষ্টি করা হবে যা ভারতের সামগ্রিক পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে একটি সংরক্ষণ নীতি প্রণয়নের জন্য সরকারকে পরামর্শ দেবে। এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে শুল্ক বোর্ডটি ১৯৫২ সালে শুল্ক কমিশনে রূপান্তরিত হয়। এই কমিশন বিভিন্ন নূতন শিল্পের জন্য সংরক্ষণের নীতি গ্রহণের সুপারিশ করে।

স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর ভারতের পরিকল্পনা-নীতির একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় শিল্পের প্রসার ; শিল্প সংরক্ষণ অর্থনীতির লক্ষ্যও ছিল তাই। ১৯৫১ সালে যে প্রথম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাতে অর্থনীতির বুনিয়াদ মজবুত করার জন্য কৃষির উন্নয়নের ওপরই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল এবং বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার ওপরও অনেকটা জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৫৬—১৯৬১) ভারী এবং প্রাথমিক ইস্পাত-শিল্প, যা দেশের উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য, তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার (১৯৬১—১৯৬৬) লক্ষ্য ছিল খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে স্বয়ম্ভরতা অর্জন এবং সেই সঙ্গে লৌহ, ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, জ্বালানী শক্তি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মত মৌলিক শিল্পগুলির উন্নয়ন করা।[১৫] চতুর্থ পরিকল্পনা-কালেও (১৯৬৯—১৯৭৪) শিল্পোন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় এবং আশা করা হয় যে শিল্পক্ষেত্রে বৎসরে ৮ থেকে ১২ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটবে।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা ও ক্রমবিকাশ

ভারতের আধুনিক শিল্পোন্নয়নের সূত্রপাত হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। ভারতীয় শিল্পগোষ্ঠী চাইল কার্পাস এবং অন্যান্য শিল্প গড়ে তুলতে যা পরবর্তী কালে ম্যাঞ্চেস্টার এবং ল্যাঙ্কাশায়ারের শিল্প-স্বার্থের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি করল। এই প্রতিযোগিতার মোকাবিলা করার জন্য শিল্পশ্রেণী সংরক্ষণ এবং স্বদেশিয়ানার কথা বলা হল।

ভারতের শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে একটি শিল্পশ্রেণী যেমন গড়ে উঠল তেমনি সেই সঙ্গে গড়ে উঠল একটি মেহনতী গোষ্ঠী। এই মেহনতী মানুষগুলোই ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের অভ্যুত্থান ঘটাল এবং ক্রমশ তারা ধর্মঘটের হাতিয়ার ব্যবহার করতে শুরু করল। গোড়ার দিকে অবশ্য এই শ্রমিকশ্রেণী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের দ্বারাই পরিচালিত হত।

ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতের শিল্প-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটল। ভারত ক্রমে ক্রমে ব্রিটেনের শিল্প-কারখানাগুলোকে কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল। ভারতে যাতে কাঁচামাল উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, সেজন্য ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজরা ভারতের জমিতে কৃষি উৎপাদনের ব্যবস্থা করল। বড় বড় খামারে চাষ-আবাদের মধ্য দিয়েই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রারম্ভিক রূপ দেখা দিল। এই ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শ্রমিক আন্দোলনের দানাও বেঁধে উঠতে লাগল। গোড়ার দিকে এই আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত এবং অসংগঠিত প্রতিবাদের রূপ ধারণ করে। এই প্রতিবাদ কখনও কখনও বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক ঘটনার মধ্য দিয়েও আত্মপ্রকাশ করে।

১৮৩৩ সাল থেকে, যখন পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে দাসত্বপ্রথা প্রায় বিলুপ্তির মুখে, তখন আসামে ইংরেজরা চায়ের ব্যবস্থা শুরু করে। আসামে যারা চাষবাসের ব্যবস্থা করছিল তাদের কিছুসংখ্যক ছিল যারা কিছুদিন আগেও পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে দাসপ্রথার পরিচালকবর্গের মধ্যে ছিল।

ভারতে এসে চাষবাসের ব্যবস্থা আরম্ভ করে তারা সেই দাসপ্রথার কাঠামোটিকেই অনেকটা বজায় রাখতে চেয়েছিল। এই ব্যবস্থায় কুলী এবং শ্রমিকদের অবস্থা এতই শোচনীয় ছিল, যে মাঝে মাঝে তারা হিংসাত্মক ঘটনার মধ্য দিয়ে নিজেদের ক্ষোভকে প্রকাশ করত। এই সমস্ত ঘটনা ইংল্যাণ্ডের (Luddite) আন্দোলনের স্মৃতিকেই জাগিয়ে তোলে।

কুলীদের এই দুরবস্থা তখনকার দিনের কিছু বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, একজন ব্রাহ্ম সমাজ-সংস্কারক, ছদ্মবেশে কুলীদের সঙ্গে গিয়ে থাকেন। কলকাতায় ফিরে এসে তিনি কুলীদের অসহনীয় অবস্থার বর্ণনা করেন সেকালের পত্রিকা 'সঞ্জীবনী' এবং 'বেঙ্গলী'তে, যার সম্পাদনা করতেন যথাক্রমে কৃষ্ণকুমার মিত্র ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৮৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক অধিবেশন কুলীদের ভেতর এই প্রথা, যা দাসত্বপ্রথার সমতুল্য ছিল, তার অবসানের দাবি জানায় এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে এই দাবি সমর্থন করতে অনুরোধ করে।

এর অব্যবহিত পরে কিছু বাঙালী সংস্কারক ও বুদ্ধিজীবী, শ্রমিকরা যে অসন্তোষজনক অবস্থার মধ্যে বাস করছে তার প্রতিবিধানের দাবি করে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রমিকদের দুর্দশার কথা 'সাম্য' শিরোনামায় ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি প্রবন্ধে প্রকাশ করেন। শ্রমিকদের দুর্দশার কথা আর যাঁরা তুলে ধরেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, এবং দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকুমার মিত্র। তখনকার বাঙালী সমাজসংস্কারক এবং

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কেবলমাত্র লেখনীর মধ্য দিয়েই শ্রমিকদের জন্য তাঁদের সহানুভূতি ব্যক্ত করেন নি। ১৮৭৪ সালে শশিপদ ব্যানার্জী 'ভারত শ্রমজীবী' নামে একটি পত্রিকা চালু করলেন যা ছিল শ্রমিকদের অসন্তোষের মুখপত্র। একেই বলা চলে ভারতের প্রথম পত্রিকা, যা ভারতীয় শ্রমজীবীদের স্বার্থরক্ষার জন্য উৎসর্গীকৃত হয়েছিল।

ভারতে প্রথম অসংগঠিত স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলন দেখা দিয়েছিল চাষ-আবাদের ক্ষেত্রে; পরে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে উঠেছিল রেলে, মুদ্রাযন্ত্রে, এবং তারও পরে, বস্ত্রশিল্পগুলিতে। যদিও গোড়ার দিকে কিছু ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল রেলওয়ে এবং মুদ্রণ-যন্ত্রশিল্পে, তবু প্রকৃত এবং ফলপ্রসূ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে ওঠে পরবর্তী কালে বোম্বাই, আমেদাবাদ, কলকাতা এবং মাদ্রাজের কার্পাস-শিল্পগুলিতে।

প্রথম যুগে ভারতে শিল্প-কারখানাগুলিতে যে-সমস্ত শ্রমিক চাকরির জন্য আসত তারা ছিল দুর্বল এবং কিছুটা অসহায়। তারা এসেছিল নিঃস্ব কৃষকসম্প্রদায় বা রিক্ত কারিগরশ্রেণী হতে। তারা বাধ্য হয়েছিল শহরে আসতে অন্নসংস্থানের জন্য। ১৮৭২--৮১ এবং ১৮৯১--১৯০১ এই দুই দশকে যখন ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন গ্রাম থেকে দলে দলে লোক শহরে আসতে থাকে চাকরির সন্ধানে।[১৬] ফলে প্রথম দিকে কলকারখানার শ্রমিকরা মূলত সবাই ছিল উদ্বাস্তু গ্রামবাসী এবং তাদের মনও পড়ে ছিল গ্রামে। বিংশ শতকের শুরু থেকে কিন্তু ভারতের শ্রমজীবীদের এ বিষয়ে মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতে লাগল। এই সময় কলকাতা, বোম্বে এবং ইস্পাতনগরী জামসেদপুরের অনেক শিল্প-শ্রমিকই গ্রামের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করে পুরোপুরিভাবেই শহরমুখী ও শিল্পনির্ভরশীল হতে চাইল।

যানবাহন এবং যোগাযোগ-ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের শিল্প-কারখানারও ক্রমোন্নতি ঘটল। কার্পাস ও পাট-শিল্পের নির্মাণের ভিত্তি স্থাপিত হল ১৮৫৫ সালে। বৃহদায়তন কার্পাস ও পাট-শিল্পের কলকারখানা ব্যতীতও ছোটখাট কার্পাস ও পাটপেষক যন্ত্র, চাউল কল ইত্যাদি স্থাপিত হতে লাগল। যে সকল শ্রমিক এই শিল্পগুলিতে নিযুক্ত হয়েছিল তারা সবাই ছিল বিত্তহীন কিংবা প্রলেটারিয়েট শ্রেণীভুক্ত।

এই জমিহীন এবং গ্রাম থেকে আগত উদ্বাস্তু শ্রমিকশ্রেণী প্রথমে রাস্তা নির্মাণ, রেলপথ নির্মাণ, গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি কার্যে নিযুক্ত হয়। পরে তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যককে দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলে এবং অন্যত্র প্রেরণ করা হয়। অবশেষে বিগত শতাব্দীর পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে কলকারখানা যখন স্থাপিত হল তখন এই শ্রমিকগোষ্ঠী সেইখানেই কর্মে নিযুক্ত হল। গ্রাম থেকে স্থানচ্যুত হয়ে শহরে এসে কলকারখানায় নিযুক্ত এই শ্রমিকরা সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে এল। এই পরিবেশের সঙ্গে পুরোপুরিভাবে খাপ খাওয়ান ও একাত্ম হওয়া প্রথমটা তাদের কষ্টসাধ্যই ছিল। গ্রামবাসিগণ দলে দলে এসেছিল শহরে, কলকারখানায় কাজের সন্ধানে,—নৌকায়, ট্রেনে ও হাঁটাপথে। গ্রামের আচার-আচরণ এবং সহযোগিতার বন্ধন ছেড়ে তারা এল শহরের বুকে, পরিবর্তন ও প্রাত-

যোগিতার মাঝখানে। এই উৎখাত গোষ্ঠী এসে পড়ল দুটি সভ্যতার সন্ধিস্থলে। শহরে এসে তারা দেখল শিল্পসভ্যতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, দ্রুত-পরিবর্তনশীলতা। গ্রামে কৃষি, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাত্রা এবং আচার-আচরণকে ভিত্তি করে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এবং যার সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল তার কিছুমাত্র তারা শহরে দেখতে পেল না। তাদের জীবনে এল একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন।[১৭]

এটা ঠিক জানা যায় না ঠিক কোন্ সময় থেকে শ্রমিকরা তাদের প্রতিবাদের অস্ত্র হিসেবে ধর্মঘটের প্রয়োগ করে। ১৮৭০ সালে এরকম দেখা গিয়েছে যে শ্রমিকরা তাদের দাবিগুলি আদায় করার চেষ্টা করেছে কর্ম-প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে। সম্ভবত ভারতে ধর্মঘটের প্রথম নজির হল ১৮৭৭ সালে নাগপুরের এম্প্রেস মিলের তাঁত-শিল্পীদের ধর্মঘটে।[১৮]

তারপর থেকে ধর্মঘট ক্রমশ প্রসারলাভ করতে থাকে। কিন্তু গোড়ার দিকে শ্রমিক আন্দোলন খুবই দুর্বল ছিল। ভারতীয় শ্রমিক সংগঠনের দুর্বলতা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যখন দেখি যে ভারত পরিদর্শন করার পর ব্রিটিশ শ্রমিকনেতা কেয়ার হারডি India --Impressions and Suggestions, বলে ১৯১০ সালে যে বইটি লেখেন, তাতে তিনি মেহনতি মানুষদের আন্দোলনের কোন উল্লেখই করলেন না। সেরূপই অপর একজন ব্রিটেনের শ্রমিকনেতা, Ramsay MacDonald, তাঁর 'The Awakening of India' পুস্তকে, যা ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়, তাতে বলেন, ভবিষ্যতে হয়ত ভারতীয় শ্রমিকদের কোন সংস্থা গড়ে উঠতে পারে "যার সংগঠনে সম্ভবত ভারতীয় বর্ণকৌলীন্য এবং গ্রেট ব্রিটেনের ট্রেড ইউনিয়নের রীতির একটি সংমিশ্রণ ঘটবে।"[১৯]

অপর দিকে মধ্যবিত্ত শিক্ষিতরা এবং রাজনীতিবিদ্‌রাই শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিয়েছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনের ঢেউ শ্রমিক জীবনে এসে উঠত, যেমন ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় কিংবা ১৯০৮ সালে যখন তিলককে কারারুদ্ধ করা হয়, তখন শ্রমিকদের মধ্যেও ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দিত। বাঙলাদেশের রাজনৈতিক নেতাগণ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর মুদ্রণযন্ত্র এবং পরিবহণ কারখানার শ্রমিকদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিল তাদের কয়েকটি ধর্মঘটকে সফল করতে। একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ধর্মঘট হয়েছিল যখন ১৯০৮ সালে বোম্বের বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকরা ৬ দিনের রাজনৈতিক ধর্মঘট পালন করে তিলকের দণ্ড ও নির্বাসনের প্রতিবাদে। বম্বের শ্রমিকদের এই রাজনৈতিক ধর্মঘটটি লেনিন কর্তৃক অভিনন্দিত হয়। তিনি বলেছিলেন, "ভারতেও প্রলেটারিয়েট বা শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের চেতনা সঞ্চারিত হচ্ছে, তাদের আন্দোলন রাজনৈতিক জন-সংগ্রামের রূপ নিচ্ছে এবং এর ফলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ভিত দুর্বল হয়ে পড়ছে।"[২০]

বম্বের শিল্প-শ্রমিকদের এই বর্ধিষ্ণু শক্তি সম্বন্ধে শিল্প-মালিকরা ক্রমেই সচেতন হতে লাগল। বম্বের শিল্প-মালিকসংস্থার ডেপুটি চেয়ারম্যান টি বি পেটিট ১৯১৪ সালের এপ্রিলে বললেন, "এই দেশের শ্রমিক আন্দোলনের গতি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ এবং এর গতিকে অবজ্ঞা করা সম্ভব নয়।

৮

ভারতীয় শ্রমিকগণ এখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠছে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য, এরা যদি পুঁজিপতিদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়, যেরকম তারা হয়েছে ইউরোপে, তাতে আমি আশ্চর্য হব না।"[২১]

প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রকৃত শ্রমিক আন্দোলন ভারতে জন্ম নিতে লাগল। যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া শ্রমিকদের তাদের নিজ অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। তারা ক্রমেই উপলব্ধি করতে লাগল ট্রেডসংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা। সর্বোপরি তারা এটাও বুঝতে পারল যে ধর্মঘট তাদের একটা বিরাট হাতিয়ার।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর অনেকগুলি কারণেই ভারতের শ্রমিক আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। যুদ্ধের সময় শিল্প-কারখানার সম্প্রসারণ হয়েছিল এবং শ্রমিকদের চাহিদাও বেড়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের অবসানের পরও মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং তাতে শ্রমিকদের অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের পরে জাতীয় আন্দোলন অনেক জোরদার হয়ে ওঠে এবং তার প্রভাবও পড়ে শ্রমিক আন্দোলনের ওপর। তা ছাড়া রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের অক্টোবরে বিপ্লবের সাফল্য শ্রমিকদের উৎসাহিত করে তোলে এবং শ্রমিক আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে।

১৯১৮ সালে মাদ্রাজে একটি শ্রমিকসংস্থা গঠিত হল। এই সংস্থা-গঠনে ভারতের শ্রমিক আন্দোলন আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। এই সংস্থা ভারতের ট্রেডসংস্থা গঠনের অগ্রদূত হিসাবে কাজ করল। তিন বছরের মধ্যেই বম্বে, কলকাতা, আমেদাবাদ এবং আরও কতগুলি জায়গায় বেশ-কিছুসংখ্যক ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠল। আর ১৯১৮ ও ১৯২১ সালের মধ্যে ভারতের সর্বত্র কলকারখানায় ধর্মঘটের আধিক্য দেখা গেল। আমেদাবাদে বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকরা গান্ধীজীর নেতৃত্বে তিন সপ্তাহের একটি ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। তিন সপ্তাহ পরে যখন শ্রমিকরা খানিকটা পিছিয়ে গিয়েছিল, তখন গান্ধীজী তাদের দাবির সমর্থনে অনশন শুরু করেন। এই অবস্থায় মালিক পক্ষ মিটমাটের জন্য 'সালিসী বোর্ডের' নিকট ব্যাপারটি পাঠাতে বাধ্য হয়।

১৯২০ সালে সব ভারতীয় শ্রমিকসংস্থা (AITUC) গঠিত হয় কংগ্রেস-নেতা লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে। যদিও এই সংস্থা গঠিত হয় তবু আসলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সংগঠন এবং ঐক্য তখনও বেশ দুর্বলই ছিল। বস্তুত বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা ভি ভি. গিরি, পরবর্তী কালে যিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি হন, বলেছিলেন, "লাজপত রায় সর্বভারতীয় শ্রমিকসংস্থার সভাপতি হিসেবে বুঝেছিলেন যে তখনও (১৯২০ সালে) এই সংস্থা পুরোপুরি সর্বভারতীয় নাম ধারণের উপযুক্ত হয়ে ওঠে নি"।[২২]

১৯২৯ সালে বি. পি. ওয়াদিয়া, এ আই টি ইউ সির অন্যতম নেতা, বলেছিলেন যে শ্রমিক আন্দোলনকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একটি অখণ্ড সত্তা হিসেবেই গণ্য করতে হবে এবং জাতীয় আন্দোলন কখনই গণতন্ত্রের আদর্শ রূপায়িত করতে পারবে না যদি শ্রমিকরা তাদের নিজ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তিনি বলেছিলেন যে চাষী, কুলী, কারখানার মজুর এবং সাধারণভাবে সমস্ত শ্রমিকশ্রেণী তাদের অধিকার না পেলে

সত্যিকারের স্বাধীনতা আসবে না। যদি বিদেশীর হাত থেকে দেশীয় লোকের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার না পায় তবে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের ফলে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে না, কেবলমাত্র ব্রিটিশ আমলার পরিবর্তে ভারতীয় আমলাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।[১৩]

অনেক কংগ্রেসনেতা, যেমন চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহেরু, জওহরলাল নেহেরু এবং সুভাষ বসু, কোন না কোন সময়ে এ আই টি ইউ সির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ আই টি ইউ সির মধ্যে অবশ্য কিছু লোক ছিলেন যাঁরা মনে করতেন যে এই সংস্থা ভারতের শ্রমিকদের জন্য একটি পৃথক্ দল গঠনে সাহায্য করতে পারে। লাজপত রায়ের মত এইরূপই ছিল। এই মতের সমর্থনে এফ জে জিনওয়ালা, এ আই টি ইউ সির সাধারণ সম্পাদক, এ আই টি ইউ সির পঞ্চম সাধারণ অধিবেশনের বিবরণে বলেন যে ভারতের মাটি প্রস্তুত হয়েছে এইরকম একটি শ্রমিকদল তৈরী করার জন্য।[১৪]

কিন্তু এ আই টি ইউ সির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কয়েকজন, যেমন চিত্তরঞ্জন দাশ, মনে করতেন যে শ্রমিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং জাতীয় আন্দোলনের উদ্দেশ্য পৃথক্ নয়। শ্রমিক বলতে তিনি চাষ এবং কল-কারখানায় নিযুক্ত সমস্ত শ্রমিককেই ধরতেন। ভারতে এই শ্রমিকরাই ছিল সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী। এদের স্বার্থেই দেশের জাতীয় আন্দোলন পরিচালিত হওয়া উচিত এই ভেবে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, এদের জন্য পৃথক্‌ভাবে দল গঠন করার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? ১৯২৩ সালে অনুষ্ঠিত এ আই টি ইউ সির তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, "অনেকে প্রশ্ন করেন শ্রমিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? আমার উত্তর এই যে ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৯৮ ভাগই শ্রমিক, ভারতের শ্রমিক বলতে কৃষকদেরও বোঝায়, এত বড় একটা জনসংখ্যার সংগঠনের কোনো প্রয়োজন নেই এ কথা কি কেউ বলতে পারেন? আমার কাছে আমলাতন্ত্র আমলাতন্ত্রই, সে সাদা চামড়ারই হোক আর বাদামী চামড়ারই হোক, সেইজন্যই আমার কাছে স্বরাজের অর্থ জনসাধারণের স্বরাজ, সমগ্র জনসংখ্যার স্বরাজ, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য স্বরাজ নয়।"

এ আই টি ইউ সির মধ্যে তৃতীয় আর একটি মতাবলম্বী গোষ্ঠী ছিলেন যাঁরা মনে করতেন যে এই সংস্থা কেবলমাত্র শ্রমিকদলের সংগঠনের কেন্দ্র বলে ভাবা উচিত হবে না, আবার এটাকে সম্পূর্ণ একটা রাজনৈতিক দলের অঙ্গীভূত করাও ঠিক হবে না। এই মতবাদ পোষণ করতেন এন. এম যোশী, ভি ভি. গিরি, দিওয়ান চমনলাল প্রভৃতি। এঁরা চাইতেন যাতে এ আই টি ইউ সি সর্বপ্রথম শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দেয় এবং এঁরা মনে করতেন যে এই কাজে যে-কোন রাজনৈতিক দলই সাহায্য দিন না কেন তাকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

অনেক রাজনৈতিক নেতাই উপলব্ধি করেছিলেন যে শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থন না পেলে জাতীয় আন্দোলনই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ১৯২২ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে সি. আর. দাশ বলেন, "আমার মনে হয়

কংগ্রেসের আর কালক্ষেপ না করে একটি জোরালো কমিটি তৈরী করা প্রয়োজন যে কমিটি ভারতের শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠিত করবে। আমরা ইতিমধ্যেই দেরী করে ফেলেছি। যদি কংগ্রেস তার কর্তব্য না করে, তবে আপনারা জানবেন যে ভারতের বুকে পৃথক্‌ভাবে শ্রমিক ও কৃষকদের সংস্থা গড়ে উঠবে, যারা আপনাদের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখবে, স্বরাজ্যের মূলে কুঠারাঘাত করবে এবং যারা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাঝে নিয়ে আসবে শ্রেণীসংগ্রাম।"[২৫]

ভারতের শ্রমিকনেতারা আন্তর্জাতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিল প্রথম পর্ব হতেই। তাদের মধ্যে একদল ছিলেন যাঁরা সমর্থন করতেন আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নকে যার প্রধান কার্যালয় ছিল আমস্টার্‌ডামে; অপর দল যুক্ত ছিলেন আন্তর্জাতিক শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে যার প্রধান কার্যালয় ছিল মস্কোতে। ১৯২১ সালে মস্কোর লাল আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ এ আই টি ইউ সির দ্বিতীয় অধিবেশনে তাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছিল এবং এ আই টি ইউ সি কে বিশ্ব আন্দোলনের আন্তর্জাতিক ঐক্যসূত্রে যোগদান করতে আহ্বান করেছিল। এ আই টি ইউ সি এই শুভেচ্ছা গ্রহণ করে এবং ভারতীয় শ্রমিকদের রাশিয়ার শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়াতে নির্দেশ দেয়।

১৯২৩ সাল থেকে বম্বে এবং কলকাতায় কমিউনিস্টরা শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করে। ভারতীয় কমিউনিস্টদের কি করা উচিত তা ১৯২৪ সালে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থার অধিবেশনে বলা হল, "ভারতীয় কমিউনিস্ট দল শ্রমিক আন্দোলনকে নিজ প্রভাবে অবশ্যই নিয়ে আসবে এবং তারা এটাকে শ্রেণীভিত্তিক আন্দোলনের রূপ দেবে।"

শ্রেণীস্বার্থের উপর জোর দেওয়ার নীতি সম্বন্ধে এ আই টি ইউ সির মধ্যে কিছু মতান্তর দেখা গেল। কমিউনিস্টরা চাইল যে ভারতীয় শ্রমিকরা শ্রেণীসংগ্রামের উপর জোর দিক। অন্য দিকে কংগ্রেসনেতা সি. আর দাশ ১৯২৩ সালে অনুষ্ঠিত এ আই টি ইউ সির সভাপতি হিসেবে শ্রেণী সংঘাতের ওপর জোর দেওয়ার বিরুদ্ধে বললেন। তিনি বললেন, "এই শ্রেণীসংঘাতের ধারণাটি ইউরোপে গ্রহণযোগ্য হতে পারে কিন্তু ভারতের পক্ষে এই নীতি উপযোগী নয়। কারণ শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে আপামর জনসাধারণের কোন বিরোধ ভারতে নেই।"[২৬]

১৯২০--২২ সালের অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া শ্রমিক আন্দোলনেও গিয়ে পড়ে। ১৯২৪ সালে ভারতে অনেক ধর্মঘট হয়েছিল, বিশেষ করে প্রথমে বম্বে এবং পরে কানপুরের বয়ন-শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে। ১৯২৪ সালে সরকার কানপুর চক্রান্ত মামলা দায়ের করেন ১২ জন নেতার বিরুদ্ধে, যাঁদের মধ্যে ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা ডাঙ্গে, সৌকত ওসমানী, মুজাফ্‌ফর আমেদ প্রভৃতি।

১৯২৭ সালে সাপুরজী সাকলাতওয়ালা, ব্রিটিশ কমিউনিস্ট এম. পি., ভারতে এসেছিলেন। তিনি, গান্ধীর নীতি যে 'শ্রমিকদের ন্যায্য ভাগ দিতে হবে'—এটিকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে অভিহিত করেন। গান্ধী এর উত্তরে

বলেন যে তিনি চান যাতে শ্রমিকদের ন্যায্য ভাগ দেওয়া হয়, তবে পুঁজিকে অনড় করে নয়, শ্রমিকদের আত্মসচেতন করে। গান্ধী বলেন, "শ্রমিকগণ আমার মতে রাজনীতিবিদ্‌দের হাতে দাবার ঘুঁটি হয়ে দাঁড়াবে না, তারা নিজেদের শক্তি অনুযায়ীই দাবার ছককে নিয়ন্ত্রণ করবে।"

১৯২৭ সালের ১লা মে তারিখটি বম্বেতে প্রথম শ্রমিক দিবস হিসাবে পালিত হল। তারপর থেকেই ১লা মে তারিখটি প্রতি বৎসর ভারতের অনেক জায়গাতেই 'মে দিবস' বা শ্রমিক দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে।

১৯২৯ সালের মার্চে সরকার আদালতে মীরাট চক্রান্ত মামলা দায়ের করলেন। এতে ৩১ জন ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হল। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন এস. এ. ডাঙ্গে, মুজাফ্‌ফর আমেদ এবং অন্যান্য কয়েকজন কমিউনিস্ট নেতা। এই বিচার আদালতে প্রায় চার বৎসর পর্যন্ত চলল। হ্যারল্ড ল্যাস্কি একে আমেরিকার স্যাকো ভ্যানসেত্তির বিচার, ফরাসী দেশের ড্রেফায় বিচার এবং জার্মানীর রাইসট্যাগ বিচারের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

যখন এই মামলা শুরু হয় তখন এ আই টি ইউ সির সভাপতি ছিলেন জওহরলাল নেহেরু। তিনি ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কাছে আবেদন করেছিলেন যাতে এই ইউনিয়ন এই বিচারের বিরোধিতা করে এই বলে যে, এই মামলা রুজু করা হয়েছে রাজনৈতিক কারণে এবং ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখার জন্য। ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস তাদের সম্পাদক ওয়ালটার মিট্রারিনের মাধ্যমে এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নি। তাঁরা বললেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত, সুতরাং এই বিচার ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের কোনো ক্ষতি করবে না।

১৯২৯ সালে এ আই টি ইউ সির মধ্যমপন্থী দল, যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এন এম যোশী, ভি. ভি. গিরি, শিবা রাও এবং দিওয়ান চমনলাল, আর চরমপন্থী দলের মধ্যে মতানৈক্য দেখা গেল। ফলে মধ্যমপন্থী দল এ আই টি ইউ সি থেকে বেরিয়ে এল এবং তারা ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংযুক্ত সংস্থা গঠন করল।

১৯২৯ সালে কমিউনিস্টরা জাতীয়তাবাদী বামপন্থী দলগুলির সহায়তায় এ আই টি ইউ সির উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করল। কিন্তু ১৯৩১ সালে বি. টি. রণদেভ এবং এম. ভি দেশপাণ্ডের নেতৃত্বে চালিত কমিউনিস্ট-দের সাথে বামপন্থী জাতীয়তাবাদীদের বিরোধ হয়। জাতীয়তাবাদীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। বিরোধ ঘটল এই প্রশ্নে যে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে এ আই টি ইউ সির সম্পর্ক কি হবে? ১৯৩১ সালের এ আই টি ইউ সির অধিবেশনে ব্রিটিশ এম পি সাকলাতওয়ালা কর্তৃক প্রেরিত একটি বার্তা পঠিত হয়। এতে তিনি বলেন যে গান্ধী এবং জাতীয়তাবাদী নেতারা বিপ্লবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং তাদের মুখোশ খুলে দিতে হবে। জাতীয়তাবাদীরা এই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন। এই অবস্থায় এ আই টি ইউ সিতে ভাঙন অপরিহার্য

হয়ে উঠল। ফলে কমিউনিস্টরা এ আই টি ইউ সি ত্যাগ করে একটি পৃথক্ সর্বভারতীয় লাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠন করল।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, যা নিয়ন্ত্রণ করত সর্বভারতীয় লাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে, তা ১৯৩৪ সালে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তাই ১৯৩৫ সালে এই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এ আই টি ইউ সির সঙ্গে মিলিত হয়। এই সময়ে আবার একটি নূতন রাজনৈতিক দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্য থেকে উদ্ভূত হল। এই দলের নাম হল কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দল। সি. পি আই নিষিদ্ধ হওয়ার পর কমিউনিস্টরা কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে থাকে।

কমিউনিস্টরা সোশ্যালিস্ট দল এবং এ আই টি ইউ সির মধ্যে থেকে কাজ চালিয়ে যেতে লাগল, কিন্তু তারা এইসব সংস্থাগুলিকে সত্যি-কারের বামপন্থী বা বিপ্লবী বলে স্বীকার করত না। ১৯৪০ সালে আর পি. দত্ত, ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা, 'ইণ্ডিয়া টুডে' বইটিতে লেখেন, "কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির বিশেষ চরিত্রটি এই যে এটি জাতীয় কংগ্রেসের একটি শাখা এবং কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণে থাকার ফলে এই সংস্থা অপরিহার্যভাবেই খেটে-খাওয়া মানুষের সংগ্রামকে দাবিয়েই রাখছিল।...এই সংস্থার বাম-পন্থীরা কমিউনিস্ট এবং শ্রমিকশ্রেণীর সহযোগিতা চায়, কিন্তু অধিক-সংখ্যক প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থীরা কমিউনিস্ট দল এবং মেহনতি মানুষের কার্যধারার বিরোধিতা করে।"[১৭] কমিউনিস্টগণ দাবি করল যে তারা পৃথক্‌ভাবে স্বাধীন শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন গড়ে তুলবে যা বুর্জোয়া প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হবে।[১৮]

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায় শুরু হয় ১৯৩৫ সালের ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার সংস্কারের আইন বলবৎ হবার পর। এই আইনের ধারা অনুযায়ী শ্রমিকরা প্রাদেশিক বিধানসভায় ৩৮টি আসন এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় ১০টি আসন পেল।

১৯৩৫ সালের শাসনসংস্কার আইন অনুসারে নির্বাচনে জয়লাভ করে কংগ্রেস ১৯৩৭-৩৮ সালে ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৭টি প্রদেশে নির্বাচিত সরকার গঠন করে। কংগ্রেস সরকার শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য কিছু-কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন, যদিও অনেক শ্রমিকনেতার মতে তা যথেষ্ট ছিল না।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতেই যখন ব্রিটিশ সরকার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নির্বাচিত সরকারগুলির সঙ্গে কোন পরামর্শ না করে ঘোষণা করে দিল যে ভারতও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে, তখন কংগ্রেস সরকারগুলি এই একতরফা সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে পদত্যাগ করে। এই যুদ্ধ চলাকালীন এ আই টি ইউ সির মধ্যে আরেকটি ভাঙন দেখা গেল। এম. এন. রায়ের নির্দেশিত নীতিকে যারা সমর্থন করল তারা বলল যে জার্মানীর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক গৃহযুদ্ধ, যে ফ্যাসিবাদ স্বাধীনতা এবং মেহনতী মানুষের উন্নয়নের পরিপন্থী, এবং সেইজন্যই ভারতের শ্রমিকদের জার্মানীর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধকে সমর্থন করতে হবে। যুদ্ধ সমর্থন করার প্রশ্ন নিয়ে

বিরোধের ফলে এম. এন. রায়ের অনুগামীরা এ. আই. টি ইউ. সি থেকে বেরিয়ে এসে ১৯৪০ সালে ভারতীয় যুক্ত শ্রমিকসংস্থা (Indian Federation of Labour) গঠন করেছিল।

১৯৪২ সালে রাশিয়া যখন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল, তখন ভারতের কমিউনিস্টরা ঘোষণা করল যে এই যুদ্ধ জনগণের যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। এই ভিত্তিতে কমিউনিস্টরা ব্রিটিশদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে এবং ১৯৪২ সালে গান্ধীর নেতৃত্বে যে 'ভারত-ছাড়' আন্দোলন শুরু হয় তার বিরোধিতা করে। এই আন্দোলনের ফলে বেশীর ভাগ জাতীয় নেতারা কারারুদ্ধ হয়। এই অবস্থায় যুদ্ধের সময় এ আই টি ইউ সি-তে কমিউনিস্টদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দ্রুত প্রসার ঘটে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় শিল্প-মালিকগণ যথেষ্ট লাভবান হয়, তাই শিল্পবিরোধ-নিষ্পত্তিকারী সংস্থার বিচারের সঙ্গে তারা সহযোগিতা করে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাদের লাভের অংশও হ্রাস পেতে লাগল, ফলে শ্রমিকদের প্রতি তাদের সহানুভূতি ও মীমাংসায় আসার তৎপরতাতেও ভাটা পড়তে লাগলো। এই অবস্থায় শ্রমিক অসন্তোষ আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে। যুদ্ধ চলাকালীন এবং যুদ্ধের পরেও জিনিসপত্রের দাম ক্রমশই বাড়তে লাগল। ফলে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার খরচ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের মজুরী বৃদ্ধির দাবি আরও জোরদার হয়। যুদ্ধশেষে ধর্মঘটের সংখ্যা তাই বেড়ে যেতে থাকে।

যুদ্ধের পর দুটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক আইন পাশ হয়েছিল, যথা, ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন (সংশোধন) অ্যাক্ট, ১৯৪৭ এবং শিল্পবিরোধ অ্যাক্ট, ১৯৪৭। প্রথম আইনটিতে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে স্বীকৃতি দানের কথা ছিল, কিন্তু কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনামাটি জারী হয় নি। অন্যদিকে শিল্পবিরোধ অ্যাক্ট, ১৯৪৭ আইনটি শ্রমিক আইনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই আইনের মাধ্যমে বহু শিল্প-বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে।

যুদ্ধশেষে দেখা গেল যে কমিউনিস্টরাই এ আই টি ইউ সি-কে পরিচালনা করছে। যুদ্ধশেষে কংগ্রেসনেতাগণ কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে একটি পৃথক্ সবভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা গঠনের চিন্তা করলেন। কেন পৃথক্ সংস্থা গঠন করতে হবে সে-বিষয়ে কংগ্রেসনেতা গুলজারিলাল নন্দা বললেন যে, শ্রমিক জগতে কংগ্রেসভাবাপন্ন যারা কাজ করছে তাদের পক্ষে এ আই টি ইউ সি-র সাথে সহযোগিতা করে কাজ চালিয়ে যাওয়া কঠিন হচ্ছে, কেননা এই সংস্থা যে পন্থা গ্রহণ করেছে তা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নির্দেশিত পন্থার বিরোধী। ১৯৪৬ সালের ১৩ই আগস্ট কংগ্রেস কার্য-নির্বাহক কমিটি পরামর্শ দেন যাতে কংগ্রেসভাবাপন্ন ব্যক্তিরা হিন্দ মজদুর সেবক সংঘ (HMSS) কর্তৃক নির্দেশিত নীতি অনুসারে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেন।

কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমিটির সুপারিশ অনুসরণ করে কংগ্রেস-কর্মীরা শ্রমিক ফ্রন্টে এইচ এম এস এস-এর নেতৃত্বে কাজ শুরু করে এবং

পরে ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (INTUC) গঠন করে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সভাপতিত্বে এই সংস্থাটি সংগঠিত হয়। এই সংস্থার প্রথম অধিবেশনে যেসব কংগ্রেসনেতা যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন জওহরলাল নেহেরু, জে. বি কৃপালনী, জগজীবন রাম, রবিশঙ্কর শুক্লা, হরেকৃষ্ণ মহতাব, কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়, অরুণা আসফ আলী এবং অশোক মেহেতা।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হল। এই বৎসরটিকে ধর্মঘটের বৎসরও বলা চলে। এই বছরে ১,৮১১টি শ্রমিকবিরোধ হয়েছিল তাতে ১৬,৫৬২,৬৬৬ কর্মদিবস নষ্ট হয়। এই উপলক্ষে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৪৬ সালে ১,৬২৯টি শ্রমিকবিরোধে ১২,৭১৭,৭৬২ দিন এবং ১৯৪৫ সালে ৮২০টি বিরোধে ১২,৭১৭,৭৬২ কর্মদিবস নষ্ট হয়েছিল।[২৯] ১৯৪৭ সালে ধর্মঘটের এই বৃদ্ধি সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তোলে এবং প্রধানমন্ত্রী নেহেরু বললেন যে এতে জাতীয় উৎপাদন উদ্বেগজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে।

শ্রমিক ও মালিক-সম্পর্কের উন্নতিসাধন এবং শ্রমিকবিরোধের নিষ্পত্তি করার জন্য একটি শিল্প অধিবেশন আহ্বান করা হয়। ১৯৪৭ সালে নূতন দিল্লীতে এই অধিবেশন বসে। এতে শ্রমিক, মালিক ও সরকারের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। এই অধিবেশনে অনুমোদন করা হল যে শ্রমিকবিরোধ নিষ্পত্তিতে সংবিধানের ধারাগুলি অনুসৃত হবে, শ্রমিকদের বেতনহারের উন্নয়নের প্রয়াস নেওয়া হবে, শিল্প-কারখানায় শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করা হবে এবং লক্ আউট, ধর্মঘট ইত্যাদি তিন বৎসরের জন্য পরিহার করা হবে।

১৯৪৭ সালের পর শিল্পবিরোধ কিছুটা হ্রাস পেল। যেখানে ১৯৪৭ সালে ধর্মঘট ও কর্মবিরতির সংখ্যা ছিল ১,৮১১, ১৯৪৮ সালে তা হল ১,২৫৯ এবং ১৯৪৯ সালে হল ৯২০ এবং ১৯৫০-এ ৮১৪।[৩০]

১৯৪৭ সালের পর যখন অ-কমিউনিস্টরা এ আই টি ইউ সি পরিত্যাগ করল, তখন এ আই টি ইউ সি পুরোপুরিই কমিউনিস্টদের নিয়ন্ত্রণে চলে এল। ভারত সরকার সম্পর্কে কমিউনিস্টদের নীতি অন্যান্য শ্রমিক নেতাদের থেকে পৃথক্ ছিল। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় অধিবেশনে বলা হয়েছিল যে যদিও বুর্জোয়া নেতাগণ প্রচার করে বেড়ায় যে ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে, কিন্তু প্রকৃত সত্য হল যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে প্রতারণা করা হয়েছে এবং জাতীয় নেতাগণ বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছে।

কমিউনিস্টরা মনে করত যে কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল এবং ১৯৪৮ সালে তারা খনিগুলিতে, বয়নশিল্পে, ভারতীয় রেলওয়েতে এবং ট্রাম কোম্পানীতে বহু ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। বম্বে এবং কলকাতার কিছু ধর্মঘট হিংসাত্মক হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ও অনেক রাজ্য এই আন্দোলন প্রতিরোধের জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সি পি. আই কে নিষিদ্ধ করে দেয়, অনেক কমিউনিস্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করে এবং এ আই টি ইউ সি-র পশ্চিমবঙ্গের শাখাটির কার্যকলাপ বন্ধ করে দেয়।

১৯৪৮ সালে জন-নিরাপত্তা আইনে বহু নেতৃস্থানীয় কমিউনিস্ট দেশের বিভিন্ন স্থানে গ্রেপ্তার হলেন। এর প্রতিবাদে কমিউনিস্টগণ সর্বভারতে রেল ধর্মঘটের আহ্বান জানাবার জন্য প্রচার চালাতে লাগল এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে জয়প্রকাশ নারায়ণ, সর্বভারতীয় রেল ফেডারেশনের সভাপতি, রেল ধর্মঘটের ডাক দেন। সর্বভারতীয় রেল ধর্মঘটটি ১৯৪৯-এর ৯ই মার্চ থেকে শুরু হবার কথা ছিল, কিন্তু এটা প্রত্যাহার করে নেওয়া হল জয়প্রকাশ নারায়ণ ও পরিবহণ মন্ত্রী গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার ফলে। কমিউনিস্টরা অবশ্য দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলগুলিতে ধর্মঘট চালিয়ে যেতে লাগল। ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে কমিউনিস্টরা অনেকগুলি ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল, যেমন, সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট এবং সর্বভারতীয় পাট-শিল্প কর্মীদের ধর্মঘট।

১৯৪৮--৫০ সালের সংগ্রামনীতির ফলে সরকারের সঙ্গে এ আই টি ইউ সি-র সংঘর্ষ বাধে। আর এই সংঘর্ষের ফলে এ আই টি ইউ সি দুর্বলই হয়ে যায়। এই সংস্থার সভ্যসংখ্যা ১৯৪৮ সালের ৭০০,০০০ থেকে কমে ১৯৫১ সালে ১০০,০০০তে দাড়াল। সংস্থাটি এতই দুর্বল হয়ে পড়ল যে এর অধিবেশন ৫ বৎসর পরে ১৯৫৪তে অনুষ্ঠিত হতে পারল। পরে এ আই টি ইউ সি-র নেতাগণ দুঃখ করে বলেছিলেন যে ১৯৪৮--৫০ সালে এ আই টি ইউ সি-র নেতৃত্ব হঠকারী নীতি গ্রহণ করেছিল। এ আই টি ইউ সি-র একটি সরকারী বিবরণীতে বলা হয়েছে, "এতে কোন সন্দেহ নেই যে এ আই টি ইউ সি-র মূল নেতৃত্ব সরকারের প্ররোচনার শিকার হয়েছিল এবং এ আই টি ইউ সি দুর্বল হয়ে যায় হঠকারী নীতি অনুসরণ করার ফলে। কংগ্রেসের নীতিগুলির মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্য সংগ্রামের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তা সতর্কতার সঙ্গে পরিচালনা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয় নি। এই সতর্কতা ১৯৪৮--৫০ সালে পরিত্যক্ত হয়েছিল বলেই সংস্থাটি দুর্বল হয়ে পড়ে"।[১১]

ভারতের শ্রমিক আন্দোলন এখনও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রভাবিত। ভারতীয় শ্রমিকরা কোন একটি সংস্থার নেতৃত্বে পরিচালিত নয় যেরূপ পরিচালিত অধিকাংশ ব্রিটিশ শ্রমিকরা ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্বে, কিংবা এ এফ.এল ও সি এল ও যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে আমেরিকার বেশির ভাগ শ্রমিকরা। ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলন ফরাসী বা ইটালীর শ্রমিক আন্দোলনের ন্যায় অনেকগুলি সংগঠনে বিভক্ত হয়ে গেছে।

প্রথম সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠন ছিল এ আই টি ইউ সি। ১৯৪২ সালে যখন 'ভারত-ছাড়' আন্দোলন শুরু হয় তখন জাতীয়তাবাদী এবং সমাজবাদী নেতাগণ বেশীর ভাগই কারারুদ্ধ হন আর এই সময়ে কমিউনিস্টরা এ আই টি ইউ সি-তে সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯৪৫ সালে জেল থেকে বেরিয়ে এসে জাতীয়তাবাদী ও সমাজবাদীরা এ আই টি ইউ সিতে যোগদান করবেন বা পৃথক্ কোন সংস্থা গঠন করবেন এরূপ চিন্তা করতে লাগলেন। পরে কংগ্রেসভাবাপন্ন জাতীয়তাবাদীরা ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (INTUC) গঠন করেন ১৯৪৭

সালে। ১৯৪৮ সালে কংগ্রেস সোশ্যালিস্টরা কংগ্রেস দল থেকে বেরিয়ে এসে একটি পৃথক্ সমাজতান্ত্রিক দল গঠন করে এবং ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে এই সমাজতান্ত্রিক দল হিন্দ্ মজদুর পঞ্চায়েতের (HMP) প্রতিষ্ঠা করে। ফলে ভারতে তিনটি সর্বভারতীয় শ্রমিক সংস্থা গঠিত হয়; যথা, এ আই টি ইউ সি কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রণাধীনে, আই এন টি ইউ সি কংগ্রেস প্রাধান্যে এবং এইচ এম পি, পরে যেটা এইচ এম এস নামে পরিচিত, এবং যা সমাজতান্ত্রিকদের নিয়ন্ত্রণে।

এ আই টি ইউ সি-র উদ্দেশ্য যেটা তাদের সংবিধানে বিধৃত হয়েছে, সেটা হল ভারতকে সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত করা, দেশের সমস্ত উৎপাদন, বন্টন এবং বিনিময়কে যতটা সম্ভব সমাজীকরণ ও জাতীয়করণ করা এবং তারই ফলে সমস্ত মেহনতী মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিবিধান করা।

আই এন টি ইউ সি হিংসাত্মক পথ অনুসরণ না করে মেহনতী মানুষের অবস্থার উন্নতি চায়। আই এন টি ইউ সি-র দার্শনিকতার মূলে রয়েছে গান্ধীবাদী সমাজবাদ, ঠিক যেরকম এ আই টি ইউ সি-র চিন্তা-ধারার মূলে রয়েছে মার্কসীয় সমাজবাদ। আই এন টি ইউ সি-র প্রধান উদ্দেশ্য এমন একটি সমাজ গঠন যেখানে প্রত্যেকটি মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব।

এ আই টি ইউ সি এবং এইচ এম এস উভয়েই তাদের সংবিধানে ঘোষণা করেছে যে তারা সমাজবাদের নীতিতে বিশ্বাসী, কিন্তু প্রথম সংস্থাটি কমিউনিস্ট পরিচালিত এবং পরেরটি সমাজতান্ত্রিক। সোশ্যালিস্টরা বলত কমিউনিস্টদের সাথে তাদের মূলগত পার্থক্য এই যে তারা শান্তিপূর্ণ নীতিতে ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। এইচ এম এস তাই ঘোষণা করেছিল যে, তাদের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশগঠন নয়, গণ-তান্ত্রিক সমাজবাদী রাষ্ট্রগঠন।

সি. পি. আই এবং সি পি আই (এম) এই দুই দলই এ আই টি ইউ সিতে অংশগ্রহণ করত, কিন্তু সি পি আই এবং সি পি. আই (এম)-এর রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ফলে এ আই টি ইউ সি-র মধ্যে ভাঙন আসে। সি. পি আই (এম)-এর ট্রেড ইউনিয়ন শাখা এবং কতগুলি ক্ষুদ্র দল, যেমন মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক এবং ভারতের বিপ্লবী কমিউনিস্ট দল, এ আই টি ইউ সি থেকে বেরিয়ে এসে ১৯৭০ সালের মে মাসে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্র (CITU) নামে একটি নতুন সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন-সংস্থা গঠন করে। সি. পি আই. (এম) বললেন যে এ আই টি ইউ সি শোধনবাদী হয়ে গেছে, তাই সমাজবাদী নীতি সংরক্ষণ করার জন্য এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনে সিটু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৩২] অপরপক্ষে সি. পি. আই. বললেন যে এই নতুন শ্রমিকসংস্থা গঠন দ্বারা ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের উপর সবচেয়ে বড় আঘাত করা হয়েছে।[৩৩]

জমিদারশ্রেণী ও কৃষক আন্দোলন

জমির ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব যেটা ব্রিটিশরা 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এর মাধ্যমে বাঙলা দেশে প্রবর্তন করেছিল সেটাই জমিদারী-প্রথা প্রবর্তন করল। এই জমিদারী-প্রথা কিছুটা ইংরেজ ভূস্বামী প্রথার অনুকরণে হয়েছিল। ব্রিটিশরা মাদ্রাজে এবং অন্যান্য স্থানে অবশ্য রায়তওয়ারী প্রথা চালু করে, যা অনেকটা ফরাসী জমি মালিকানা স্বত্ব-প্রথার অনুকরণে হয়েছিল।

লর্ড কর্নওয়ালিশ প্রবর্তিত জমিদারী-প্রথা অভিজাতপন্থী ছিল। লর্ড লিটন বলেছিলেন যে ভূমিপ্রাপ্ত অভিজাত সম্প্রদায় হচ্ছে রক্ষণশীল শক্তি এবং ব্রিটিশ শাসকরা তাদের সমর্থন পাবে এই আস্থা রাখা যেতে পারে।

ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে বড় বড় ভূস্বামীদের এবং দেশীয় রাজন্যদের উদ্দেশ্য একই ছিল, তারা status quo থাকবে বা ব্রিটিশ শাসন অক্ষুণ্ণ থাকবে এটাই চাইত। ব্রিটিশ শাসকগণ প্রথমে এই দেশীয় রাজাদের এবং পরে জমিদারদের ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থায় কিছু স্থান দিয়েছিল। ১৮৬২ সালে পাতিয়ালার মহারাজা এবং বেনারসের রাজা গভর্নর জেনারেলের আইনসভায় নির্বাচিত হন।

১৮৫১-এর প্রারম্ভে বড় বড় ভূস্বামী কিংবা জমিদাররা তাঁদের রাজনৈতিক সংস্থা গঠন করেছিলেন ভারতীয় ব্রিটিশ সংস্থা নামে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কর্তৃক আনীত রাজনৈতিক দাবিগুলির বিরোধিতা করতেন এই সমস্ত জমিদার। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় লিটনের দমননীতিগুলির বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু ভূস্বামিগণ করেন নি। বিপিন পাল, যিনি সে যুগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিভূ ছিলেন, তিনি লিখেছেন, "লিটনের প্রেস অ্যাক্টের বিরোধিতা করার জন্য ভারতীয় সংস্থা (Indian Association) কলকাতার টাউন হলে কলকাতাবাসীদের জন্য একটি সাধারণ অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু তৎকালিক জমিদারদের সেই অধিবেশনে যোগদান করতে বিরত করল ভারতীয় ব্রিটিশ সংস্থা"।[৩৪]

বেশীর ভাগ জমিদার এবং দেশীয় রাজারা প্রচলিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাকে চালু রাখতে চেয়েছিলেন এবং তদানীন্তনকালের জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। ভিনগার রাজা, যিনি অভিজাত ভূস্বামীদের প্রতিভূ ছিলেন, তিনি তার মনোভাব Democracy Not Suited In India গ্রন্থে ব্যক্ত করেন।[৩৫] তিনি বললেন, 'নীচবংশীয় মানুষ' বংশকৌলীন্যে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠায় যাঁরা তাদের উর্ধ্বে তাঁদের সমান কিংবা বেশী ক্ষমতা পেতে পারে না। তিনি সোজা-সুজিই বললেন যে দেশীয় অভিজাত সম্প্রদায় এই চায় যে সামাজিক বৈষম্য, যেটা স্মরণাতীত কাল থেকে চলে আসছে, তা অক্ষুণ্ণই থাকুক।[৩৬] এই অভিজাত সম্প্রদায়ের গণতন্ত্রের প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল না, তাঁরা ছিলেন রক্ষণশীল, গোঁড়া এবং প্রচলিত রীতিতে বিশ্বাসী। এই রক্ষণশীলতার মনোভাব ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমশই দূরীভূত হচ্ছিল এবং ভিনগার রাজা দুঃখ করে বললেন যে তারা পাশ্চাত্যের অদ্ভুত

ও জটিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন চাইছে। রাজা দাবি করলেন যে অভিজাত সম্প্রদায়ই দেশের জনসাধারণের প্রকৃত স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে এবং ব্রিটিশ শাসকদের এই সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই রাজ্য পরিচালনা করা উচিত।[৩৭]

আর একজন ভূস্বামী রাজা শিবপ্রসাদ ১৮৮৮ সালে বলেছিলেন যে সরকারের উচিত ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রবিরোধী প্রচারমূলক সমস্ত সংবাদ-পত্রকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া। যে-সমস্ত সংবাদপত্র লিখছিল যে ব্রিটিশ শাসনে দেশ যন্ত্রণা ভোগ করছে বা যারা ভারতীয়দের ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলতে চাইছিল বা যারা বলছিল যে আমেরিকাতে নিগ্রোরা পর্যন্ত সবরকমের অধিকার পায় তারা, এই রক্ষণশীল রাজার মতে, আপত্তিকর, উত্তেজক ও বিপজ্জনক ভাষা ব্যবহার করছিল।

আর.এ সনভারস নামে একজন স্বল্পখ্যাতিসম্পন্ন সলিসিটর ১৮৯০ সালে এই প্রস্তাব দেন যে একটি ভারতীয় লর্ড সভা তৈরী করা হোক এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের সহায়তা নিয়ে ভারতকে শাসন করা হোক। তিনি সুপারিশ করলেন যাতে ১২৮০ সদস্য নিয়ে এরকম একটা সভা গঠন করা হয় সেখানে বেশীর ভাগ দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং ভূস্বামীরা থাকবে। সনভারস অবশ্য এও বলেছিলেন যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং তুলনামূলকভাবে ধনী কিছু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভারতীয়দের এই Indian Peerage-এর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। সনভারসের আশা এই ছিল যে ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত কংগ্রেস আন্দোলনের বিরোধিতা করার হাতিয়ার হবে এই লর্ড সভা।[৩৮] সনভারস চেয়েছিলেন ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিক দাবিকে প্রতিরুদ্ধ করতে এবং রক্ষণশীল অভিজাত সম্প্রদায়কে ব্রিটিশ শাসকদের পূর্ণ সমর্থক করে তুলতে। এই অভিজাত সম্পদায় স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে খুবই সচেষ্ট ছিল এবং তারা স্বীকারও করত যে প্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর।[৩৯]

এমনকি মুসলিম নেতা সৈয়দ আমেদ খান কংগ্রেস-পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন কেবলমাত্র এই কারণেই নয় যে এই আন্দোলনের ভিত্তি ছিল যে ভারতীয়রা একটি জাতি,[৪০] এ ছাড়া এই কারণেও যে এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ভারতে গণতান্ত্রিক সংগঠন গড়ে তোলা। সৈয়দ আমেদ বললেন যে এটাই স্বাভাবিক যে গভর্নর-জেনারেল আইনসভার সদস্য নির্বাচন করবেন উচ্চ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে। তিনি বললেন, "উচ্চ পরিবারে জন্ম ব্যতীত কাহাকেও কি ভাইসরয় নিজের সহকর্মী বা ভাইয়ের মত মনে করতে পারেন এবং তাকে ডিউকদের সাথে এক আসনে বসিয়ে ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ করতে পারেন"।[৪১] জন্ম এবং বংশ-কৌলীন্যের ভিত্তিতে আইনসভা গঠনের এই প্রস্তাবের বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হল জাতীয় প্রেসে।[৪২] Indian Spectator লিখল যে ভারত চায় না দেশীয় অভিজাতদের দিয়ে পরিচালিত সরকার, সে চায় যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত সরকার।[৪৩] 'The Tribune' এই কথাটি সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে বাঙলা দেশের জমিদাররাই আইন-

সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিলেন ইংরেজী-শিক্ষিত কৃষ্ণদাস পালকে যদিও পাল জন্মেছিলেন 'নীচ' তেলী বংশে।[৪৪]

ইংরেজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত মধ্যবিত্তদের দ্বারা পরিচালিত কংগ্রেস আন্দোলনের মোকাবিলা করার জন্য অভিজাত সম্প্রদায়কে ব্যবহার করার কথা মর্লে-মিন্টো সংস্কারের সময় যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে। কি করে এই আন্দোলনের মোকাবিলা করা যাবে গভর্নর জেনারেল মিন্টোর মনে এই চিন্তাই সর্বপ্রধান ছিল। ১৯০৬ সালের ২৭শে জুন মিন্টো লিখলেন যে কংগ্রেসী ব্যক্তিগণ, যারা সহজেই পাশ্চাত্য ভাবধারা গ্রহণ করেছে, তাদের ব্রিটেনে অত্যাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।[৪৫] তিনি বললেন যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যা নিয়ে সরকারকে ভাবতে হবে তা কিন্তু "কংগ্রেসীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার অসম্ভব ব্যাপার নয়"।[৪৬] তিনি চাইলেন যাতে বিরাট ভূস্বামীদের, যারা কংগ্রেসের নীতির বিরোধী ছিল, তাদের আইনসভায় বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৯০৬ সালের ২৮শে মে মিন্টো ভারতসচিব মর্লেকে লিখলেন, "আমি কংগ্রেসীদের উদ্দেশ্যের বিপরীতগামী চিন্তা করছি। আমি মনে করি সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায় হবে দেশীয় রাজন্যবর্গের একটি কাউন্সিল গঠনে কিংবা ওই চিন্তাকেই একটু বাড়িয়ে প্রিভি কাউন্সিল গঠনে যেখানে কেবলমাত্র দেশীয় রাজন্যবর্গ থাকবে না, অন্যান্য বড় কিছু লোকও থাকবে—আমার মনে হয় তাদের কাছ থেকে এরকম চিন্তাভাবনা পাব যা কংগ্রেসের চিন্তাভাবনা থেকে পৃথক্।"[৪৭]

কংগ্রেস প্রভাবের বিপরীত শক্তি গঠনের জন্য মিন্টো চাইলেন আইন-সভাতে অধিক পরিমাণে ভূস্বামী প্রতিনিধি, এবং মর্লেকে একটি চিঠিতে তিনি জানালেন, "আমার মনে হচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য আমরা যাদের পাব তারা অধিক পরিমাণে কংগ্রেস আন্দোলনের সাথে জড়িত হবে। এদের প্রভাব খর্ব করতে পারলে জমিদারদের সংস্থা বা এধরনের সংস্থাগুলি থেকে মনোনীত সদস্য, যারা ভূস্বামীদের স্বার্থ দেখবে।"[৪৮]

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এবং কংগ্রেসীদের প্রভাবের মোকাবিলা করার জন্য ভারত সরকার পরামর্শ দিলেন একটি ইম্পিরিয়াল উপদেষ্টা কমিটি গঠন করার। বলা হল যে এই কমিটিতে থাকবে দেশীয় রাজন্যবৃন্দ এবং বড় বড় ভূস্বামী এবং প্রাদেশিক উপদেষ্টা কমিটিতে থাকবে ভূমি-স্বত্বাধিকারী, ছোট ছোট জমির মালিক এবং কারখানা, বাণিজ্য, আর পেশাদার শ্রেণী থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি।[৪৯] এই উপদেষ্টা কাউন্সিল-গুলির ক্ষমতা অবশ্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ক্ষমতার সঙ্গে কোন সাদৃশ্যই থাকবে না। এই কাউন্সিল কেবলমাত্র উপদেশই দিতে পারবে।[৫০]

দেশীয় রাজন্যবর্গ প্রথমে আপত্তি জানাল এই বলে যে এই মিশ্র ইম্পিরিয়াল উপদেষ্টা কাউন্সিলে তাদের বসতে হবে ব্রিটিশ সরকারের প্রজাদের সঙ্গে "যারা তাদের চেয়ে নিকৃষ্টশ্রেণীর।"[৫১] শেষ পর্যন্ত এই উপদেষ্টা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যায়।[৫২] এতে কংগ্রেসীরা আনন্দিতই হল, কারণ তারা জানত যে কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিল এই ভেবেই যে কাউন্সিল কংগ্রেসীদের প্রভাব খর্ব করতে পারবে।[৫৩]

যে সংশোধনী প্রস্তাব সরকার কর্তৃক পেশ করা হল তাতে বলা হয় যে ১৮৯৩-এর পর থেকে নির্বাচন-প্রথা যে কিছুটা চালু করা হয়েছিল তাতে চাকরীজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব অত্যধিক হয়েছে,[৫৪] আর এই প্রাধান্যকে প্রতিরোধ করার জন্য ভূস্বত্বাধিকারী ও অর্থবান্ সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে অধিকসংখ্যক সদস্য নিতে হবে। কংগ্রেসীরা ভূস্বামীদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াবার জন্য মর্লে-মিন্টোর সংশোধনী প্রস্তাবের সমালোচনা করল,[৫৫] এবং তাদের মধ্যে অনেকেই ভূস্বামীদের পৃথক্ প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাবের বিশেষভাবে বিরোধিতা করেন।[৫৬] পণ্ডিত বি. এম. ধর মন্তব্য করলেন যে ভূস্বামীরা অত্যধিকভাবে রক্ষণশীল।[৫৭] তিনি বললেন, "কাউন্সিলে যাওয়া উচিত সেই সব ব্যক্তির যারা শিক্ষিত, যাদের বুদ্ধি-বিবেচনা রয়েছে, যারা ব্রিটিশ সভ্যতার আদর্শগুলিকে সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করতে পারে এবং যারা যুগ ও কালোপযোগী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। কিন্তু ভূস্বামী সম্প্রদায় হচ্ছে সেই গোষ্ঠী যারা জ্ঞানে পশ্চাদ্‌মুখী, কেবলমাত্র অতীত দর্শন ও চিন্তার সাথেই যারা গ্রথিত এবং যাদের স্বর্ণময় যুগ রয়েছে অতীতে, ভবিষ্যতে নয়।"[৫৮]

১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ডের সংশোধন প্রস্তাব প্রবর্তিত হওয়ার আগে জমিদাররা পুনরায় তাদের সেই রক্ষণশীল নীতিই তুলে ধরল। ভারতীয় ব্রিটিশ সংস্থা যা জমিদারদের সংগঠন ছিল তাদের সম্পর্কে মন্টেগু Indian Diary-তে লিখলেন, "ভারতীয় ব্রিটিশ সংস্থাটি একটি রক্ষণশীল সংস্থা যেখানে বর্ধমানের মহারাজা প্রধান ছিলেন, তাঁর ব্রিটিশ শাসনের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল।"[৫৯]

জমিদাররা সাধারণত ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্কারের বিরোধিতা করত, কিন্তু প্রজারা, যারা জমি চাষ করত, তারা অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য বিভিন্ন আন্দোলনে অংশ-গ্রহণ করতে শুরু করে। প্রথম দিকে এই সমস্ত আন্দোলনে প্রজারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যোগ দিত, তাদের কোনো সুসংবদ্ধ সংগঠন ছিল না; অবস্থা যখন অসহনীয় হয়ে উঠত, তখন তারা অপারগ হয়ে এই সমস্ত আন্দোলনে নেমে পড়ত। ১৮৭০, ১৮৯৬, এবং ১৮৯৭ সালে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই সমস্ত দুর্ভিক্ষে কৃষকরা নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অমানুষিক দুর্দশা এবং অসহনীয় কষ্ট স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে একটা অস্থিরতা এনে দেয়, আন্দোলনের পথে তাদের এগিয়ে নিয়ে যায় এবং তারা জমিদার এবং সরকারের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে ওঠে। ১৮৭০ সালের দুর্ভিক্ষে বাঙলার প্রজারা এমনভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে যার ফলে তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই খাজনা দিতে অসমর্থ হয় এবং আদালত-কর্তৃক প্রদত্ত তাদের উৎখাতের আদেশ অমান্য করতে বাধ্য হয়। ফলে বাঙলার অনেক অংশেই অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। ১৮৮৫ সালে 'বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট' প্রচলিত হয় যা প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার ভার খানিকটা লাঘব করে।

১৮৭৫ সালে মারাঠা কৃষকরা অত্যন্ত অভাব-অনটনের মধ্যে পড়ে এবং তারা যাঁদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিল কিন্তু শোধ করতে পারে নি,

তাদের ঘরবাড়ী সব আক্রমণ করতে থাকে, এমন কি কয়েক জন মহাজনকে হত্যা পর্যন্ত করে। পরিস্থিতির জটিলতা অনুধাবন করে সরকার দাক্ষিণাত্যের কৃষি রিলিফ অ্যাক্ট প্রবর্তন করেন ১৮৭৯ সালে। তাতে দাক্ষিণাত্যের কৃষকরা মহাজনদের কাছ থেকে কিছুটা রেহাই পায়। ঊন-বিংশ শতকের শেষের দিকে যখন পাঞ্জাবের কৃষকরা ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছিল যে মহাজনরা তাদের জমি কেড়ে নেবে তখন সরকার Punjab Land Alienation Act প্রবর্তন করেন (১৯০২-৩ সালে)।

প্রথমদিকে ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, যারা কংগ্রেসকে পরিচালনা করত, তারা কৃষকদের অবস্থার উন্নয়ন করার দিকে খুব বেশী জোর দেয় নি। তারা শিল্প-কারখানার বিস্তারের জন্যই সরকারের কাছে দাবি জানাত। পরবর্তী কালে গান্ধী ছিলেন রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অন্যতম যিনি কৃষকদের সংগঠনের কথা ভেবেছিলেন। ১৯১৭-১৮ সালে বিহারে চম্পারনে গান্ধী কৃষকদের সংগঠিত করেছিলেন। এই চম্পারন-বিক্ষোভ সরকারকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতে বাধ্য করে। এই কমিটিতে গান্ধীও একজন সদস্য ছিলেন। এই কমিটির রিপোর্টকে ভিত্তি করে একটি আইন পাশ হয়, এবং এই আইন কৃষকদের অবস্থার কিছু উন্নয়ন করতে সাহায্য করে। পরে খায়রাতে গান্ধী কৃষকদের একটি সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন। ফসলের অভাবের জন্য সেখানকার কৃষকরা যথাসময়ে ভূমি-রাজস্ব দিতে অসমর্থ হয়, তাই তারা আন্দোলন শুরু করেছিল।

১৯১৯ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় ভূমি-রাজস্ব না দেওয়ার জন্য কংগ্রেস যে ডাক দিয়েছিল তা স্বভাবতই কৃষকদের সমর্থন লাভ করে। কয়েক বছর পরে আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ কৃষক-সংগ্রাম হয়েছিল ১৯২২ সালে মোপলাদের আন্দোলনের মাধ্যমে। এই আন্দোলন করেন মুসলিম কৃষিজীবীরা মালাবারের ব্রাহ্মণ ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে। এই আন্দোলন পরে অবশ্য ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের রূপ নেয় এবং এতে বহু প্রাণ ও সম্পত্তি নষ্ট হয়।

১৯১৯-এর অসহযোগ আন্দোলনের পরে কৃষক সংগঠন গড়ে উঠতে লাগল। রায়তদের সংগঠন গড়ে উঠল অন্ধ্রে ১৯২৩ সালে এবং কিষান সভা গড়ে উঠল পাঞ্জাব, বাঙলা এবং উত্তর প্রদেশে ১৯২৬-২৭ সালে। ১৯২৮-২৯ সালে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল গুজরাটের বর্দৌলিতে একটি সফল কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন।

বিশ্বব্যাপী এক অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় ১৯২৯ সালে। ভারতের কৃষকদের অবস্থাও এই সময়ে খুব সঙ্গীন হয়ে ওঠে। ফলে কৃষক আন্দোলন দেখা দিয়েছিল উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্র, গুজরাট, এবং দেশের আরও কয়েকটি রাজ্যে।

১৯৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলন শেষ হয়ে যাওয়ার পর, কিষানদের জন্য পৃথক্ সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। এর ওপর জোর দিলেন সমাজবাদী কংগ্রেস-নেতারা, জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষ বসু প্রমুখ বামপন্থী জাতীয় নেতারা এবং কমিউনিস্ট নেতৃবর্গ।

১৯৩৫ সালে প্রাদেশিক কিষান সভা গড়ে উঠল উত্তর প্রদেশে। ১৯২৭-এর প্রারম্ভে বিহারে একটি কিষান সভা গড়ে উঠেছিল কিন্তু ১৯৩৪ সালের পর থেকে স্বামী সহজানন্দের প্রচেষ্টায় এই সভার প্রসার ঘটে। প্রকৃতপক্ষে সেই সময়ে বিহার কিষান সভা প্রাদেশিক কিষাণ সভাগুলির মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

১৯৩৬ সালে এলাহাবাদে সর্বভারতীয় কিষান সভার পত্তন হয়। সর্বভারতীয় কিষান সভাটির গঠন কিষান আন্দোলনে একটি বিরাট্ পদক্ষেপ, কারণ এর ভিত্তিতেই কিষাণ আন্দোলন সর্বপ্রথম জাতীয় রূপ পেল। জওহরলাল নেহেরু বিশেষভাবে এই সর্বভারতীয় কিষাণ সংস্থাকে সমর্থন জানায়।

১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস কিষাণ উন্নয়নের জন্য তার সামাজিক অর্থনৈতিক নীতি ঘোষণা করেন। নির্বাচনের পর কংগ্রেস ৯টি রাজ্যের মধ্যে সাতটিতে সরকার গঠন করেন। কংগ্রেস সরকার কৃষকদের উন্নয়নের জন্য কিছু কিছু সংস্কার সাধন করে কিন্তু অনেক কিষাণ নেতা তা যথেষ্ট মনে করেন নি। কিষাণ সভাগুলি বার বার আন্দোলন করতে লাগল যাতে কংগ্রেস সরকারগুলি কৃষকদের উন্নয়নের জন্য আরও অধিকতর সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ করে।

স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানায় কৃষক আন্দোলন হয় এবং তা হিংসাত্মক রূপ নেয়। হায়দ্রাবাদের ভারতের সঙ্গে সংযুক্তির প্রশ্ন যখন পুরোপুরি স্বীকৃত হয় নি, তখন মাদ্রাজের সীমানাস্থ হায়দ্রাবাদের দুটি জেলা কমিউনিস্ট গেরিলাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে আসে। কমিউনিস্টরা চেয়েছিল হায়দ্রাবাদের কিছু অংশ ও মাদ্রাজের কিছু অংশ নিয়ে তেলেগু ভাষাভাষীদের একত্রিত করে একটা পৃথক্ রাষ্ট্র গঠন করতে। তেলেঙ্গানার এই আন্দোলনের মোকাবিলা করার জন্য ভারত সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যখন ভারত সরকার তেলেঙ্গানায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা নিচ্ছিল তখন গান্ধীর শিষ্য বিনোবা ভাবে তেলেঙ্গানার কৃষকদের প্রভাবিত করতে চাইলেন ভূদান যজ্ঞের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে। ভূদান যজ্ঞের মাধ্যমে বিনোবা সবাইকে জমি দান করতে আহ্বান জানালেন যাতে সর্বহারা জমিহীন কৃষকদের মধ্যে তা বণ্টন করা যায়। ভূদান যজ্ঞ আন্দোলন কিছুকাল চলার পর বিনোবা গ্রামদান আন্দোলন শুরু করলেন। তিনি বললেন যে গ্রামগুলিকে সমবায়ের ভিত্তিতে সমষ্টিগতভাবে সেবার কার্যে লাগান হবে।

গান্ধীর পথ অনুসরণ করে বিনোবা চেয়েছিলেন সর্বোদয়ী সমাজের প্রতিষ্ঠা, যেখানে রাষ্ট্র বিলীন হয়ে যাবে সমাজে। সমস্ত উৎপাদনের উপায়-গুলির সমাজীকরণ করা এবং রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করে তোলা বিনোবার লক্ষ্য ছিল না। বরঞ্চ, রাষ্ট্রের ক্ষমতা কমিয়ে বিকেন্দ্রীকরণ করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। বিনোবা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন লোকশক্তি, রাজশক্তি নয়।

বিনোবা আবেদন করলেন যাতে প্রত্যেক ভূস্বামী তার জমির এক-

ষষ্ঠাংশ ভূমিহীনদের দান করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ করে যৌথ চাষ ও সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামীণ শিল্প গড়ে তোলা -এই ছিল বিনোবার লক্ষ্য। কমিউনিস্টরা অবশ্য বললেন যে ভূদান বা গ্রামদান আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। তাদের মতে, '...যে জমিগুলি দান করা হয়েছে সেগুলি চাষের অযোগ্য এবং নানারকম মামলার জালে জড়িত, সুতরাং সর্বোদয়ের প্রাপ্তি শূন্যের চেয়েও খারাপ।"৬০

সি. পি. আই (এম)-এর মধ্যে যারা চরমপন্থী এবং যারা পরবর্তী কালে নক্‌শালপন্থিরূপে পরিচিত তারা বলল যে কৃষকবিপ্লব সংঘটিত করতে গেলে একটাই পথ খোলা আছে তা হল গেরিলা যুদ্ধ এবং হিংসাত্মক বিপ্লব। স্বাধীনতা-লাভের পর এই রাস্তাটি প্রথম গৃহীত হয় তেলেঙ্গানায়। তারপর এই পথ অনুসৃত হয় নক্‌শালবাড়ীতে ১৯৬৭ সালে যখন জমিদার ও সরকারী আমলাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের কাছ থেকে জমি ও অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়।

সি. পি. আই. এবং সি. পি আই (এম) উভয়েই নক্‌শালদের এই হিংসাত্মক পথের সমালোচনা করে। ১৯৬৯ সালের অক্টোবরে সর্ব-ভারতীয় কিষান সভার (সি পি. আই এম) (অন্য একটি সর্বভারতীয় কিষান সভা, সি পি আই. কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত) সাধারণ সম্পাদক হরেকৃষ্ণ কোঙার যখন কিষানসভার বিংশ অধিবেশনে তাঁর বিবরণীটিকে পেশ করছিলেন তখন তিনি নক্‌শালদের নীতির কথা উল্লেখ করে বলেন যে এই নীতি পশ্চিম বাঙলায় খুব একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, তবে অন্ধ্রে এই নীতি যথেষ্ট ক্ষতি করেছে। তিনি বললেন, "অন্ধ্রে নক্‌শালরা আন্দোলনকে এমনভাবে চালিয়েছেন যার ফলে কৃষকরা নিজেদের কবর নিজেরা খুঁড়েছে, শ্রীকাকুলামে গিরিজানরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একটি শক্তিশালী আন্দোলন যা ব্যাপক গণতান্ত্রিক সমর্থনের শক্তিতে চালিত হতে পারত, সেই আন্দোলনকে হঠকারিগণ বিচ্ছিন্ন করে দিল গণতান্ত্রিক সমর্থন থেকে এবং তাকে পুলিশী অত্যাচারের শিকারে পরিণত করল।"৬১ কোঙার বলেন যে পশ্চিম বাঙলা এবং কেরালা ছাড়া অন্য সব রাষ্ট্রেই কিষান আন্দোলন খুব দুর্বল।৬২

কৃষকদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পন্থার অন্বেষণ হয়েছে। নক্‌শালরা চেয়েছিল কিষান সংগঠনকে গেরিলা বাহিনীতে পরিণত করতে যারা প্রথম গ্রামগুলিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবে এবং তারপর বৃত্তাকারে শহরগুলিকে বিপ্লবাত্মক ক্ষমতার কবলীভূত করবে। কমিউনিস্টরা চেয়েছিল বিরাট ভূস্বামী ও মহাজনদের বিরুদ্ধে একটি কৃষক প্রতিরোধক সংস্থা গড়ে তুলতে। কেন্দ্রীয় সরকার, যারা দুই দশকের বেশী দেশ শাসন করেছে, তারা চেয়েছিল নানা রকম ভূমি সংস্কার আইন এবং গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষকদের উন্নতিবিধান করতে। বিনোবা এবং তাঁর অনুগামীরা চেয়েছিলেন ভারতের পূর্বতন গ্রাম পঞ্চায়েতী ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনতে ভূদান এবং গ্রামদান আন্দোলনের মাধ্যমে।

দাদাভাই নৌরজী, বিপিন পাল ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তার পূর্বাভাষ

১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর গোড়ার দিকে কংগ্রেসের বিশেষ কোনো অর্থনৈতিক কর্মসূচী ছিল না, আর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল খুব সীমিত। প্রথম দিকের কংগ্রেস সভ্যরা ইউরোপীয় শ্রমিকনেতাদের কাছ থেকে কিছুটা সমর্থন পেয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে ইউরোপের কিছু শ্রমিক অথবা সমাজবাদী নেতাদের সাহচর্য বিরূপ সমালোচনার কারণ হয়ে ওঠে। দাদাভাই নৌরজী যে তাঁর রাজনৈতিক প্রয়াসে সমাজবাদীদেধ সমর্থন পেয়েছিলেন তাতে ১৮৯৭ সালে তার কিছু কিছু বন্ধু অস্বস্তিবোর করতে শুরু করেন। তখনকার দিনের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র 'দি হিন্দু প্যাট্রিয়ট' এটাকে বিপজ্জনক বলেও মন্তব্য করেন। এই সব সমালোচনার উত্তর দিয়ে দাদাভাই বলেন যে সমাজবাদীরা সাহায্য করছে বলে আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কারণ নেই, আসলে ভারতবাসীদের এটা একটা অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য যে একটি শক্তিশালী ও প্রগতিশীল আন্দোলন ভারতবর্ষকে সাহায্য করছে।[১]

যদিও সমাজবাদী হাইণ্ডম্যানের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের জন্যে দাদাভাই সমাজবাদী চিন্তার সাথে কিছুটা পরিচিত হয়েছিলেন, সেই সময়ে অন্যান্য মধ্যপন্থীদের সমাজবাদের সঙ্গে বিশেষ কোন পরিচয় ঘটে নি। যে সময়ে এই সব মধ্যপন্থীরা ব্রিটিশের ভারত-নীতির সমালোচনা করছিলেন, তার আগেই মার্কসের 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ' প্রণীত হয়ে গেছে, ফেবিয়ানদের বিবর্তনমূলক সমাজবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং কার্যকরী রাজনীতিতে হাইণ্ডম্যান আর কেয়ার হার্ডি সমাজবাদী আন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু মধ্যপন্থীরা ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্বন্ধে ততটা আগ্রহী ছিলেন না, তাঁদের চিন্তার আসল বিষয় ছিল ভারতের অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির প্রভাব যে সমস্যার সৃষ্টি করেছিল সেইটা। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতিতে ভারতের ঐতিহাসিক অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়েছে, পুরাতন কৃষি ও শিল্পের যে ভারসাম্য ছিল তা ভেঙে পড়ছে এবং জনসাধারণের দারিদ্র্য বেড়েছে। এই অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে মধ্যপন্থীরা ব্রিটিশের ভারত-নীতির কঠোর সমালোচনা করলেন এবং ইংরেজ-শক্তির কাছে অনুরোধ জানালেন যে শাসনতন্ত্রকে এইভাবে পরিবর্তিত করতে হবে যাতে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

গোড়ার দিকে যদিও কংগ্রেস রাজনৈতিক ব্যাপারেই বেশী মনোনিবেশ করেছিলেন তবু তারই সঙ্গে তাঁরা শিল্পায়নের কথাও বলেছেন, আর ব্রিটিশ যে ভারতবর্ষের সম্পদ শোষণ করছে এ অভিযোগও এনেছিলেন। ব্রিটিশ শোষণ ভারতীয় দারিদ্র্যের কারণ একথা দাদাভাই নৌরজী পরিষ্কার করে বলেছিলেন, আর বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের দরিদ্র মানুষ "had hardly

2d. a day, a few rags, or a scanty subsistence." তাঁর মতে এই শোষণ বন্ধ না হলে ভারতের দারিদ্র্যমোচন সম্ভব নয়। দাদাভাইয়ের অর্থনৈতিক বক্তব্য "Poverty and UnBritish Rule in India" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।[২]

ব্রিটেনের শোষণ যে শুধু ভারতীয় অর্থনীতিতে বিনিয়োগকে শীর্ণ করে আনছিল তাই নয়, দাদাভাইয়ের মতে এই শোষণ থেকে গৃহীত মূলধন আবার নূতন করে শোষণের জন্য কাজে লাগছিল, আর এই পদ্ধতিতে ভারতের সমস্ত শিল্প ও বাণিজ্যের ওপর একচেটিয়া প্রভুত্ব করে ভারতবর্ষকে আবার নূতন করে শোষণ করা হচ্ছিল।[৩] ১৮৭১ সালে দাদাভাই এই শোষণের পরিমাপ করার চেষ্টা করেছিলেন এবং মোটামুটি যে সংখ্যায় পৌঁছেছিলেন তা হল ৫০০,০০০,০০০ পাউণ্ড শুধুমাত্র মূলধনেই।[৪]

দাদাভাইয়ের এই "শোষণ অর্থনীতি" (drain theory) কিছুটা সমালোচিত হয়েছে সত্য, তবু মধ্যপন্থীদের পক্ষ থেকে সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি নিরূপণের বোধ হয় এইটেই প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা। দাদাভাইয়ের এই অর্থনৈতিক বক্তব্য পরে তিলকের মত চরমপন্থীরা আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ১৮৯৭ সালের ২২শে জুন 'কেশরী'তে তিলক লিখলেন যে ভারতবর্ষ প্রতি বছরে ব্রিটেনের কাছে চৌত্রিশ কোটি টাকা করে হারাচ্ছে। তিলকের মতে, "Appliances like railways telegraph and roads have increased, but all this is like decorating another's wife. Not only do they not belong to us, but we have to suffer annually loss in interest and exchange on their account. India will never prosper in this way."

ভারতবর্ষের আধুনিক কালের প্রথম অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক রমেশ দত্তও ভারতের দারিদ্র্যের কারণ হিসেবে বিদেশী শাসকের শোষণই নির্ণয় করেছিলেন। এই জাতীয় দারিদ্র্য এমনিতেই অসহনীয়, তার ওপর উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে দুর্ভিক্ষ হয় তা ভারতবর্ষকে সীমাহীন দারিদ্র্যের মধ্যে ঠেলে দেয়। রমেশ দত্তের হিসেবে ১৮৭৭, ১৮৭৮, ১৮৮৯, ১৮৯২ এবং ১৮৯৭ সালের দুর্ভিক্ষে প্রায় দেড় কোটি লোক মারা গিয়েছিল।[৫] ভারতবর্ষের এই অস্বাভাবিক দারিদ্র্য ও পৌনঃপুনিক দুর্ভিক্ষ শুধুমাত্র জনসংখ্যার অতিরিক্ততা দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব ছিল না। বাস্তবিকভাবে ভারতের জনবৃদ্ধির হার সেই সময়ের ইংল্যাণ্ডের জনবৃদ্ধির হারের চেয়ে কমই ছিল। রমেশ দত্তের মতে ভারতের এই দারিদ্র্যের জন্য ব্রিটেনের অর্থনৈতিক নীতিই দায়ী।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারত কৃষি ও শিল্পে এক সমৃদ্ধ দেশ ছিল। ভারতীয় তাঁতশিল্প এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন বাজারে বিক্রয় হত। কিন্তু ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আর ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতের উৎপাদন-ক্ষমতাকে অপমৃত্যুর মধ্যে ঠেলে দেয় এই উদ্দেশ্যে যাতে করে ইংল্যাণ্ডের বাজার সমৃদ্ধ হতে পারে। রমেশ দত্ত লেখেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই নীতি 'অবিচল নিষ্ঠার' সঙ্গে চালিয়েছিল। তিনি বলেন যে ভারতীয় শিল্পীদের ব্রিটিশ কারখানার কাজ করতে বাধ্য করা হয়ঃ "Commercial residents

were legally vested with extensive powers over villages and communities of Indian weavers, prohibitive tariffs excluded Indian silk and cotton goods from England. English goods were admitted into India free of duty or on payment of nominal duty."[৬]

কি কারণে ভারত দরিদ্র সে-বিষয়ে রমেশ দত্তের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি লিখেছিলেন যে, যে কোন দেশেই যদি তৎকালীন ভারতবর্ষের অবস্থা সৃষ্টি করা হত, অর্থাৎ শিল্প পঙ্গু করা হত এবং কৃষিক্ষেত্রে করের গুরুভার চাপিয়ে দেওয়া হত, আর প্রতি বছর দেশের প্রায় অর্ধেক মূলধন অন্য কোন দেশে পাচার করা হত, তা হলে সে দেশ দুর্ভিক্ষের কবলে যেতে বাধ্য হত। যে-কোন সাম্রাজ্যবাদী শাসন-ব্যবস্থাই শাসিত দেশের অর্থনৈতিক শোষণের উপর নির্ভর করে। এই প্রসঙ্গে রমেশ দত্ত এবং অন্যান্য ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা জন স্টুয়ার্ট মিল-এর নিম্নোক্ত উক্তিটি বার বার উল্লেখ করেছেন: "The Government of a people by itself has meaning and a reality. but such a thing as Government of the people by another does not, and cannot, exist. One people may keep another for its own use, a place to make money in, a human cattle farm to be worked for the profit of its inhabitants."[৭]

গোখলের দৃষ্টিতে অবশ্য ভারতীয় অর্থনৈতিক শোষণের কারণ দাদাভাই নৌরজীর বক্তব্য থেকে কিঞ্চিৎ পৃথক্ ছিল। গোখলের মতে ভারতবর্ষের আসল আর্থিক শোষণ হয়েছে ইংরেজকে অতিরিক্ত চাকরি দেওয়ার ফলে এবং লণ্ডনস্থিত ইণ্ডিয়া অফিসের সমস্ত খরচ ভারতবর্ষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য। গোখলে দুঃখ করেছিলেন যে এইভাবেই ভারতবর্ষের রক্ত শুষে নেওয়া হচ্ছে। এই নীতিকে সমালোচনা করতে গিয়ে গোখলে বলেন যে যখন একদেশের লোক অন্য একদেশের সরকার তৈরী করে তখন এই জিনিস না হয়ে উপায় নেই।[৮] আয়ার্ল্যাণ্ডে যেমন ব্রিটিশ শাসন অনুপস্থিত জমিদারী-প্রথার পাপ স্থায়ী করেছিল তেমনি ভারতবর্ষেও গোখলের উক্তিতে: "What can be called absentee capitalism has been added to the racial ascendancy of Englishmen".[৯]

ইংরেজ সমাজবাদীরা এই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা করে বলেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদ শোষণপরায়ণ হতে বাধ্য। যে-সব কংগ্রেস সভ্যরা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের জন্য প্রয়াসী হয়েছিলেন তাঁরাও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং শোষণের মধ্যেই ভারতীয় দারিদ্র্যের কারণ খুঁজে পান। কংগ্রেসীদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর যে আক্রমণ তা মোটামুটি সমাজবাদী আক্রমণের ধারাই অনুসরণ করে। ১৯০২ সালে দাদাভাই নৌরজী তাঁর ব্রিটিশ শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন: "You have been regularly draining and bleeding us of millions of money...these millions do not go to make you any better off, they go into the pockets of the capitalists".

ব্রিটিশ সরকারের এই শোষণনীতিই ভারতে অর্থনৈতিক জাতীয়তা-বাদের জন্ম দেয়। ১৮৭৭ সালে তেলাঙ্গ দুঃখ করে বলেছিলেন যে যদিও ব্রিটেনের নিজস্ব রাজনৈতিক মতামত হল এই যে, যে-কোন জাতিকে কর দিতে বাধ্য করা যাবে না যতক্ষণ না সেই জাতির প্রতিনিধিরা সেই কর দিতে সম্মত হয়, অদ্যাপি এই নীতি ভারতে ব্রিটেন চালু করে নি। তিনি বলেন যে ব্রিটেনের প্রচলিত 'ল্যাজেফেয়ার' (laissez faire) অর্থ-নীতিকে ভারতবর্ষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই[১০] এবং বহু ইংরেজ অর্থনীতিবিদও মনে করেন যে 'ল্যাজেফেয়ার' নীতি সব অবস্থায় চালু হতে পারে না। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ্ জন স্টুয়ার্ট মিল নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে, যে দেশে অজ্ঞতা, দারিদ্র্য এবং উদ্যোগের অভাব সে দেশে এই নীতির পরিবর্তে সরকারের উচিত অর্থনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা এবং রাস্তা, বাঁধ, হাসপাতাল, বিদ্যালয় ইত্যাদি নির্মাণ করে অর্থনৈতিক প্রগতিকে ত্বরান্বিত করা।[১১] তাই ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতির জন্য 'ল্যাজেফেয়ার' নীতি অপ্রযোজ্য এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ছাড়া ভারতীয় অর্থনীতি নিজের পায়ে দাড়াতে পারবে না।[১১]

রানাডে এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে ১৮৯২ সালে বলেন যে জার্মান ঐতিহাসিক-মতবাদীরাও 'ল্যাজেফেয়ার' নীতির সর্বত্র প্রয়োগ যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেন নি।[১৩] রানাডের এই বক্তব্য যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে উদ্যোগ নিতে হবে তা পরবর্তীকালে ভারতীয় পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল।

তৎকালীন কংগ্রেস সদস্যরা দুঃখ করে বলতেন যে ইউরোপ বিক্রী করবে এবং এশিয়া কিনবে---এটাই একটা চিরন্তন ব্রিটিশ নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থা বদলানোর জন্য এবং স্বদেশী শিল্পকে উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের ডাকে তখন বার্ষিক শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজন শুরু করা হল। ১৯০১ সালের সপ্তদশ কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহারাজ যোগিন্দ্রনাথ রায় বলেছিলেন, "যে কোনও রাজনৈতিক প্রশ্নের পেছনে একটা অর্থনৈতিক প্রশ্ন লুকিয়ে আছে। পণ্য বিক্রয়ের বাজারই জাতির ভাগ্যনির্ণয়ের যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠবে।"[১৪] তিনি বলেন যে ভারতীয় রাজনৈতিক উদ্যোগের সাফল্য আসবে ভারতীয় শিল্পের পুনর্জাগরণ এবং উন্নয়নের মধ্য দিয়ে। এর পরের বছর কংগ্রেস সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন যে সরকার যদি সাহায্য নাও করে তাহলেও দেশের জনগণেরই উচিত ভারতীয় শিল্পকে রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তিনি বলেন যে আমাদের উচিত হবে "to avail ourselves, whenever practicable, of indigenous articles in preference to foreign goods."[১৫]

স্বদেশের পণ্য ক্রয় আন্দোলনকে সমর্থন করে সুরেন্দ্রনাথ বলেন যে রাজনৈতিক পরাধীনতার চেয়ে শিল্পে অসহায়তা অনেক বেশী দুঃখজনক।[১৬] ১৮৯০ সালেই রানাডে ঘোষণা করেছিলেন যে যদিও একটা দেশের উপর আর একটা দেশের রাজনৈতিক প্রভুত্ব অনেক বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু তার থেকেও অনেক মারাত্মক হল অর্থনৈতিক প্রভুত্ব, যা সমস্ত জাতীয়

উদ্যোগকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দিতে পারে। রানাডের এই উক্তি স্মরণ করে গোখলেও স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন।[১৭]

যদিও এই রকম অস্তিবাচক স্বদেশী আন্দোলন গোড়াতেই শুরু হয়েছিল তবু নেতিবাচক বিদেশী পণ্য বর্জন আন্দোলন শুরু হয় পরে, ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময়। বিলাতী পণ্য বর্জন করার পরামর্শ প্রথম দেন একজন নরমপন্থী নেতা,[১৮] কিন্তু পরে চরমপন্থীরা উৎসাহ সহকারে এই বিদেশী দ্রব্যবর্জন আন্দোলনকে (boycott movement) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন। ১৯০৫ সালে যদিও কংগ্রেস এই বর্জন আন্দোলনের সম্বন্ধে স্পষ্ট বক্তব্য রাখে নি,[১৯] তবুও পরের বছর ১৯০৬ সালে কংগ্রেস সাগ্রহে এই আন্দোলনকে সমর্থন করে।[২০]

যেহেতু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে ভারতীয় শিল্পের রক্ষণ সম্ভব ছিল না সেজন্য জাতীয়তাবাদীরা ও জাতীয় শিল্পপতিরা মনে করতেন যে রাজনৈতিক প্রভুত্বের থেকে অর্থনৈতিক প্রভুত্ব ভারতবর্ষের পক্ষে অনেক বেশী ক্ষতিকর হয়েছে[২১] এবং তাঁরা ঘোষণা করেন যে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বরাজের মধ্যে যদি বেছে নিতে হয় তাহলে তাঁরা অর্থনৈতিক স্বরাজই বেছে নেবেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সে সময় বলতেন যে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক শোষণ সাম্রাজ্যবাদের অবশ্যম্ভাবী ফল। যদিও এই বক্তব্যটা কংগ্রেস সভ্যদের সমাজবাদের দিকে কিছুটা আকৃষ্ট করেছিল, তবু এটা বলতেই হবে যে এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের আগে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে সমাজবাদের ধ্যান-ধারণা খুব কমই প্রসার লাভ করেছিল। এই সময়ে কেবলমাত্র অ্যানি বেশান্ত, লাজপত রায় এবং বিপিন পালের মত কিছু লোক মাঝে মাঝে সমাজবাদের কথা বলেছিলেন।

অ্যানি বেশান্ত ব্রিটেনের চার্লস ব্র্যাডল-র মত একজন মুক্ত চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রভাবে এসেছিলেন এবং পরে তিনি বার্নার্ড শ'র সঙ্গে ফেবিয়ান (Fabian) সমাজবাদেও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সমর্থন জানান অভিজাত সমাজবাদ যা অ্যানি বেশান্তের ভাষায় 'জ্ঞানিজনের শাসন' (aristocratic socialism), সংখ্যাধিক্যের নয়।[২২]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে লাজপত রায় ঘোষণা করেন যে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ লেবার পার্টির আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। তিনি তৎকালীন ইউরোপীয় সমাজ-ব্যবস্থাকে অবিবেকী দুষ্ট-চক্র বলে আখ্যা দেন এবং বলেন যে এর ভিত্তি হল অবিচার, অত্যাচার, শোষণ এবং শ্রেণীশাসন। লাজপত রায় বলেন যে এই সমাজ-ব্যবস্থা ভারতীয় আদর্শের পরিপন্থী।[২৩] তিনি স্বদেশবাসীকে সতর্ক করে দেন এই বলে যে ভারতবর্ষের প্রয়োজন হচ্ছে "not the power to implant in full force and in full vigour the expiring European system". তিনি দাবি করেন যে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার যে ব্যাধি সমাজবাদীরা বিশ্লেষণ করেছিলেন তা এতই সত্য যে "there is now practical unanimity among Western thinkers about the indescribable evils of the capitalist system "[২৪]

লাজপত রায় দুঃখ করে বলেন যে আমাদের দেশের জাতীয়তাবাদীরা

সামন্তপ্রথা ও শিল্পপতিদের অধিকারকে আক্রমণ করতে ভয় পাচ্ছে, আর তার ফলে জাতীয় সম্পদের বৃহদংশ কতিপয় স্বল্পসংখ্যক লোকের হাতেই থেকে যাচ্ছে।[২৫] তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে শুধুমাত্র বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলেই চলবে না, ভারতীয় পুঁজিবাদী এবং জমিদারেদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করতে হবে।

লাজপত রায় এবং বিপিন পালকে রুশবিপ্লব গভীরভাবে নাড়া দেয়। তাঁরা ব্রিটিশ শাসকদেয় এই বলে সাবধান করে দেন যে যদি যথার্থ প্রতিকার করার জন্য ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে রুশ দেশের মত ভারতবর্ষেও অগ্ন্যুৎপাত ঘটবে। মানবতাবোধ থেকে লাজপত রায় ও বিপিন পাল সমাজতান্ত্রিক মতবাদের দিকে কিছুটা এগিয়ে ছিলেন, কিন্তু তাঁদের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা সব সময় স্পষ্ট বা সুসমঞ্জস ছিল না। বস্তুতপক্ষে বিপিনচন্দ্র পাল মাঝে মাঝে 'হিন্দু সমাজবাদে'র মত এক অস্পষ্ট চিন্তাধারার কথাও বলেছিলেন। ১৯১৯ সালে লালা লাজপত রায় লিখেছিলেন, "আমরা জানি যে আমরা সমাজবাদের পতাকা এখনও উড়াতে পারি নি। আমরা সমাজবাদকে এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারি নি। তার কারণ, আমরা এই নিয়ে কখনও অধ্যয়ন করি নি।" বাস্তবিকই রুশ বিপ্লবের আগে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সংস্পর্শে বিশেষ আসে নি।

নেহেরু, সুভাষচন্দ্র ও সমাজতন্ত্র

এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ভারতবর্ষের সমস্যা কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাক্‌বিপ্লব রাশিয়ার সমস্যার সঙ্গে তুলনীয় ছিল। এই দুই দেশেই আধুনিক শিল্পায়নের সঙ্গে কৃষি-অর্থনীতি এবং কৃষকদের সামঞ্জস্যবিধান ঘটে নি। ব্যাপক অশিক্ষা সত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীতে এই দুই দেশেই কিছু পরিমাণ বুদ্ধিজীবী শ্রেণী গড়ে উঠেছিল এবং এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সরকারী আমলা-তন্ত্র ব্যবস্থার সঙ্গে দুই দেশেই সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। দুই দেশেই স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে এই বুদ্ধিজীবী সমাজ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল এবং বুদ্ধিজীবীদের কিয়দংশ আবার পাশ্চাত্য প্রভাব ও অতি আধুনিকীকরণের বিরুদ্ধেও আন্দোলন গড়ে তুলেছিল; যেমন, রাশিয়াতে টলস্টয় এবং ভারত-বর্ষে অনেকে। এই দুই দেশেই প্রাচীন ধর্মভিত্তিক কৃষক-সমাজের একটা বড় অংশ পাশ্চাত্য আধুনিকতাকে গ্রহণ করতে পারে নি।

রাশিয়ায় বিপ্লবের কয়েক বছরের মধ্যে শিল্পের প্রসার ঘটেছিল। অশিক্ষিত জনতার মধ্যে শিক্ষারও উল্লেখযোগ্য বিস্তার ঘটে। ভারতবর্ষের মতই অসংখ্য বর্ণজাতিসমন্বিত-সমাজ রাশিয়া, নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব কমিয়ে বিপ্লবোত্তর যুগে অধিকতর সামাজিক ঐক্য অর্জন করেছিল। এই সমুদয় সাফল্যই অবশিষ্ট পৃথিবীর কাছে এক বিস্ময়কর নিদর্শন স্থাপন করে। জওহরলাল নেহেরু ভারতবাসীদের এই বিস্ময়কর নিদর্শনের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে বলেন।[১]

নেহেরু তার স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য ১৯২৬ সালে যখন ইউরোপে যান তখন সেখানে তিনি বহু সমাজবাদী এবং সাম্যবাদীদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২৬ সালে তিনি ব্রাসেলসে 'কংগ্রেস অফ দি লীগ অফ অপ্রেস্‌ড্ পিপল্‌স্'-এর অধিবেশনে যোগদান করেন। তারপর ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে তিনি রুশ বিপ্লবের ১০ম জয়ন্তী উৎসবে যোগদান করার জন্য মস্কো যান। এই মস্কো ভ্রমণে নেহেরু যা দেখেন তা তাকে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি আকৃষ্ট করে। রাশিয়ার তৎকালীন শিক্ষার অগ্রগতি, নারী-সমাজের মুক্তি এবং কৃষক-সমাজের উন্নতি নেহেরুর মনে গভীরভাবে সাড়া জাগায় এবং এই কথা তিনি ১৯২৮ সালের 'সোভিয়েট রাশিয়া' নামক বইটিতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এই রুশ ভ্রমণের পর নেহেরুর দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে সোভিয়েট রাশিয়া এক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি এবং রাশিয়া ও ভারত-বর্ষ আরও কাছাকাছি আসবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার মাধ্যমে।[২]

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯২৯ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শ্রমিক সমাবেশে নেহেরু তাঁর সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করেন। ১৯৩৩ সালে লেখা "হুইদার ইণ্ডিয়া' পুস্তকে তিনি এই বিশ্বাসের কথা পুনর্বার ঘোষণা করেন এবং বলেন ভারতের সংগ্রাম ধনতন্ত্র এবং সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে এক বিশ্ব-সংগ্রামের অংশমাত্র। তিনি আরও বলেন, জাতীয়তাবাদই যথেষ্ট নয় এবং যথার্থ অর্থনৈতিক চিন্তার ভিত্তিতে সামাজিক বিপ্লব আনয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করাও অত্যাবশ্যক।[৩]

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শতক থেকে কংগ্রেসের ওপর মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব পড়ে। গান্ধী কংগ্রেসের জন্য যে অর্থনৈতিক কর্মপন্থা প্রণয়ন করে-ছিলেন তার ভিত্তি ছিল হাতে-চালানো তাঁত ও খাদির প্রসার এবং কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের পুনরুজ্জীবন। কংগ্রেসের অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক রূপ আসে আরও পরবর্তী কালে, প্রধানতঃ নেহেরুর নেতৃত্বে।

১৯৩১ সালে করাচী কংগ্রেসের যে মৌলিক অধিকার ও অর্থনীতি (Fundamental Rights and Economic Policy Resolution) বিষয়ক প্রস্তাব গৃহীত হয় তার রচনায় নেহেরুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে সমাজের অর্থনৈতিক জীবন গড়ে তুলতে হবে সামাজিক ন্যায়বিচারের ওপর এবং প্রত্যেক নাগরিককে সুস্থ জীবনযাপনের অধিকার দেওয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে কল-কারখানায় খেটে-খাওয়া মজদুরদের স্বার্থ রক্ষা করা যাতে তারা জীবন-ধারণের উপযুক্ত বেতন ও সুস্থ পরিবেশ পান, তাঁদের পরিশ্রমের সময় আইনানুগ সীমিত হয় এবং বার্ধক্য ও ব্যাধির সময় তাঁরা সহায়তা পান। অন্যদিকে রাষ্ট্রকে কৃষি-জমির মালিকানা ও কর-ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে যাতে ছোট কৃষকেরা উপকৃত হন। এ ছাড়াও এই প্রস্তাবে বলা হয় যে মৌলিক শিল্প, খনিজ সম্পদ, রেলপথ, জলপথ, জাহাজ ও অন্যান্য সাধারণ পরিবহণ-ব্যবস্থা রাষ্ট্রের মালিকানাধীন থাকবে।

যদিও ১৯৩১ সালে করাচীতে কংগ্রেস একটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কর্মসূচী ও শিল্প-শ্রমিক সম্বন্ধে নীতি গ্রহণ করে, এর আগে থেকেই শ্রমিকসমস্যা সম্বন্ধে কংগ্রেস আগ্রহী ছিল এবং কিছু প্রস্তাবও পাশ করেছিল। ১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেস ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার মাধ্যমে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে সমর্থন জানায়।[৪] অখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে শিল্পে এবং কৃষিতে নিযুক্ত কর্মীদের সংগঠিত করতে সাহায্য করার জন্য ১৯২২ সালে গয়াতে কংগ্রেস একটি কমিটি গঠন করে।[৫] ১৯২২ সালের কংগ্রেস-সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ বললেন যে তিনি স্বরাজ চান দেশের অসংখ্য শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য, স্বল্পসংখ্যক বিত্তবান শ্রেণীর জন্য নয়। ১৯২৭ সালের মে মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কংগ্রেস কার্যকরী পরিষদকে গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের শ্রমিক সংগঠন বিষয়ে মনোনিবেশ করতে নির্দেশ দিয়েছিল। আর ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেস 'ট্রেড ডিসপিউট্স বিল'এর কয়েকটি ধারার প্রতিবাদ করে এই বলে যে তাতে শ্রমিকরা তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন।[৬]

১৯২৯ সালে অখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন নেহেরু এবং সেখানে তিনি শ্রমিকশ্রেণীকে কংগ্রেসের কাছাকাছি নিয়ে আসার ও কংগ্রেসকে সমাজবাদী রূপ দেবার আশা প্রকাশ করেন।[৭] সমাজতন্ত্রে নেহেরুর বিশ্বাস ছিল অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ভিত্তিতে, শুধুমাত্র মানবিকতার জন্য নয়। গান্ধী এবং কিছু কংগ্রেস নেতা সমাজতন্ত্রকে শুধুমাত্র একটা মানবিক অর্থে ব্যবহার করছিলেন—এই বলে ১৯৩৪ সালের ১৩ই আগস্ট নেহেরু গান্ধীকে একটি চিঠি লেখেন এবং বলেন যে

সমাজতন্ত্রের ইংরেজী ভাষায় একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা আছে। গান্ধী উত্তরে লেখেন, "I have looked up the dictionary meaning of socialism. It takes me no further than where I was before I read the definition What will you have me to read to know its full content ?".

সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে নেহেরু ভারতবর্ষের একজন ভাবী প্রধানমন্ত্রী তাঁর কন্যাকে ১৯৩৩ সালে লিখেছিলেন, "Socialism I have told you is of many kinds. There is general agreement, however, what it aims at the 'control by the State' of the means of production ; that is, lands and mines and factories and the like, and the means of distribution, like railways etc. and also banks and similar institutions. The idea is that the individual should not be allowed to exploit any of these methods, institutions, or the labour of others, for their own personal advantage."[৮]

১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র বসু নেহেরুকে socialism এবং individualism সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট মতামত রাখতে অনুরোধ করলে নেহেরু বলেন, "আমি সমাজতন্ত্রবাদী না ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী? এই দুটি শব্দে সত্যিই কি কিছু মৌলিক দ্বন্দ্ব আছে? আমার মনে হয় আমি মেজাজ ও শিক্ষার দিক থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, বুদ্ধি ও মানসিকতার দিক দিয়ে সমাজতন্ত্রবাদী. আমি আশা করি, সমাজতন্ত্র ব্যক্তিস্বতন্ত্র্যকে হত্যা করে না! আমার সমাজতন্ত্রের দিকে আকর্ষণের কারণ হল এই ব্যবস্থা অসংখ্য ব্যক্তি-মানুষকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শৃঙ্খলমুক্ত করবে।" ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও সমাজতন্ত্রের বিশ্বাসের এই সংমিশ্রণই পরবর্তী কালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নেহেরুকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রজ্ঞাপরিমিতি মেনে নিতে সাহায্য করে।

১৯৩৬ সালে কংগ্রেস সভাপতির ভাষণে নেহেরু বলেন যে পৃথিবী দুটি বিরাট ভাগে বিভক্ত হয়েছে; একদিকে সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্টরা আর অন্যদিকে সমাজতন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদীরা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রাম স্বভাবতঃই তাকে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসি-বিরোধী প্রগতিশীল শক্তিগুলির সঙ্গে যুক্ত করছে। "Capitalism in its difficulties took to fascism. Fascism and imperialism thus stand out as the two faces of the decaying capitalism . Socialism in the West and the rising nationalism in the Eastern and other dependent countries opposed this combination of fascism and imperialism."[৯]

নেহেরু উপলব্ধি করেছিলেন যে এই সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাস তাঁকে একটি জাতীয়তাবাদী সংগঠনের সভাপতি হিসেবে কিছু মতদ্বৈধের মধ্যে নিয়ে যেতে পারে। তিনি এও বলেছিলেন, হয়ত সমাজতান্ত্রিক নীতির সমর্থন সেই কালের কংগ্রেস সভাপতির স্বাভাবিক ক্ষেত্রের কিছুটা বাইরে। তবু তিনি চেয়েছিলেন যে কংগ্রেস সভ্যরা তাঁর সত্যিকারের মতামত সম্বন্ধে

সম্পূর্ণ অবহিত হন। তিনি তাই প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেন, পৃথিবীর এবং ভারতের সমস্যার যে একমাত্র সমাধান সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এ-বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। দারিদ্র্য, ব্যাপক বেকারী ও ভারতীয় জনগণের পরাধীনতার মুক্তির পথ সমাজতন্ত্র ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে আসতে পারে না।

কংগ্রেসের পক্ষে সে সময়ে পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী নেওয়া সম্ভব হবে না নেহেরু তা জানতেন, কিন্তু তিনি এ ঘোষণাও করেছিলেন যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আসবেই, কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না। তিনি বলেছিলেন, "But we must realise that the philosophy of socialism has gradually permeated the entire structure of society the world over and almost the only point of dispute are the pace and methods of advance to its full realisation India will have to go that way too."[১০]

১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে নেহেরু কার্যকরী পরিষদে তিনজন সমাজবাদীকে অন্তর্ভুক্ত করলেন। তাঁরা হলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, নরেন্দ্র দেব এবং অচ্যুত পটবর্ধন। এই তিনজন সদস্য ও নেহেরু সমাজবাদের কথা প্রচার করতে থাকেন। কিন্তু তাতে কংগ্রেসের ভেতর এক সঙ্কট দেখা দেয়। ১৯৩৮ সালের জুন মাসে কার্যকরী পরিষদের সাত জন সভ্য—রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজাগোপালাচারী, কৃপালনী এবং আরও চার জন অভিযোগ করলেন যে কংগ্রেস যখন সমাজতন্ত্রকে তার লক্ষ্য বলে স্বীকার করে নি তখন তার সভাপতি সমাজতন্ত্র প্রচার করে সাধারণ সভ্যদের কথা না বলে শুধুমাত্র একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মুখপাত্র হয়ে উঠেছেন। এই কারণে তাঁরা পদত্যাগ করতেও চেয়েছিলেন।[১১] অবশ্য এই মতভেদ কংগ্রেসে কোন ভাঙন ধরায় নি, গান্ধীর মধ্যস্থতায় এর একটা মীমাংসা হয়ে যায়।

ত্রিশ দশকের জাতীয়তাবাদী যুব-শক্তির দুই প্রিয় নেতা—নেহেরু এবং সুভাষ বসু—দুজনেই সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু সুভাষ ছিলেন মানবতাবাদী সমাজতান্ত্রিক আর নেহেরু দাবি করতেন যে তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক। সুভাষের কাছে সমাজতন্ত্রের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল এর দারিদ্র্যমুক্তির শপথ এবং এই দিক থেকে তাঁর কাছে সমাজতন্ত্র ইউরোপ থেকে আমদানী কিছু নূতন জিনিস ছিল না। তাঁর কাছে সমাজতন্ত্র স্বামী বিবেকানন্দের 'দরিদ্র নারায়ণ' সেবার পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ। ১৯২৯ সালে তিনি বলেছিলেন যে সমাজতন্ত্র কার্ল মার্কসের বইতেই জন্ম নেয় নি। এর মূল ছিল ভারবর্ষের চিন্তা ও সংস্কৃতিতে, "The gospel of democracy that was preached by Swami Vivekananda has manifested itself fully in the writings and achievement of Deshabandhu Das, who said that Narayana lives amongst those who till the land, prepare our bread by the sweat of their brow. The idea of socialism is not a novelty in this country. We regard it as such because we have lost the

thread of our own history," তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন যে এ কথা ভুললে চলবে না যে, কার্ল মার্কসের আদি শিষ্যরা রাশিয়াতে মার্কসকে অন্ধ অনুসরণ করেন নি এবং রুশ অর্থনীতিতে সম্পত্তির ও কলকারখানার কিছু পরিমাণে ব্যক্তিগত মালিকানা মেনে নেওয়া হয়েছে।[১২]

১৯৩১ সালে সুভাষচন্দ্র নেহেরুর মতই বলেন যে ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর মুক্তি নিঃসন্দেহেই আসবে সমাজতান্ত্রিক পথে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের নিজস্ব সমাজতন্ত্র গড়ে উঠুক তার নিজের ভূগোল ও ইতিহাসের ভিত্তিতে, যে সমাজতন্ত্র ভারতবর্ষে একটা স্বকীয় নূতন রূপ নেবে।[১৩] শুধু তাই নয়, তিনি চাইলেন যে এই সমাজতন্ত্রের মধ্যে সাম্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের সমন্বয় ঘটুক। তিনি মনে করতেন, সাম্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে---রাষ্ট্র যে ব্যক্তির ঊর্ধ্বে এই বিশ্বাসে, সংসদীয় গণতন্ত্র সম্বন্ধে অবিশ্বাসে, রাজনৈতিক দলের একনায়কত্বে কঠোর হস্তে বৈরী সংখ্যালঘুর দমনে এবং পরিকল্পনাভিত্তিক জাতীয় শিল্পের পুনর্গঠনে। এই সূত্র ধরে তিনি ভারতবর্ষে এক সমন্বয়-সাধিত সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।[১৪] কিন্তু নেহেরু এই মত-বাদকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন,[১৫] কারণ ফ্যাসিবাদের তিনি পুরোপুরি বিরোধী ছিলেন।

নেহেরু এবং সুভাষচন্দ্র দুজনেই 'কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি'র প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানান। ১৯৩৮ সালে হরিপুর কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেন যে যদিও তিনি ঐ দলের সভ্য নন তাহলেও কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দলের মতামতের সঙ্গে সাধারণভাবে তিনি একমত এবং তিনি মনে করেন যে দেশের বামপন্থী অংশের একটি দলের মধ্যে সংগঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তিনি বলেন, "Socialism is not an immediate problem for us, nevertheless socialist propaganda can be conducted by a party like the Congress Socialist Party which stand for and believe in socialism"[১৬]

সুভাষচন্দ্র এবং নেহেরু দুজনেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় বিশ্বাসী ছিলেন। সুভাষ তাঁর 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' (Indian Struggle) নামক গ্রন্থে এমন একটি বামপন্থী দলের কল্পনা করেছিলেন যে-দল দেশে কৃষি এবং শিল্পের পুনর্গঠনের জন্য রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দাবি তুলে ধরবে।[১৭] নেহেরুও মনে করতেন, ভারতবর্ষের মত দেশে পরিকল্পনা বিশেষ প্রয়োজনীয়।[১৮]

১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে নেহেরুর নেতৃত্বে একটি জাতীয় পরিকল্পনা পরিষদ্ গঠন করেন। নেহেরু এই পরিষদের আলোচনায় অত্যন্ত সক্রিয় অংশ নিতেন। এই পরিষদের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি পরিকল্পনার প্রণয়ন করা যাতে ভারতবর্ষ দশ বৎসরের মধ্যে স্বয়ম্ভর হতে পারে এবং যার ফলে জীবনযাত্রার সাধারণ মান দ্বিগুণ হতে পারে। এই পরিষদ্ চান যে প্রতিরক্ষা, মূল শিল্প এবং জনগণের অত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রের মালিকানায় অথবা নিয়ন্ত্রণাধীনে আসবে। ১৯৩৯ সালের জুন মাসে এই পরিষদের কাছে দেওয়া এক স্মারকলিপিতে নেহেরু

বললেন, যেহেতু কংগ্রেসের আদর্শ হল ভারতে একটি পূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্থাপনা, সুতরাং এ মেনে নিতেই হবে যে অর্থনৈতিক সাম্যভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায়ও কংগ্রেস অঙ্গীকৃত। ১৯৪২ সালে কংগ্রেস যখন 'ভারতে ছাড়ো' আন্দোলন শুরু করে, তখন এই পরিষদের কাজ অবশ্য মধ্যপথে থেমে যায়।

নেহেরুর তাঁর আত্মজীবনীতে (১৯৩৬) লেখেন, "Our final aim can only be a classless society with equal economic justice and opportunity for all. Everything that comes in the way will have to be removed gently if possible, forcibly if necessary. And there seems to be little doubt that coercion will often be necessary".

নেহেরু এই কথাগুলিকে কমিউনিস্টরা স্বাগত জানায় ও অভিনন্দিত করেন। যদিও নেহেরু প্রয়োজনে বলপ্রয়োগের কথা বলেছেন, তিনি কখনও পুরোপুরি কমিউনিস্ট নীতি মেনে নেন নি। আত্মজীবনীতেই নেহেরুর বিভিন্ন বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে তাঁর চিন্তার মূল কিছুটা ঊনবিংশ শতাব্দীর মুক্ত মানবতাবাদের ঐতিহ্যে নিহিত ছিল এবং তা থেকে তিনি কোনো সময়ই সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হন নি। তিনি নিজেই লিখেছিলেন, "This bourgeois background follows me about and is naturally a source of irritation to many communists".

গোড়া থেকেই কমিউনিস্টদের বলপ্রয়োগ-কৌশল সম্বন্ধে নেহেরু আস্থাহীন ছিলেন। পরবর্তী কালে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং গান্ধীর প্রভাবে তার এই আস্থাহীনতা আরও বেড়ে গিয়েছিল। প্রথমজীবনে যে পাশ্চাত্য মুক্ত গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের মধ্যে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন সেই ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে এবং পরে গান্ধীর প্রভাবে নেহেরু কমিউনিজমের বলপ্রয়োগের নীতি সম্বন্ধে সবিশেষ সন্দিহান হয়ে ওঠেন। আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নীতি তিনি একেবারেই অনুমোদন করতে পারেন নি এবং বিশেস করে ১৯৪২ সালে কংগ্রেস যখন 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল সেই সময়ে কমিউনিস্টরা ব্রিটিশ যুদ্ধপ্রয়াসে সহায়তার যে ভূমিকা নিয়েছিল, নেহেরু বিশেষভাবে তার সমালোচনা করেন। তিনি মনে করতেন যে এইসব নীতি অনুসরণ করার জন্যই কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনমত গড়ে উঠছিল। ১৯৪৫ সালে কংগ্রেসের যে বিশেষ কমিটি কমিউনিস্টদের দল থেকে বহিষ্কারের প্রস্তাব দেয় তার একজন সভ্য ছিলেন নেহেরু নিজে।

মানবেন্দ্রনাথ ও কমিউনিজম

প্রথম দিকের ভারতীয় কমিউনিস্টদের মধ্যে অন্যতম হলেন মানবেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭--১৯৫৪)। মানবেন্দ্র রায়ের জীবনকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। ১৯১৯ সাল পর্যন্ত প্রথম পর্যায়---বাঙলার সন্ত্রাসবাদ ও বৈপ্লবিক আন্দোলনে সহায়তার জন্য এই সময় পর্যন্ত তিনি জাতীয় বিপ্লবী হিসেবে গুপ্তপথে অস্ত্র ও অর্থ আমদানীর কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তারপর শুরু হয় তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়---এ সময়ে তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা। তাঁর কর্মক্ষেত্র প্রথমে মেক্সিকো, তারপর রাশিয়া, চীন ও শেষে ভারতবর্ষ। তৃতীয়, অর্থাৎ জীবনের শেষ পর্যায়ে মানবেন্দ্রনাথের ভূমিকা র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট হিসেবে। এখন তিনি মার্কস্‌বাদকে ত্যাগ করে এক ধরনের উদারনৈতিক মানবতাবাদের অনুরক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

ছাত্রাবস্থাতেও মানবেন্দ্রনাথ বিপ্লবী ছিলেন। এই সময়ে তিনি বিপ্লবী যুগান্তর গোষ্ঠীর প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯১০ সালে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর কারাদণ্ড হয়। তারপরই কলকাতার বিখ্যাত রাজনৈতিক ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ১৯১৫ সালে তিনি আবার গ্রেপ্তার হন।

১৯১৫ সালেই মানবেন্দ্রনাথ ব্রিটিশ ভারত থেকে পালিয়ে ডাচ ইণ্ডিজে পৌছান। জাভাতে তিনি জার্মান প্রতিনিধির সঙ্গে চুক্তি করে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের প্রয়োজনে অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর ব্যবস্থা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। তখন তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পথে পা বাড়ালেন ও সেখান থেকে পৌছালেন মেক্সিকোতে। সেটা ১৯১৯ সালের কথা। এখানেই তিনি নাম নিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়; তাঁর আসল নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

মেক্সিকোতে তিনি মার্ক্সবাদে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। এখানে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হল প্রখ্যাত রুশ কমিউনিস্ট নেতা মাইকেল বরোদিনের সঙ্গে। পরে মানবেন্দ্রনাথ কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগদানের জন্য রাশিয়াতে আমন্ত্রিত হন। মানবেন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদী হিসেবে মেক্সিকোতে পৌছেছিলেন আর মেক্সিকো ত্যাগ করলেন একজন পাকা মার্ক্সবাদী হিসেবে। মানবেন্দ্রনাথ তাঁর 'স্মৃতিচিন্তায়' লিখেছেন, "আমি আমার পুনর্জন্মের দেশ (মেক্সিকো) ত্যাগ করে এলাম। নূতন বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে একজন বুদ্ধিজীবী মুক্তপুরুষ হিসেবে এখন আমি আর বিশ্বাস করি না যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার ব্যতিরেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোন সার্থকতা আছে। আমি বুঝতে পারলাম যে ঐতিহ্যগত সংসার থেকে বন্ধনমুক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীনতাই হচ্ছে প্রকৃত কার্যকরী সামাজিক মুক্তির পথ।"[১]

১৯২০ সালে রাশিয়ার উগ্রপন্থী ও চরম জাতীয়তাবাদী মানবেন্দ্রনাথ বললেন যে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশে কমিউনিস্টদের আপোষহীন নীতি গ্রহণ করতে হবে। লেনিন অবশ্য বলেছিলেন যে

ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে কমিউনিস্টদের কোন সংঘর্ষের মধ্যে না গিয়ে, স্বাধীনতা-কামী জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের সঙ্গে সহযোগিতা করাই কর্তব্য। এ ছাড়াও জাতীয় অন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথ ও লেনিনের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা গেল। ভারতের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লেনিন মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকাকে প্রগতিবাদী ভূমিকা বলে মনে করতেন। পক্ষান্তরে, মানবেন্দ্রনাথের মতে মহাত্মা গান্ধী একজন মধ্যযুগীয় প্রতিক্রিয়াশীল নেতা ছাড়া আর কিছু নন। মানবেন্দ্রনাথের এই মনোভাব প্রথম যুগে ভারতীয় কমিউনিস্টদের অনুপ্রাণিত করেছিল কিন্তু পরবর্তী যুগে এই 'বাম ভেদনীতির' মনোভাবের জন্য তারা মানবেন্দ্রনাথের বিরোধিতা করে।[২]

ভারতে মানবেন্দ্রনাথ ছিলেন চরমপন্থী। ভারতের মধ্যপন্থী নেতৃত্বে যাঁরা শ্রেণীগতভাবে ছিলেন জাতীয় বুর্জোয়া, তাঁদের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। যাঁরা ভারতীয় বুর্জোয়াদের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে সুযোগ-সুবিধার প্রার্থী মাত্র, সেই সব মধ্যপন্থী ও উদারপন্থীর সঙ্গে কমিউনিস্টদের সহযোগিতার নীতিতে মানবেন্দ্রনাথ কিছুতেই সায় দিতে পারেন নি।

তাছাড়া ভারতের উদারপন্থী ও মধ্যপন্থীদের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের কোন যোগাযোগই ছিল না। যদি কমিনটার্ন মনে করে থাকেন যে ভারতের মধ্যপন্থী ও উদারপন্থীরা প্রগতিশীল নীতি অনুসরণ করেছেন এবং তাঁদের সমর্থন করাই সমীচীন, তাহলে মানবেন্দ্রনাথের চেয়ে তাঁদের উচিত ছিল বার্লিনে ভারতীয়দের বিপ্লবী নেতা বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে কমিনটার্নের সংযোগ স্থাপন করার উপযুক্ত লোক হিসেবে বেছে নেওয়া। তাঁর মানসিকতা ও বিশ্বাসমত মানবেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন কমিনটার্ন আপোষহীন চরমপন্থাকেই সমর্থন করুক, আর তা করলে কমিনটার্নের পক্ষে বীরেন্দ্রনাথের চেয়ে মানবেন্দ্রনাথই অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তি হতেন।

দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিন সংগ্রামী জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে সহ-যোগিতার যে প্রস্তাব রেখেছিলেন তা অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও এই প্রস্তাবের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের আপোষবিরোধী অতিরিক্ত প্রস্তাবটিও লেনিনেরই অনুরোধে গৃহীত হয়। অবশ্য দ্বিতীয় কংগ্রেস শেষ হবার পর লেনিন বা অন্য কেউ মানবেন্দ্রনাথের এ প্রস্তাব সম্পর্কে আর কোন উচ্চবাচ্য করেন নি। এই সময়ে কমিনটার্ন চেয়েছিলেন কমিউনিস্টরা ভারতের স্বাধীনতাকামী জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে সহযোগিতাই করুক, বিরোধিতা নয়।

ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন সংগঠিত করতে কমিনটার্ন মানবেন্দ্র-নাথকেই মনোনীত করলেন। তিনি তাসখন্দে উপস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন ও তাদের কমিউনিস্ট ইউনিভার্সিটি 'টয়েলারস অব দি ঈস্ট'-এ ভর্তি করিয়ে দিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯২১ সালে প্রথম মস্কোতে স্থাপিত হয়েছিল। মানবেন্দ্রনাথ ভারতে

এস. এ. ডাঙ্গে ও অন্যান্য চরমপন্থীদের সঙ্গেও সংযোগ স্থাপন করলেন।

মানবেন্দ্রনাথ ভারত সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করেন ও লেনিনের পরামর্শমত রিপোর্টটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। অবনী মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় পুস্তকটি লিখিত হয় ও ১৯২২ সালে 'ইণ্ডিয়া ইন ট্রাঞ্জিশন' নামে তা প্রকাশিত হয়। ব্রিটিশের বিচারশক্তির ওপর মধ্য-পন্থীদের আস্থাকে এই পুস্তকে মানবেন্দ্রনাথ কঠোর সমালোচনা করেন ও ভারতীয় বুর্জোয়াদের হাতিয়ার বলেই তিনি তাদের অভিহিত করেন। মানবেন্দ্রনাথ আবার চরমপন্থীদেরও উপহাস করতেন, যেহেতু তাঁরা ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে এনেছিলেন। মানবেন্দ্রনাথের মতে এটা ছিল তাঁদের মধ্য-যুগীয় পুনর্জাগরণবাদে বিশ্বাসেরই প্রমাণ। মানবেন্দ্রনাথের মতে ভারতীয় পরিস্থিতির একমাত্র সমাধান সম্ভব মার্ক্সীয় দর্শন ও মতবাদ গ্রহণে। ১৮৯০ সালের বোম্বাইয়ের ধর্মঘট, ১৯০৬ সালের রেল কর্মচারী ধর্মঘট এবং ১৯০৭ সালের কলিকাতা জুট মিলের ধর্মঘট উল্লেখ করে মানবেন্দ্রনাথ বললেন যে ভারতের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম বিক্ষুব্ধ শ্রেণী-সংগ্রামের পাশাপাশি চলেছে।

'ইণ্ডিয়া ইন ট্রাঞ্জিশন'-এ মানবেন্দ্রনাথ বলেছেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদীরা ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে সুযোগ-সুবিধা দিতে শুরু করেছে। তাই এই বুর্জোয়াশ্রেণী ব্রিটিশের সহযোগিতা খুঁজছে। তবে তাঁরা এও বুঝেছিলেন যে ব্রিটিশের সঙ্গে শর্তবিহীন সহযোগিতা করলে তারা ভারত-বাসীর সমর্থন খুইয়ে ফেলবে এবং তাহলে ব্রিটিশের কাছ থেকে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা পেতেও তারা অসমর্থ হবে। গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রতি এবং জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা সম্বন্ধে মানবেন্দ্রনাথের বিশেষ আস্থা ছিল না। তাই তিনি লিখেছিলেন, "গান্ধীবাদের অগ্রগতি প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তিহীনতার প্রমাণ এবং রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে তারা ভবিষ্যতে একেবারে অবলুপ্তই হয়ে যাবে।"[৩]

সে সময় ভারতীয় বিপ্লবীদের কেন্দ্রভূমি ছিল বার্লিন। ভারতীয় বিপ্লবীদের সংগঠিত করে কমিউনিজমের দিকে পরিচালনা করার জন্য মানবেন্দ্রনাথ তাঁর প্রধান কার্যালয় তাই স্থানান্তরিত করলেন বার্লিনে ১৯২২ সালে। তিনি 'দি ভ্যানগার্ড অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' নামে একটি ইংরেজী সাময়িকীও প্রকাশ করতে শুরু করলেন। পরে এই সাময়িকীর নাম 'এ্যাডভান্স' এবং আরও পরে 'ভ্যানগার্ড' হয়। ভারতীয় নাবিকদের সহায়তায় তিনি এই পত্রিকা ভারতে পাঠাতে শুরু করেন এবং এই পত্রিকার দ্বারা কলিকাতার অমৃতবাজার পত্রিকা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিল।

১৯২২-সালের শেষাশেষি মানবেন্দ্রনাথ "India's Problem and its Solution." গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। তাতে ১৯২১-এর আমেদাবাদ কংগ্রেসের কার্যাবলীর উল্লেখ করে তিনি কংগ্রেসের নীতিকে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া নেতৃত্বের দ্বারা বিপ্লবী শক্তির বিশ্বাসঘাতকতা করার প্রয়াস বলে অভিহিত করেন। তবে মানবেন্দ্রনাথ এইটুকু স্বীকার করেন যে মধ্যপন্থী কংগ্রেসীদের সাংগঠনিক বিক্ষোভের বিকল্প হিসেবে গান্ধী অহিংস

আন্দোলনের পত্তন করে কংগ্রেসের সমর্থনে স্বতঃস্ফূর্ত গণ-অসন্তোষ সংগঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং গান্ধী তাই প্রায় রাতারাতি দলের নেতৃত্ব-পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কিন্তু মানবেন্দ্রনাথ এই বলে অভিযোগও করলেন যে গান্ধীজীর প্রচারিত ধর্মীয় নীতিবাদ জনসাধারণের মধ্যযুগীয় মনোভাবকেই প্রশ্রয় দিয়েছে এবং বিপ্লবী গণ-জাগরণের ধারাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। তাঁর 'Memoirs'-এ মানবেন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমি অবস্থার চরম পর্যায় বিশ্লেষণ করে যা বুঝেছিলাম তা হচ্ছে এই যে জাতীয় প্রতি-ক্রিয়াশীল মতবাদই বিপ্লবী আন্দোলনের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত হতে দিচ্ছে না।"[৪]

মানবেন্দ্রনাথের মতে নিম্ন-মধ্যবিত্তশ্রেণীর মতবাদই ১৯২২-এর অসহযোগ আন্দোলনের প্রেরণা জুগিয়েছিল, আর এতে কোন বিপ্লবী কর্ম-সূচীই ছিল না। অসহযোগ আন্দোলনের পরিবর্তে মানবেন্দ্রনাথ গণ-ধর্মঘট ও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করতে জনগণকে আহ্বান জানালেন। তিনি চেয়েছিলেন যে জনসাধারণ রাজনৈতিক সচেতনতা নিয়ে বিপ্লবের পথে অগ্রসর হোক এবং শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্বের পূর্ণ সমর্থন জানাক। মানবেন্দ্র-নাথ অভিযোগ করেন যে বৃহৎ পুঁজিপতিদের কাছ থেকে কংগ্রেস অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করছে এবং তাই কংগ্রেস শ্রমিক ও কৃষকের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর মতে জমিদারশ্রেণী তাঁদের নিজেদের স্বার্থেই গান্ধীজীর ধর্মীয় নীতিবাদকে ও ট্রাস্টিশীপ মতবাদকে স্বাগত জানান। অনুরূপভাবে বিত্তশালী সম্প্রদায় গান্ধীজীর মতবাদকে স্বাগত জানায় এই কারণে যে গান্ধীবাদ অনুসারে মালিকপক্ষকে শোষকশ্রেণী না ভেবে শ্রমিকদের তাদের বড়ভাই হিসেবেই ভাবা উচিত।[৫]

১৯২২ সালের আগস্টে মানবেন্দ্রনাথ গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টিকে অনুরোধ করেন যে কলিকাতায় কমিউনিস্ট আন্দোলন পরিচালনা করতে তাঁরা যেন দু'জন ইউরোপীয়কে পাঠান। কমিনটার্ন থেকে যে অর্থ পাচ্ছিলেন তাই থেকে মানবেন্দ্রনাথ এই দু'জন কমিউনিস্ট প্রতিনিধির খরচ বহন করতে সম্মত হন। গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি চার্লস আসলেকে পাঠালেন—যিনি আমেরিকায় পূর্বে কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আস্‌লের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ১৯২২-এর ১১শে সেপ্টেম্বর তাঁর বোম্বাইয়ে আসার পর থেকেই তাঁকে চোখে চোখে রাখে এবং পরে তাঁকে ব্রিটেনে নির্বাসিত করে দেয়।

১৯২২ সালে বার্লিন থেকে প্রকাশিত সাময়িকীগুলিতে মানবেন্দ্রনাথ ক্রমাগত লিখতে থাকেন কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা করতে ভারতীয় বিপ্লবীদের কোন্ পথ অবলম্বন করতে হবে। তিনি চেয়েছিলেন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ভেতর কমিউনিস্ট মতবাদে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিরা একটি বিরোধী গোষ্ঠী গড়ে তুলুক। এই গোষ্ঠী ব্যাপক প্রচার-অভিযান চালিয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ব্যাপকতর ও শক্তিশালী করে তুলবে এবং ভবিষ্যতে কংগ্রেস সংগঠনের সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করবে।

১৯২২ সালের ২রা নভেম্বর এস. এ. ডাঙ্গেকে মানবেন্দ্রনাথ একটি পত্র দেন। পরে সেই পত্রটি কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় প্রকাশ হয়ে পড়ে।

এই পত্রে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে সমস্ত বিপ্লবী দলের সদস্যদের নিয়ে গণভিত্তিক একটি দল গড়ে তোলা হোক, তবে এই দল নিজেকে প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট পার্টি বলে ঘোষণা করবে না, যদিও কয়েকজন সাচ্চা কমিউনিস্ট সদস্য নিয়ে গড়ে-ওঠা অভ্যন্তরীণ একটি বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টিই এই প্রকাশ্য দলটিকে চালাবে। গণভিত্তিক এই বড় দলটি কংগ্রেস সংগঠনের ভেতর একটি বিরোধী দল হিসেবে কাজ করবে এবং ভবিষ্যতে কংগ্রেস সংগঠনের সমস্ত ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবে।

মানবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, চিত্তরঞ্জন দাশ, সম্পূর্ণানন্দ এবং সিংগারাভেলু চেট্টিয়ারের মত সাংসারাষ্ট কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই কংগ্রেস নীতিকে আরও সক্রিয়ভাবে বামপন্থী করে তুলতে সমর্থ হবেন। চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর কিছু বক্তৃতায় ঘোষণা করেছিলেন যে স্বরাজ আনতে হবে জনসাধারণের জন্য, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য নয়। ১৯২২-এর ৯ই নভেম্বর চিত্তরঞ্জন দাশ বললেন, "নরমপন্থীরা বিপ্লবকে ভয় পায়। বিপ্লব কি? বিপ্লব বলতে বুঝি আগাগোড়া একটা পরিবর্তন এবং আমরা সেটাই চাই। আমি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে অসহযোগ আন্দোলনের আমাদের অধিকাংশ সতীর্থ সংসদীয় সরকারেরই পক্ষপাতী। কিন্তু আমি এমন ধরনের স্বরাজ চাই না যাতে শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুবিধা হবে; আমি চাই সেই স্বরাজ যা কোন ক্ষুদ্র শ্রেণীর জন্য নয়, যে স্বরাজ সকলের, জনসাধারণের। আমি বুর্জোয়াদের তোয়াক্কা করি না। তারা তো সংখ্যায় অতি নগণ্য।"[৬]

মানবেন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন যে ১৯২২-এর গয়া অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে চিত্তরঞ্জন কংগ্রেস নীতির সক্রিয় বামপন্থী রূপান্তর ঘটাতে পারবেন। এই অধিবেশনে কমিনটার্ন এক বাণী পাঠায়। তাতে বলা হয়, "ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল শক্তি ও হিংসার মাধ্যমে এবং তার ওপরই এই শাসন এখনও প্রতিষ্ঠিত। তাই এই শাসনের উচ্ছেদ সম্ভব একমাত্র বিপ্লবের পথে। আমরা হিংসার পথ অবলম্বনের পক্ষপাতী নই। তবে আত্মরক্ষার জন্য ভারতের জনগণ অবশ্যই হিংসার পথ অবলম্বন করতে পারেন এবং তা না করলে হিংসার ওপর ভিত্তি করে যে বিদেশী শাসন-ব্যবস্থার পত্তন হয়েছে তার উচ্ছেদ হবে না। ভারতের জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নতি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ ভিন্ন সম্ভব নয়। বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্যই হবে এই শাসনের উচ্ছেদসাধন এবং তা কেবলমাত্র আলোচনা বা অহিংসার মাধ্যমে হবে না।"[৭]

একদিকে কমিনটার্ন ঘোষণা করল যে সহিংস বিদ্রোহ ছাড়া ব্রিটিশ-রাজকে উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়; অন্যদিকে গান্ধীজী ঘোষণা করলেন যে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পথ অনুসরণ করে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানো সম্ভব। মানবেন্দ্রনাথ গান্ধীজীর এই অহিংস নীতিকে তীব্র বিদ্রূপের চোখে দেখতেন। ১৯২২-এর ডিসেম্বরে তিনি বলেছিলেন, "আমরা বারবার বলেছি এবং এখনও বলছি যে ঠিকমত প্রস্তুত না হয়ে হিংসার পথ নিলে শত্রুর হাতই শক্তিশালী করা হবে। তবে এটাও

অবিসংবাদী সত্য যে অহিংসার মাধ্যমে বিপ্লব সম্ভব নয়। অহিংসা বিপ্লব-বিরোধী মনোভাবের সঙ্গেই যুক্ত। যারা ভারতে বিপ্লব চায় না তারা অহিংস পন্থায় বিশ্বাস রাখতে পারে। পুরোপুরি অহিংস পথ হল সাংবিধানিক পথ আর কেবলমাত্র সাংবিধানিক পন্থায় পৃথিবীতে কখনও বিপ্লব আসে নি।"[৮]

১৯২২ সালে চৌরিচৌরাতে সহিংস ঘটনা ঘটার ফলে গান্ধীজী অসহ-যোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। মানবেন্দ্রনাথ গান্ধীর এই নির্দেশকে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে অভিহিত করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে সরকারও আতঙ্কিত হচ্ছিল এক এমন জাতীয় জাগরণ আসছিল, কিন্তু গান্ধীর পরামর্শে এই জাগরণকে ব্যর্থ করে দেওয়া হল। গান্ধীর শান্তিবাদকে বিদ্রুপ করে মানবেন্দ্রনাথ বললেন, "সরকারের বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন যা করাতে ব্যর্থ হয়েছিল মহাত্মার আবেদনের ফলে তা করা সম্ভব হল। গ্রেপ্তার, নির্যাতন, বেত্রাঘাত, কারাদণ্ড, মৃত্যুদণ্ড এবং পুলিশি জুলুম বুভুক্ষু জাতির যে মরিয়া-হওয়া সংগ্রামকে দমন করতে পারে নি, গান্ধী তাঁর অহিংসা ও ভালবাসার যাদু দিয়ে তাকে নির্বীর্য ও পঙ্গু করে দিলেন। নিজের কর্মীদের বিপ্লবী কর্মপ্রচেষ্টাকে পরিত্যাগ করে কংগ্রেস আত্মহত্যা করল। গান্ধীবাদের বেদীতলে একটি প্রচণ্ড বিপ্লবী আন্দোলনকে বলি দেওয়া হল।"[৯]

কংগ্রেসের নীতির সক্রিয় বামপন্থী রূপান্তরের জন্য চিত্তরঞ্জনের ওপর মানবেন্দ্রনাথ ভরসা করেছিলেন, কিন্তু তিনিও সহিংস বিপ্লবের অনিবার্যতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মানবেন্দ্রনাথের মতামত গ্রহণ করতে পারেন নি। চিত্তরঞ্জন শুধু সহিংস বিপ্লববাদ অস্বীকারই করলেন না, তিনি ১৯২২ সালের গয়া অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে আদর্শগতভাবে অহিংসায় তাঁর বিশ্বাসের কথাও ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন, "আমি জানি দেশের মধ্যে ও বাইরে একটি মতবাদ আছে যাতে অহিংসার পথকে অবাস্তব বলা হয় এবং বলপ্রয়োগ ও হিংসা ছাড়া স্বরাজ লাভ অসম্ভব বলে ধরা হয়। এটা সত্য যে যাঁরা এই বিশ্বাস করেন তাদের কয়েকজন বহু ত্যাগ ও দেশপ্রেমের প্রমাণও দিয়েছেন। কিন্তু একথা বলতে আমি বাধ্য যে আদর্শের কথা বাদ দিলেও বলপ্রয়োগ ও হিংসার-পথে-আসা বিপ্লবের অসারতা ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে। আমি সেই সব মানুষের একজন যাঁরা আদর্শগতভাবে অহিংসবাদে আস্থাবান।"[১০]

গয়া কংগ্রেসের কার্যবিবরণী মানবেন্দ্রনাথকে নিরাশ করে। তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে এইরকম পরিস্থিতিতে ভারতের শ্রমিক ও কৃষকদের একটি সংগঠন অপরিহার্য এবং তা সংগঠিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে সক্রিয়ভাবে বামপন্থী করে তোলা যাবে না। ১৯২৩ সালে শ্রমিক ও কৃষকদল সংগঠনের প্রস্তুতি শুরু হয়। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট দলের কার্যকরী সমিতি যে বার্তা পাঠায় তাতে প্রস্তাবিত শ্রমিক ও কৃষকদলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়, "একথা এখন স্পষ্ট যে শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণী, যাঁরা সাম্রাজ্যবাদী শোষণের দ্বারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত, তাঁরা আর বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের অঙ্গুলি-সংকেতে সক্রিয় অথবা

নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারে না। শ্রমজীবী মানুষদের একটি স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে এগিয়ে এসে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে।"[১১]

মানবেন্দ্রনাথ এই সময়ে গান্ধীর সমালোচনা করতে থাকেন। তবে ১৯২২ সালের প্রথম আইন অমান্য আন্দোলন এবং ভারতের জনগণের ওপর গান্ধীর প্রচণ্ড প্রভাব উপলব্ধি করে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর গান্ধী-সম্পর্কিত নীতি কিছুটা বদল করেন। জনগণকে জাগানোর ব্যাপারে গান্ধিজীর ভূমিকা মানবেন্দ্রনাথ ১৯২৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 'ওয়ান ইয়ার অফ্ নন্-কোঅপারেশন' গ্রন্থে স্বীকার করে নেন। গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে গিয়ে মানবেন্দ্রনাথ তাঁকে সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস, স্যাভোনোরালা ও সেন্ট ফ্রান্সিস অফ অ্যাসিসির সঙ্গেও তুলনা করেন। তবুও মানবেন্দ্রনাথ বললেন যে গান্ধীর অর্থনীতি রক্ষণশীল এবং তাঁর রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে মিশিয়ে দেওয়ার নীতি কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। তিনি গান্ধীর চরকা-অর্থনীতিকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে বর্ণনা করেন। গান্ধী যে একদিকে জমিদার এবং পুঁজিপতিদের এবং অন্যদিকে শ্রমিক ও কৃষকদের একই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে একতাবদ্ধ করতে চাইছিলেন এটাও মানবেন্দ্রনাথ খুবই অসঙ্গত মনে করতেন। তিনি গান্ধীর রাজনৈতিক কর্মধারার সম্বন্ধেও আপত্তি তোলেন। ভাইসরয়ের সঙ্গে গান্ধীর সাক্ষাৎকার ও আলাপ-আলোচনাকে মানবেন্দ্রনাথ নিন্দা করেন এবং বলেন যে এই থেকে বোঝা যায় গান্ধী আসলে বিপ্লবে বিশ্বাসী নন, তিনি শুধু এক 'দুর্বল ও জ'লো সংস্কারের' মুখপাত্র।[১২]

মানবেন্দ্রনাথের অতি-আশাবাদী সমীক্ষায় মনে হয়েছিল যে ভারতে বিপ্লবী শক্তি উত্তরোত্তর জোরদার হয়ে উঠছে। ১৯২৪ সালের প্রথম দিকেই মানবেন্দ্রনাথ লেখেন "জনসাধারণ অশান্ত হয়ে উঠেছে। কৃষকশ্রেণী সত্যিই অগ্নিসম্ভব হয়ে উঠেছে এবং শহরের শ্রমিকশ্রেণী সুযোগ পেলেই তাদের বিপ্লবী চেতনার পরিচয় দিতে শুরু করেছে। এই সমস্ত বিপ্লবী শক্তিকে একত্রিত করে একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সৈন্যবাহিনীতে পরিণত করার কাজ এগিয়ে চলেছে। জনসাধারণ উপলব্ধি করছে যে বুর্জোয়াশ্রেণীর সংস্কারবাদী কর্মসূচী কোনও সুফল আনতে অক্ষম। জাতীয়বাদী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল আবার যথার্থ স্থানে ফিরে আসবে অর্থাৎ তা গণ-সংগ্রামের পথ নেবে। যখনই জাতীয়তাবাদী শক্তি বুর্জোয়াশ্রেণীর সংস্কারপন্থী নেতৃত্ব থেকে মুক্তি পাবে তখনই তারা বিপ্লবের পতাকাতলে সমবেত হবে।"[১৩]

১৯২৪-এর ১৭ই জুন কমিন্টার্নের পঞ্চম কংগ্রেসে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং কমিনটার্নের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করার সমর্থনে একটি প্রস্তাব পাশ হয়। মানবেন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন যে এই প্রস্তাবটি কমিন্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের পরিপন্থী। মানবেন্দ্রনাথ যুক্তি দেন যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন না করে কমিন্টার্নের উচিত হবে ভারতে সরাসরি এক কমিউনিস্ট আন্দোলন সৃষ্টি করতে সাহায্য করা। তিনি কমিন্টার্ন প্রতিনিধিদের বললেন "আমি প্রমাণ করতে চাই, দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর

থেকে যে সব ঘটনা ঘটেছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এই প্রস্তাবটি একেবারে ভুল। এই প্রস্তাবে বলা হচ্ছে যে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির জনগণের চিত্ত জয় করার জন্য সেই সব দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে কার্যকরী সমিতির সরাসরি যোগাযোগের আরও প্রসার ঘটা চাই। একথা সত্য যে এই সমস্ত জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সব সময়েই আমাদের যোগাযোগ রাখতে হবে, কিন্তু এটা আরও বেশী সত্য যে এই ধরনের যোগাযোগ সব সময়ে ফলপ্রস হয়ে ওঠে নি।"[১৪]

১৯২৪ সালে ভারতে আইনসিদ্ধ একটি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার চেষ্টা করেন সত্যভক্ত। প্রখ্যাত কংগ্রেসী এবং মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলানা হজরৎ মোহানীকে এই নূতন দল গড়ার উদ্দেশ্যে আহূত অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। গোড়ায় ঠিক হয়েছিল যে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনের জন্য নির্মিত প্যাণ্ডেলে সম্মেলন হবে। কিন্তু কংগ্রেসের প্যাণ্ডেলে এই রকম একটি সম্মেলন ডাকার অনুমতি মেলে নি, যার ফলে অন্যত্র সম্মেলনের বন্দোবস্ত করা হয়।

মৌলানা হজরৎ মোহানী জোরের সঙ্গে বলেন যে এই নবগঠিত দলের সঙ্গে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের কোনও সম্পর্ক নেই এবং এটা নিছক ভারতীয় সংস্থা।[১৫] সিংগারাভেলু চেট্টিয়ার এ ব্যাপারে আরও সোচ্চার ছিলেন। তিনি মন্তব্য করলেন, "ভারতীয় কমিউনিজম বলশেভিজম নয়। বলশেভিজম্ রুশবাসীরা তাঁদের দেশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। আমরা রুশবাসী নই। বলশেভিকপন্থীদের এবং বলশেভিক-বাদের ভারতে প্রয়োজন নাও হতে পারে। আমরা বিশ্ব-কমিউনিস্টদের সঙ্গে সামিল, কিন্তু বলশেভিকপন্থীদের সঙ্গে নয়।"[১৬] "এখানে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বর্তমান যুগের বহুকেন্দ্রিকতার উৎস কিছুটা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

এই নবগঠিত দলটি যে নির্ভেজাল ভারতীয় দল এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্টদের সঙ্গে তার যে কোন যোগ নেই মানবেন্দ্রনাথ এই ঘোষণার তীব্র সমালোচনা করেন। বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যোগহীন কোনও ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে এ কল্পনাই তিনি করতে পারেন নি। তিনি লেখেন, "আন্তর্জাতিক প্রোলেটারিয়েট আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজে নিজেই ভারত তার মুক্তির সংগ্রাম চালিয়ে যাবে--ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর এই ভূমিকার কথা বলার থেকে আর অ-কমিউনিস্ট মনোভাব কি থাকতে পারে? যাঁরা এইরূপ মনোভাব পোষণ করেন তাঁরা কমিউনিস্টদের থেকে অনেক দূরে এবং তাঁরা ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর শত্রু।"[১৭]

১৯২৪ সাল থেকে গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার নেতৃত্বে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে। এমনকি গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে মানবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বের একটা চ্যালেঞ্জের মত হয়ে দাঁড়ায়। যাতে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রসারে তাঁর ভূমিকা বজায় থাকে সেই উদ্দেশ্যে

মানবেন্দ্রনাথ অবশ্য বার্লিন থেকে গুপ্ত পথে অর্থ, পত্রপত্রিকা ইত্যাদি ভারতে পাঠাতে থাকেন।

১৯২৬ সালে প্রকাশিত 'দি আফটারমাথ অফ্ ননকোঅপারেশন' গ্রন্থে মানবেন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার হেতুগুলি বিশ্লেষণ করলেন। তিনি এই ব্যর্থতার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন যে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী বিপ্লবের পথে চলতে ভীত এবং দ্বিধাগ্রস্ত। তিনি বললেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতকে শিল্পক্ষেত্রে অবদমিত রাখার নীতির আংশিক পরিবর্তন সাধন করেছে এবং ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে কিছু পরিমাণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা দিয়েছে এই উদ্দেশ্যে যাতে এই শ্রেণীকে সাম্রাজ্যবাদের বন্ধুতে পরিণত করা যায়।[১৮] এই অবস্থায় একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোসহীন লড়াই চালিয়ে যেতে পারে। তিনি অবশ্য শ্রমিকশ্রেণীকে জাতীয়তাবাদী শক্তির সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগ রেখেই লড়াই শুরু করতে উপদেশ দিলেন।[১৯]

'দি ফিউচার অফ ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স (১৯২৬)' গ্রন্থে মানবেন্দ্রনাথ ব্যাপক ভিত্তির ওপর জনসাধারণের একটি সংগঠন স্থাপনের কথা বলেছিলেন। এই সংগঠন বিপ্লবাত্মক জাতীয়তাবাদের কর্মসূচী নিয়ে কাজ করবে এবং ভারতীয় সমাজের সকল শোষিত শ্রেণী, অর্থাৎ শ্রমিক, কৃষক এবং স্বল্পবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের সংগঠিত করে তুলবে।[২০] মানবেন্দ্রনাথ মনে করতেন যে জনসাধারণের এই জাতীয় সংগঠন নির্মাণ করতে এবং পরিচালিত করতে স্বল্পবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা, যাঁরা শ্রেণীগতভাবে কমিউনিস্ট মতবাদের দ্বিধাগ্রস্ত মিত্রশক্তি, তাঁদেরও একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। যেহেতু অভিজাত বুর্জোয়াশ্রেণী জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম থেকে কার্যতঃ অনেক দূরে সরে গিয়েছে, তাই অল্পবিত্ত বুর্জোয়াশ্রেণী, অর্থাৎ ছোট ব্যবসায়ী, মিস্ত্রি, কর্মচারী, ছাত্র ও স্বল্পবিত্ত বুদ্ধিজীবীদেরই ওপর আস্থা রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মানবেন্দ্রনাথ ঐ কথা বলেন।[২১]

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন প্রসারের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ শ্রেণীসংগ্রামকেও জোরদার করে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি লেখেন যে এখন থেকে ভারতে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম 'শ্রেণীসংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ের আকার নেবে'।[২২] এই শ্রেণীসংগ্রামকে জোরদার করতে কেবলমাত্র বিশ্বস্ত কমিউনিস্টদের নিয়ে গঠিত কমিউনিস্ট পার্টি এগিয়ে আসবে না, ব্যাপকতর জনসাধারণের সংগঠন এবং শ্রমিকশ্রেণী 'গণতন্ত্রবাদী মিত্র' হিসেবেও এগিয়ে আসবে। মানবেন্দ্রনাথ লিখলেন যে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব দেবে জনসাধারণের এই সংগঠন, যার মধ্যে সকল বিপ্লবী শক্তির সম্মেলন ঘটবে। শ্রমিকশ্রেণী এতে থাকবে বটে, তবে এটা বিশেষভাবে শ্রমিকশ্রেণীরই সংগঠন হবে না। এই দলের মাধ্যমে পেতি-বুর্জোয়া ও কৃষকদের মত অগ্রণী গণতান্ত্রিক শ্রেণীগুলির পাশাপাশি গিয়ে শ্রমিকশ্রেণী দাঁড়াবে।[২৩]

মানবেন্দ্রনাথ মেনে নিয়েছিলেন যে ভারতীয় রাজনীতিতে কিছু সময়ের জন্য ছাত্র, ছোট ছোট ব্যবসায়ী, স্বল্পবিত্ত বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্যরা নেতৃত্ব দেবে। অবশ্য তিনি এও দাবি করেছিলেন যে স্বল্পবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে শ্রমিকশ্রেণীতেই পরিণত হয়ে যাচ্ছিল। তিনি

চেয়েছিলেন ভারতীয় বিপ্লবীরা এই সব শ্রেণীগুলিকে জাতীয় বিপ্লবের প্রকৃত হাতিয়ার করে তুলুক। 'ফিউচার অফ ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স্' গ্রন্থে তিনি চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে গড়ে-ওঠা 'স্বরাজ্য পার্টি'কে পুঁজিপতি ও জমিদারদের রক্ষাকর্তা বলে সমালোচনা করেন ও ধিক্কার দেন।[১৪] মানবেন্দ্রনাথের মতে স্বরাজ্য পার্টি জমিদারশ্রেণীকে 'ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির স্তম্ভ' বলে মিথ্যা গৌরবে মহিমান্বিত করেছে।[১৫] এই অবস্থায় মানবেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন যে শ্রমিক, কৃষক ও পেটি-বুর্জোয়া-শ্রেণীদের নিয়ে ও পূর্ণস্বরাজ লাভের লক্ষ্য সামনে রেখে এবং কৃষি-ব্যবস্থার সংস্কারসাধনের বামপন্থী নীতি গ্রহণ করে একটি গণতান্ত্রিক সংগঠন গড়ে উঠুক।[১৬]

যে সময়ে 'দি ফিউচার অফ্ ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স্' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় প্রায় তারই সমসাময়িক কালে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির বিশিষ্ট সদস্য রজনী পাম দত্ত তার 'মডার্ন ইণ্ডিয়া' বইটি লেখেন। এটি ভারতে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে এবং ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয় গ্রেট ব্রিটেনে। তিনি লিখেছিলেন যে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের শরিক হবে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, যেমন শ্রমিক, কৃষক, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং এমনকি বুর্জোয়াশ্রেণীর এক অংশ।[১৭] মানবেন্দ্রনাথ কিন্তু 'দি ফিউচার অফ্ ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স্'-এ বুর্জোয়াশ্রেণীর এই ভূমিকা স্বীকার করেন নি এবং তিনি যে নূতন সংগঠন স্থাপনের কথা বলেছিলেন তা রজনী পাম দত্ত বলেন নি। রজনী পাম দত্ত বিশ্বাস করতেন যে কংগ্রেস ও স্বরাজ্য পার্টির মধ্যেই বামপন্থী জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলো তাঁদের কর্মের সুযোগ অনেকটা খুঁজে পাবে।[১৮]

'মডার্ন ইণ্ডিয়া'-র বিলাতী সংস্করণের মুখবন্ধে কিন্তু রজনী পাম দত্ত তাঁর মতবাদ কিছুটা পরিবর্তন করেন। এই মুখবন্ধে তিনি ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে আক্রমণ করেন এবং ভারতে একটি নূতন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলেন। মুখবন্ধে তিনি লেখেন, "ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী আজ একটা প্রতিবিপ্লবী শক্তি। তাদের স্বাধীনতা-লাভের ইচ্ছা সঙ্কুচিত হয়েছে কারণ জাতীয় স্বাধীনতার পর যে সামাজিক বিপ্লব ভারতে আসবে সে সম্বন্ধে তাদের আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। তাই তারা সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে রফা করে নিয়েছে, সাম্রাজ্যের সমর্থক বনে গিয়েছে।" সুতরাং একমাত্র শ্রমিক ও কৃষকদের নিয়ে বামপন্থী রাজনৈতিক ভিত্তিতে গড়ে-তোলা একটি নূতন জাতীয় আন্দোলনই জাতির জীবনে নূতন প্রাণের সঞ্চার করতে পারে।[১৯]

'মডার্ন ইণ্ডিয়া' লেখার পর থেকেই রজনী পাম দত্ত ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে শুরু করেন। ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রসারে প্রথম দিকে ব্রিটিশ কমিউনিস্টদের একটি তাৎপর্যময় ভূমিকা ছিল। ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির জনৈক সদস্য এবং কয়লা খনির শ্রমিক জর্জ অ্যালিসনকে রেড ইন্টারন্যাশনাল লেবার ইউনিয়নের তরফ থেকে ভারতে পাঠানো হল, ভারতে শ্রমিক ইউনিয়ন আন্দোলন সংগঠন করার জন্য।

ডোন্যাল ক্যাম্পবেলের নামে একটা জাল পাসপোর্ট করে তিনি ভারতে আসেন। কিন্তু ১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং তার পরে তাঁকে এদেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়।

অ্যালিসনের গ্রেপ্তার হওয়ার এক মাস আগে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে ফিলিপ স্প্রাট নামে আর একজন সদস্যকে পাঠানো হয়েছিল। পরবর্তী কালে স্প্রাট লিখেছিলেন "আমাকে একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে ভারতে পাঠান হয় নি। পাঠানো হয়েছিল যেহেতু আমি পুলিশের কাছে অচেনা এবং আমার মাধ্যমে ভারত থেকে গোপনীয় সংবাদ সরবরাহ করা যাবে।"[৩০] শ্রমিক ও কৃষকদলের সংগঠন করতে ভারতে এসে স্প্রাটের সঙ্গে মুজাফ্ফর আমেদ, এস জি. ঘাটে এবং অন্যান্য ভারতীয় কমিউনিস্ট-দের যোগাযোগ ঘটে।

১৯২৭ সালের ৩১শে মে তারিখে বোম্বাইয়ে ভারতীয় কমিউনিস্টদের একটি সম্মেলন হয়। এতে এস. এ. ডাঙ্গে, মুজাফ্ফর আমেদ, এস. জি. ঘাটে প্রমুখ কমিউনিস্টরা উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বের অন্যান্য কমিউনিস্ট পার্টি ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট পার্টির কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়ার জন্য আগ্রহী।

এই সম্মেলনের কিছু সময় আগে অবশ্য ডাঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি একজন ভারতীয় কমিউনিস্ট, বলশেভিক নন। কমিউনিজমের কোনরকম ভারতীয় সংস্করণে মানবেন্দ্রনাথ কিন্তু একেবারেই বিশ্বাসী ছিলেন না। ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে 'মাসেস অফ্ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে তিনি লেখেন যে প্রত্যেক দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটি জাতীয় শাখা বলে গণ্য করতে হবে। তা না হলে সে আন্দোলন আর কমিউনিস্ট আন্দোলন থাকবে না। তাঁর মতে কমিউ-নিজমের বিশেষ ভারতীয় সংস্করণ খুঁজে বেড়ানো একটা অবাস্তব ব্যাপার, যে-ভারতীয় নিজেকে কমিউনিস্ট বলে মনে করবেন তাঁকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের কমিউনিস্টদের মতই হয়ে উঠতে হবে।[৩১]

ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির আর একজন সদস্য বেঞ্জামিন এফ্ ব্রাড্লে এসে স্প্রাটের সঙ্গে যোগ দেন। ১৯২৭-র বেশির ভাগ সময়ে যখন স্প্রাট ও ব্রাড্লে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংগঠন করতে ব্যস্ত ছিলেন তখন মানবেন্দ্রনাথ ছিলেন চীনে। ইউরোপ থেকে মানবেন্দ্রনাথের অনুপস্থিতি ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টিকে ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বের আসন দখল করতে সহায়তা করে।

মানবেন্দ্রনাথের ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীরা ১৯২৫ সাল থেকেই এক প্রাচ্য সম্মেলন আহ্বান করার পরিকল্পনা করছিলেন। ১৯২৭ সালে এই সম্মেলন 'কংগ্রেস অফ্ অপ্রেস্ড্ ন্যাশানালিটিস্' এই নামে অনুষ্ঠিত হল। মানবেন্দ্রনাথ এই ধরনের সম্মেলনের পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু কমিনটার্ন ছিল। জওহরলাল নেহেরু এই সম্মেলনে যোগদান করেন। আত্ম-জীবনীতে নেহেরু লিখেছেন যে ১৯২৬ সালের শেষ দিকে যখন তিনি

বার্লিনে অবস্থান করছিলেন তখন ব্রাশেল্‌সে আহূত এই 'কংগ্রেস অফ্ অপ্রেস্‌ড্ ন্যাশানালিটিস্'-র কথা তিনি জানতে পারেন এবং তিনি প্রস্তাব করেন যে সেই সম্মেলনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সরকারীভাবে যোগ দেওয়া উচিত। এই প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সম্মেলনে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধির পদে নেহেরু মনোনীত হন।[৩২]

১৯২৭ সালের এই 'কংগ্রেস অফ্ অপ্রেস্‌ড্ ন্যাশানালিটিস'-এ মানবেন্দ্র-নাথের প্রতিদ্বন্দ্বীরাই কর্তৃত্ব করেন এবং তার ফলে ইউরোপে তাঁর মর্যাদা কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়। উপরন্তু ১৯২৭ সালে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব কার্যতঃ ব্রিটিশ কমিউনিস্টদের হাতে চলে গিয়েছিল। রাশিয়ায় মানবেন্দ্রনাথের মর্যাদার আরও অবনতি ঘটে যখন বাঙলার শ্রমিক ও কৃষক পার্টির নেতা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ অভিযোগের তালিকা নিয়ে ১৯২৭ সালে মস্কোয় পেঁছিলেন।[৩৩]

সৌম্যেন্দ্রনাথ যখন মস্কোয়, মানবেন্দ্রনাথ তখন চীনে। চীনে মানবেন্দ্রনাথ যে উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন তাতে তিনি সফলতা অর্জন করতে পারেন নি। কমিন্‌টার্নের আদেশে চীনা কমিউনিস্টরা কুয়োমিনটাঙের সঙ্গে একজোটে কাজ করতে চেয়েছিল, কিন্তু পরে কুয়োমিনটাঙ এবং চিয়াং কাইশেক চীনের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে চলে যায় এবং তাদের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। মানবেন্দ্রনাথ সর্বদাই জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে অবিশ্বাস করতেন এবং কুয়োমিনটাঙের সঙ্গে জোট বাঁধার বিপক্ষে ছিলেন। যা হোক, কমিন্‌টার্নের প্রতিনিধি হিসাবে মানবেন্দ্রনাথ চীনে নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এই জোট বাঁধার কমিন্‌টার্ন নীতি কার্যকরী করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু কুয়োমিন্‌টাঙ যখন চীনের কমিউনিস্টপন্থীদের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হল তখন চীনে কমিন্‌টার্ন নীতির ব্যর্থতার দায়িত্ব মানবেন্দ্রনাথের ওপরই বর্তাল।

১৯২৬-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কমিন্‌টার্নের কার্যকরী সমিতির সপ্তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে, মানবেন্দ্রনাথের বিরোধিতা সত্ত্বেও, কুয়োমিনটাঙের সঙ্গে জোট বাঁধার এই নীতি অনুমোদিত হয়েছিল। এতে বলা হয় যে কমিউনিস্ট পার্টির কুয়োমিনটাঙ ত্যাগ করা উচিত, এই দৃষ্টি-ভঙ্গী ভ্রান্ত এবং চীনের বিপ্লবের ক্রমবিকাশের গোটা পদ্ধতি, তার চরিত্র ও পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাই প্রমাণ করে যে কমিউনিস্টরা কুয়োমিনটাঙের মধ্যে থেকেই তাদের নিজেদের কর্মসূচী জোরদার করে তুলতে পারবে।[৩৪]

চীন থেকে মানবেন্দ্রনাথের বার্লিনে প্রত্যাবর্তনের পর 'মাসেস অফ ইণ্ডিয়া'-তে 'চীনা বিপ্লবের শিক্ষা' নামে একটি প্রবন্ধে, যেটা মানবেন্দ্রনাথেরই লেখা বলে মনে হয়, বলা হয়েছিল, "চীনে এইসব বিপ্লবাত্মক এবং প্রতি-বিপ্লবাত্মক ঘটনাগুলি থেকে শিক্ষা নেওয়া যায় যে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীভুক্তরা মূলতঃ প্রতি-বিপ্লবী। জাতীয় বিপ্লবকে সার্থক করতে হলে তাকে তাই কৃষিবিপ্লবের রূপ দিতে হবে। সম্ভ্রান্ত বুর্জোয়াশ্রেণী ত নয়ই, পেতি-বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের বামপন্থী কথাবার্তা সত্ত্বেও কখনও এই কৃষিভিত্তিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে পারবে না। পেতি-বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতায় আসীন হলে শ্রমজীবী শ্রেণীর স্বার্থে সেই

ক্ষমতা ব্যবহার করবে না বরং তারা প্রতি-বিপ্লবাত্মক বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতেই সেই ক্ষমতা তুলে দেবে। জাতীয় বিপ্লবের একমাত্র পথ হল শ্রমিকশ্রেণীর একটি স্বাধীন রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে কাজ করা।"[৩৫]

বার্লিন থেকে ফিরে মানবেন্দ্রনাথ দেখলেন যে ট্রট্স্কী ইতিমধ্যেই রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। ট্রট্স্কীর মত মানবেন্দ্রনাথও জঙ্গী আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নীতিতে এবং জাতীয় বুর্জোয়া-শ্রেণীর বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন। অবশ্য স্টালিন ও ট্রট্স্কীর মধ্যে দ্বন্দ্বে মানবেন্দ্রনাথ স্টালিনের পক্ষেই ছিলেন।

কোন্ নীতি ও পদ্ধতি ভারতীয় কমিউনিস্টদের অনুসরণ করা উচিত সেই বিষয়ে ১৯২৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর মানবেন্দ্রনাথ একটি চিঠি লেখেন। এই চিঠির একটি প্রতিলিপি প্রকাশ হয়ে পড়ে ও সেটি ভারতীয় আইন পরিষদে পঠিত হয়। এই পত্রটি তাই 'পরিষদ লিপি' নামে অভিহিত। এই চিঠিতে মানবেন্দ্রনাথ একটি গুপ্ত বে-আইনী কমিউনিস্ট দল এবং অন্য দিকে একটি আইনসম্মত ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষকদল গঠনের প্রস্তাব করেন। যেহেতু বলপ্রয়োগের দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উৎখাত করাই কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য ছিল, সেই জন্য আইনসিদ্ধ দল হিসেবে তাঁরা কাজ করতে পারতেন না। আর যে দল ইংরেজ সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় অঙ্গীকারবদ্ধ সে দল আইনসম্মত হতে পারত তাদের অস্তিত্বের মৌল কারণটিকে বিসর্জন দিয়ে, সুতরাং সেটা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। তাই কমিউনিস্ট দলের মধ্যে সংগঠিত কমিউনিস্টরা কৃষক ও শ্রমিকদলের পেছনে থেকে প্রেরণা এবং পরিচালনার প্রাণশক্তি জোগাবে; কিন্তু জনসাধারণের সামনে শ্রমিক ও কৃষকদলের সঙ্গে কমিউনিস্টদের বা কমিউনিস্ট দলের কোনও সংস্রব থাকবে না, কারণ তা থাকলে বহু বামপন্থী গণতন্ত্রবাদী মানুষ যারা এমনিতে এই দলে আসত তারা কমিউনিস্টদের ভয়ে সরে দাঁড়াবে।[৩৬]

'পরিষদ লিপি'তে মানবেন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেন যে শ্রমিক ও কৃষকদল 'লীগ এগেন্স্ট ইম্পিরিয়্যালিজমের' অন্তর্ভূক্ত হোক। তাহলে আর মস্কো এই দল নিয়ন্ত্রিত করছে একথা বলা চলবে না, পক্ষান্তরে, বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টিকে কমিন্টার্নের একাংশ হিসাবে কাজ করে যেতে হবে। এই চিঠিতে মানবেন্দ্রনাথ ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে ব্রিটিশ সতীর্থদের ভূমিকা উল্লেখ করেন। তিনি জানতেন তাঁর হাত থেকে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট-দের হাতে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব চলে যাচ্ছে। তিনি বলেন যে ভারতীয় কমিউনিস্ট দলের কার্যক্রমে খবরদারী করার কোনও অধিকার ব্রিটিশ কমিউনিস্টদের নেই এবং এ যাবৎ কমিন্টার্ন ভারতে কোনও বিশেষ প্রতিনিধি পাঠায় নি। 'পরিষদ লিপি'র এই অংশটি ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি থেকে ভারতে পাঠানো দুই প্রতিনিধি, স্প্রাট ও ব্রাডলে, যাঁরা কার্যতঃ ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আক্রমণ।

১৯২৮-এর জুলাই-সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি মস্কোয় কমিন্টার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেস সম্মেলন হয়। এর আগেই মানবেন্দ্রনাথ তাঁর ঔপনিবেশিকতা

উৎখাতের মতবাদ প্রচার শুরু করে দিয়েছেন এবং তুলনামূলকভাবে দক্ষিণে সরে এসেছেন। কিন্তু এই ষষ্ঠ কংগ্রেসে কমিনটার্ন আরও বামে সরে গেলেন এবং জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামের প্রস্তাব রাখলেন। ১৯২০ সালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের সময় থেকে মানবেন্দ্রনাথ এই মতবাদেরই সমর্থন করতেন কিন্তু ষষ্ঠ কংগ্রেস আহৃত হবার কিছু পূর্বে তিনি এই মত থেকে দক্ষিণে সরে গিয়েছিলেন।

মানবেন্দ্রনাথের মতে পুঁজিবাদের সংকট ও সাম্রাজ্যবাদের বিপর্যয়ের মাধ্যমেই ঔপনিবেশিকতার উৎখাত শুরু হয়ে গিয়েছিল। পুঞ্জীভূত মূলধন আর স্বদেশে লাভজনক বিনিয়োগে খাটানো যাচ্ছিল না, তাই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি উপনিবেশগুলিতে আরও বিনিয়োগ করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল। উপনিবেশগুলিকে শিল্পে অনগ্রসর করে রাখলে এই বিনিয়োগের সম্ভাবনা বাড়ানো সম্ভব ছিল না। তাই ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়েই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি উপনিবেশগুলিতে কিছু পরিমাণ শিল্পায়নের সুযোগ দিতে শুরু করেছিল। কিন্তু মানবেন্দ্রনাথের মতে উপনিবেশগুলিতে এই শিল্পায়নের মাধ্যমেই ঔপনিবেশিকতার উৎখাত শুরু হয়ে গেছে এবং কালক্রমে এইসব উপনিবেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের হাত থেকে জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটবে।

ঔপনিবেশিকতা উৎখাতের এই মতবাদ ষষ্ঠ কংগ্রেস সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীকে প্রতি-বিপ্লবী শক্তি বলেই আখ্যা দিলেন। চীনা বুর্জোয়াদের বিশ্বাসঘাতকতার তিক্ত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামের চরম-পন্থী জঙ্গী নীতিই গ্রহণ করলেন। ষষ্ঠ কংগ্রেস শুধু মানবেন্দ্রনাথের ঔপনিবেশিকতা উৎখাতের মতবাদই অগ্রাহ্য করলেন না, তাঁরা রজনী পাম দত্তের মতবাদ যে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়ারা প্রতি-বিপ্লবী হলেও তাঁদের কিছুটা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকা অবশিষ্ট আছে একথাও অস্বীকার করলেন। ১৯২৮ সালের জুন মাসে 'দি লেবার মান্থলী' পত্রিকায় রজনী পাম দত্ত লিখেছিলেন, "যদি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কর্মীদের দিকে তাকান তবে দেখা যাবে যে তাঁরা বেশির ভাগই পেতি-বুর্জোয়াশ্রেণী থেকে আসছেন এবং সেই স্তরেই সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা সবচেয়ে বেশী তীব্র আকার নিচ্ছে। বর্তমান কালের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের বিপর্যয়ের পর মোহভঙ্গের ফলে জনসাধারণের এক বিরাট অংশ বিপ্লবের পথে এগিয়ে আসছে।"[৩৭]

ষষ্ঠ কংগ্রেস ঘোষণা করে, যে বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে আর কোন বৈপ্লবিক শক্তি নেই। ব্যবসায়ী বুর্জোয়াশ্রেণী চীনের কম্প্রাডোর বুর্জোয়া-শ্রেণীর মত সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিদের এবং সাম্রাজ্যবাদীদের পূর্ণ সহযোগী এবং প্রলেটারিয়েট শ্রেণীর শত্রু। কেবলমাত্র দরিদ্র কৃষক, শহরাঞ্চলের দরিদ্র পেতি-বুর্জোয়া এবং স্বল্পবিত্ত বুদ্ধিজীবীদেরই সক্রিয় বিপ্লবী শক্তির মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব এবং কেবলমাত্র তারাই শ্রমিকশ্রেণীর বন্ধু হতে পারে। যদিও এইসব পেতি-বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সাময়িক চুক্তি বা মিলন চলতে পারে, তবু কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হল যে অন্যান্য

দল বা গোষ্ঠীর থেকে তারা যেন নিজেদের স্বাতন্ত্র্য পরিষ্কারভাবে বজায় রাখে। কমিউনিস্টদের বলা হল যে তারা যেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বামপন্থীদের এবং অন্যান্য পেতি-বুর্জোয়াদের দ্বিধাগ্রস্ত নীতির কঠোর সমালোচনা চালিয়ে যায়।[৩৮]

ষষ্ঠ কংগ্রেস থেকে ঘোষণা করা হয় যে শ্রমিক ও কৃষক পার্টিগুলি অনায়াসেই সাধারণ পেতি-বুর্জোয়া পার্টিতে পরিণত হতে পারে এবং বৈপ্লবিক কর্মসূচী থেকে দূরে সরে আসতে পারে। শ্রমিক ও কৃষক এই দুটি শ্রেণীর মিলনের ভিত্তিতে একটি সংগঠন গড়ে তোলার কাজ যাতে কমিউনিস্টরা না করেন সেই রকমই বলা হল। আর বলা হল যে সমগ্র কমিউনিস্ট গোষ্ঠি ও ব্যক্তিদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র ও বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠিত করার ওপরই জোর দেওয়া উচিত হবে।

ভারতীয় কমিউনিস্টরা কিন্তু বেশ কিছুদিন এই শ্রমিক ও কৃষক-শ্রেণীর দল গঠনের কাজ করে যায়। কারণ ষষ্ঠ কংগ্রেসের এই দল ভেঙে দেবার নির্দেশ কমিউনিস্টদের কাছে বেশ কিছুকাল পৌঁছয় নি। এই নির্দেশ আসে ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর, ষষ্ঠ কংগ্রেস শেষ হওয়ার প্রায় তিন মাস পরে, যখন জি. এম. অধিকারী ইউরোপ থেকে দেশে ফেরেন।[৩৯]

ষষ্ঠ কংগ্রেসে মানবেন্দ্রনাথের ঔপনিবেশিকতা উৎখাতের নীতি অগ্রাহ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমিন্‌টার্নে তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। ষষ্ঠ কংগ্রেসের পরও মানবেন্দ্রনাথ জার্মানীতে আর এক বছর থেকে কাজ করে যান এবং 'রেভলিউশন অ্যাণ্ড কাউন্টার রেভলিউশন ইন চায়না' বইটি লেখেন; কিন্তু ষষ্ঠ কংগ্রেসের পর থেকেই, মানবেন্দ্রনাথের নিজ ভাষায়, তিনি 'পবিত্র গিলোটিনে'র সামনে এসে দাঁড়ান।[৪০] ১৯২৯ সালের জুলাই মাসে মস্কোতে অনুষ্ঠিত দশম সাধারণ সম্মেলন মানবেন্দ্রনাথকে কমিন্‌টার্ন থেকে বহিষ্কার করে দেয়। বলা হল যে মানবেন্দ্রনাথ আর কমিউনিস্টদের বন্ধু নন, বরঞ্চ তিনি গান্ধী বা ব্রাডল্যর বা থালেইমিয়ারের বন্ধু।

মানবেন্দ্রনাথের মতে কমিন্‌টান থেকে তাঁর বহিষ্কার এক ষড়যন্ত্রের পরিণতি। তিনি লিখেছিলেন, "আমি এক অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের বলি যার ইতিহাস প্রকাশ্যে না লেখাই ভাল। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ওপর গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির খবরদারি বজায় রাখার চেষ্টাই এজন্য বহুলাংশে দায়ী। রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্বও আমার এই বলি-প্রদানের ব্যাপারে কাজ করেছে। একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যায়। ষষ্ঠ বিশ্ব কংগ্রেসে প্রথম দেখা যায়, যে একটি ভারতীয় প্রতিনিধিদল উপস্থিত হয়েছে। বারবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও এর আগে ভারত থেকে কোন সত্যিকার কমিউনিস্ট মস্কোয় পৌঁছতে পারেন নি। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলনে এই প্রথম ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের উদ্দেশ্যই ছিল আমার বিরুদ্ধাচরণ করা এবং তা স্পষ্টতঃই পূর্ব-পরিকল্পিত। কয়েকজন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট, যাঁরা পূর্বে অতি অল্প সময়ের জন্য ভারতে এসেছিলেন, তাঁদের কথার প্রতিধ্বনি করে এই ভারতীয় প্রতিনিধিদল বলেন যে আমি নাকি ভারতে সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের সঙ্গে আমার নাকি কোন যোগই নেই। আরও

উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল—এই প্রতিনিধিদলের কেবলমাত্র একজনকেই ভারতে ফিরে যেতে দেওয়া হয়। বাকীরা ব্রিটিশ গুপ্তচরবৃত্তির সন্দেহে উপযুক্ত শাস্তি পায়। আর যিনি ভারতে ফেরেন তিনি একেবারে রাজনীতি বর্জন করে বসেন।"[৪১]

১৯২৬ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তরফ থেকে মানবেন্দ্রনাথকে চীনে পাঠানো হয়। তিনি বোরোডিন ও ব্লুশারের সঙ্গে চীনে যান এবং ১৯২৭ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত সেখানে থাকেন। কিন্তু চীনে মানবেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য সফল হয় নি এবং তাঁর এই ব্যর্থতা, তাঁর বিতর্কিত ঔপনিবেশিকতা উৎখাতের মতবাদ ও সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত কিছু ভারতীয়ের সমালোচনা, এসমস্তই মানবেন্দ্রনাথের কমিন্টার্ন থেকে বহিষ্কারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কমিন্টার্ন থেকে বহিষ্কৃত হবার পর 'ডাঃ মামুদ' এই ছদ্মনামে পাসপোর্ট নিয়ে মানবেন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে ফিরে আসেন। ভারতে এসে তিনি একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও কমিউনিস্ট-দের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং ১৯৩১ সালে নেহেরুর আমন্ত্রণে করাচী কংগ্রেসে যোগদান করেন। এই কংগ্রেসেই মৌলিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির জাতীয়করণের সুপারিশ করে মৌলিক অধিকার ও অর্থনৈতিক বিষয়ক বিখ্যাত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

পুরোনো এক ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে মানবেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারের পর মানবেন্দ্রনাথ একটি বিবৃতিতে যেটি তিনি বিচার চলা কালে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু দিতে পারেন নি—দাবি করেন যে তিনি ভারতীয় বিপ্লবের এক পথিকৃৎ হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি বলেন, এই মুক্তি আন্দোলন তিনি সৃষ্টি করেন নি, তিনি শুধু অন্যদের পূর্বে এটির সম্ভাবনা কল্পনা করতে পেরে-ছিলেন। তাঁর বক্তব্য শ্রমিকশ্রেণীকে নিয়ে তিনি একটি দল গড়তে চেষ্টা করেছিলেন, কারণ রাজনৈতিক দাসত্ব, অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক অবমাননা থেকে মুক্তির জন্য এই রকম একটি দলের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা আছে। এই দলের পথে যে-ই দাঁড়াবে, সে ব্রিটিশ রাজশক্তিই হোক আর অন্য যে কেউ হোক, তাকেই অপসৃত হয়ে যেতে হবে।[৪২] মানবেন্দ্রনাথ বললেন যে জনসাধারণের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য যে-কোন যুক্তিসঙ্গত অর্থনৈতিক কর্মসূচী সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় আঘাত হানতে বাধ্য। তিনি এই বিবৃতিতে লেখেন, "সরকার প্রায় যে-কোন অর্থ-নৈতিক কর্মসূচী রূপায়ণের বিরুদ্ধে, কারণ তা কার্যকরী হলে সাম্রাজ্যবাদ ও তার ভারতীয় মিত্ররা, যথা দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণী, সম্ভ্রান্ত রাজন্যবর্গ এবং বড় জমিদার সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই কর্মসূচী রূপায়ণ মানেই সাম্রাজ্যবাদী সরকারের আইন লঙ্ঘন। সাম্রাজ্যবাদী সরকারের আইনের কাজ হল জনসাধারণকে বুভুক্ষার মধ্যে রাখা, যাতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ এবং তার দেশী মিত্রপক্ষ আরও ধনী হয়ে উঠতে পারে আর জনগণ তাদের বর্তমান অবস্থার ওপর মাথা তুলতে না পারে।...আমি সহিংস বিপ্লবের প্রচার করি নি। আমি কেবল মনে করেছি যে বিপ্লবের ঐতিহাসিক

প্রয়োজনীয়তা আছে। সমাজের বলশালী শক্তিগুলি সময় সময় সহিংস বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। নূতনের প্রতি পুরোনোর প্রতিরোধই এই অবস্থার জন্ম দেয়। আসন্ন বিপ্লবই তার নিজের পথিকৃতের জন্মদাতা এবং সেই পথিকৃতের কাজ হল বিপ্লবাত্মক ঘটনাগুলিকে ত্বরান্বিত ও সুসংবদ্ধ করে তোলা। বিপ্লবী অগ্রগামীদের কাজই হল, যে ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা বাস্তব পরিণতি নিতে চলেছে তাকে দ্রুততর করে তোলা। তারা সচেতনভাবে বিপ্লবের শক্তিগুলিকে সংগঠিত করে বিজয়ের পথে নিয়ে যায়। আমি সেই ভারতীয় বিপ্লবের একজন পথিকৃৎ হিসেবে কাজ করেছি। তবে বিপ্লব আমার সৃষ্টি ছিল না। দেশের ঐতিহাসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এর জন্ম হয়। কেবল আমি অন্যদের আগে তাকে দেখতে পেয়েছি।"[৪৩]

মানবেন্দ্রনাথের মতে তিনি ঐতিহাসিক শক্তির নিছক একটি যন্ত্রবিশেষ। তিনি বলেন, বিপ্লবের তিনি উৎস নন। বিরাট সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার নিজের ভিতরে নিহিত ছিল—যে ব্যবস্থা তার নিজেরই বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির জন্ম দেয়। মানবেন্দ্রনাথ বললেন, "সুতরাং বিপ্লবের জন্য দায়ী আমিও নই, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকও নয়। সাম্রাজ্যবাদই এর জন্য দায়ী। আমাকে শাস্তি দিলেই বিপ্লব থেমে যাবে না। সাম্রাজ্যবাদ তার নিজেরই কবর খুঁড়েছে যার নাম জাতীয় বিপ্লবী শক্তি। তাদের ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই শক্তিগুলি কাজ করে যাবে।"[৪৪]

কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় মানবেন্দ্রনাথ ১৯৩১ সালে কারাদণ্ডিত হন এবং ১৯৩৪ সালে তাঁর কারামুক্তি হয়। ভারতের কারাগারে কয়েক বছর এবং ভারত থেকে বাইরে প্রায় ১৬ বছর নির্বাসনে থাকার পরই মানবেন্দ্রনাথের ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করার অবকাশ আসে।

কারামুক্তির পর মানবেন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। এর মধ্যে কমিন্টার্নের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের বিচ্ছেদ অপ্রতিরোধ্যভাবে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। শ্রমিকশ্রেণীই বিপ্লবের একমাত্র অগ্রদূত এই মতবাদ থেকে মানবেন্দ্রনাথ এই সময়ে সরে এসেছিলেন এবং তিনি তখন বিশ্বাস করতেন যে বামপন্থী ও জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ সম্ভব ও উচিত। বস্তুতঃ শ্রেণীসংগ্রামের একক সত্তা ও শ্রমিকশ্রেণীর একক বিপ্লবে মানবেন্দ্রনাথ আর বিশ্বাসী ছিলেন না। মানবেন্দ্রনাথ শ্রমিকশ্রেণীর ওপর তাঁর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং বলতে শুরু করেছিলেন যে সামন্ততন্ত্রকে উৎখাত করে যেমন বুর্জোয়ারা বিপ্লব এনেছিল তেমনি শ্রমিক ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীরাও ভবিষ্যতে বিপ্লব আনতে সক্ষম।[৪৫]

১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া' প্রতিষ্ঠা করেন এবং আগের মতই গান্ধী ও গান্ধীনীতির ওপর আক্রমণ চালাতে থাকেন। তিনি গান্ধীকে একজন 'সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল' বলে অভিহিত করেন এবং বলেন যে 'যাতে শ্রমিক ও কৃষকেরা তাদের অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন এবং যাতে দেশের পুঁজিবাদী শোষণের বাস্তবতাকে গোপন করা যায় তার জন্য গান্ধীর অহিংসা নীতি

একটি সূক্ষ্ম প্রয়াস। গান্ধীর জাতীয় ঐক্যের মতবাদের সমালোচনা করে মানবেন্দ্রনাথ বলেন, শ্রমিক ও পুঁজিপতির স্বার্থের মধ্যে কখনও সামঞ্জস্য আসতে পারে না। গান্ধী যে রাজনীতিতে ধর্মের অনুপ্রবেশ করিয়েছিলেন সেই জন্য মানবেন্দ্রনাথ গান্ধীর বিশেষ সমালোচনা করেন। আর চরকা সম্বন্ধে গান্ধীর মতবাদের বিরূপ সমালোচনা করতে গিয়ে মানবেন্দ্রনাথ বলেন যে কংগ্রেসের মত একটি রাজনৈতিক সংগঠনকে গান্ধী একটি চরকা-সমিতিতে পরিণত করছেন।[৪৬] তিনি এ অভিযোগও করলেন যে গান্ধী অহিংসবাদকে একটি ধর্মমত বা অন্ধনীতিতে পরিণত করতে চাইছেন, কিন্তু কংগ্রেসের মত কোন রাজনৈতিক সংগঠন অহিংসাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না।[৪৭] তিনি বললেন যে অহিংসার নীতি ভারতীয় জনগণের বিপ্লব আন্দোলনের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

কংগ্রেসের নীতিকে প্রভাবিত করার জন্য এবং তাঁর মতবাদ প্রচার করার উদ্দেশ্যে মানবেন্দ্রনাথ ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে 'দি লীগ অফ্ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন' গঠন করলেন। পরে ১৯৪০ সালে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের বিপক্ষে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্যে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, কিন্তু বিপুল ভোটের পার্থক্যে তিনি পরাজিত হন।

মানবেন্দ্রনাথের ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে মানবেন্দ্রনাথ বলেন যে সেটা গণতন্ত্রবাদী শক্তি ও ফ্যাসিবাদী শক্তির মধ্যে একটা আন্তর্জাতিক গৃহযুদ্ধ। তাই ফ্যাসিবাদী জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রয়াসে তাঁর সমর্থন ছিল। জার্মানরা ফরাসী দেশ দখল করে নেবার পর মানবেন্দ্রনাথ আবেদন করেন মিত্রপক্ষকে যেন নিঃশর্ত সমর্থন জানানো হয় যাতে তারা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে পারে।[৪৮] মিত্রশক্তির যুদ্ধপ্রয়াস ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন কোন কাজ করার বিপক্ষে ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ। তিনি বলেন যে ভারতের স্বাধীনতা অনিবার্য এবং যুদ্ধের পরেই তা আসবে; সুতরাং যুদ্ধকালীন ভারতে স্বাধীনতার সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করার জন্য আন্দোলনের প্রয়োজন নেই। যুদ্ধের শেষে যে ভারত মুক্ত ও স্বাধীন হবে এই সিদ্ধান্তে মানবেন্দ্রনাথ আসেন তাঁর ঔপনিবেশিকতা উৎখাতের মতবাদের ভিত্তিতে। তাঁর মতে ভারতে যে অর্থনৈতিক ঔপনিবেশিকতার উৎখাত শুরু হয়ে গিয়েছিল তার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আসবেই। আর এই অর্থনৈতিক ঔপনিবেশিকতার উৎখাতের মাধ্যমেই যথাসময়ে ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণীকে ভারত ত্যাগ করে তাঁদেরই ভারতীয় সমশ্রেণীর হাতে শাসনভার প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য করবে।

ফ্যাসিবাদের প্রতি মানবেন্দ্রনাথের ঘৃণা এতই প্রবল ছিল যে তিনি বুঝতে পারেন নি বা বুঝতে চান নি যে স্বাধীনতার একটি পরিষ্কার প্রতিশ্রুতি না পেয়ে ভারতবাসীরা অন্য দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মিত্র-শক্তির পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে আসবে না। ১৯৪২ সালে কংগ্রেস 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু করে। মানবেন্দ্রনাথ এই আন্দো-

লনের পুরোপুরি বিরোধিতা করলেন। তিনি বলেন যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিকৃত জাতিবিদ্বেষের জন্যই এই আন্দোলন শুরু করা হয়েছে এবং কংগ্রেস এর দ্বারা ব্রিটিশ আর সেই সঙ্গে মিত্রশক্তির-ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রয়াসকেই দুর্বল করে দেবে।[৪৯] 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করে তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের মূলধারা থেকে তিনি যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছেন এ ব্যাপারে মানবেন্দ্রনাথের সচেতনতা বা সংকোচ ছিল না। এই আন্দোলন শুরু করার জন্য তিনি কংগ্রেসের বিরূপ সমালোচনা করলেন, কংগ্রেস নেতাদের 'ফ্যাসিবাদের প্রতিনিধি' বলে আখ্যা দিলেন[৫০] এবং আরও অভিযোগ করলেন যে কংগ্রেসের এই আন্দোলনে শিল্পপতি ও অর্থশালী পৃষ্ঠপোষকদের বিশেষ সমর্থন আছে।[৫১]

যে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ফ্রন্ট যুদ্ধকালীন সময়ে গড়ে ওঠে তাতে শ্রমিকশ্রেণী ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণীগুলি আকৃষ্ট হয়; ফলে বিপ্লবাত্মক শক্তিগুলির একটি নতুন সমন্বয় গড়ে ওঠে।[৫২] এই পরিপ্রেক্ষিতে মানবেন্দ্রনাথের বিশ্বাস জন্মায় যে শ্রমিকশ্রেণীই বিপ্লবের একমাত্র শক্তি নয়। বস্তুতঃ এই সময়ে তিনি এই মতবাদে উপনীত হন যে শ্রমিকশ্রেণী নয়, মধ্যবিত্তশ্রেণীই ভবিষ্যতের বিপ্লবে বিশেষ ভূমিকা নেবে বা নেতৃত্ব দেবে। এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তিনি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র মতবাদকে একটা জীর্ণ বিশ্বাস বলে আখ্যা দেন।

নীতিগতভাবে মধ্যবিত্তশ্রেণীকে বিপ্লবাত্মক শক্তিরূপে মেনে নিয়েও 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন, যাকে ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণী বিপুলভাবে সমর্থন করলেন, মানবেন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধাচারণ করলেন। মানবেন্দ্রনাথ নিজেকে এমনও বোঝালেন যে কংগ্রেস একেবারেই গণতন্ত্রের পক্ষে নয়,[৫৩] এবং কংগ্রেসের হাতে দেশের শাসনভার আসা মানেই ভারতে ফ্যাসিস্ট একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা।[৫৪]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং তার পরবর্তী কালে মানবেন্দ্রনাথ কেবল ফ্যাসিবাদের এবং কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদেরই নিন্দা করলেন না, তিনি মার্ক্সবাদ ও কমিউনিস্টবাদের কয়েকটি মৌলিক নীতিরও বিরুদ্ধাচরণ করলেন। ১৯৪৬ সালে তিনি বললেন যে বামপন্থী মতবাদকে জাতীয়তাবাদ কিংবা কমিউনিজমের তকমা এঁটে আর ধরতে হবে না।[৫৫] এই সময়ে মানবেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদ ও কমিউনিস্টপন্থীর মার্ক্সবাদ এই উভয়কেই বর্জন করে এক ব্যক্তিতান্ত্রিক রাজনৈতিক দর্শনের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিলেন।

যুদ্ধের সময় ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করেছিলেন; এমনকি শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার চালাবার জন্য তিনি ব্রিটিশের কাছ থেকে অর্থসাহায্যও গ্রহণ করেছিলেন। এই কারণে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন চলাকালীন মানবেন্দ্রনাথ ইংরেজ স্বরাষ্ট্রসচিব ম্যাক্সওয়েলকে সাহায্য করছেন।[৫৬] এই সময়ে মানবেন্দ্রনাথ কেবল ব্রিটিশ যুদ্ধপ্রয়াসেরই সমর্থন করেন নি, তিনি এও বলেছিলেন যে কংগ্রেস নেতাদের শুধুমাত্র কিছু গোলমাল করার ক্ষমতা আছে এবং তাঁদের কারারুদ্ধ করাই উচিত হবে। যখন বিশ্ব

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত তখন কংগ্রেস সত্তা শহীদ হবার পথ গ্রহণ করেছেন বলেও তিনি মন্তব্য করেন।[৫৭] এই সময়ে গান্ধীর সমালোচনায়ও তিনি পঞ্চমুখ ছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে গান্ধী ভারতীয় জনগণের অনগ্রসরতা ও অব্যবস্থিতচিত্ততার প্রধান প্রতীকস্বরূপ এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিবেশকে দুর্বল করে তোলার জন্য গান্ধীই মূলতঃ দায়ী।[৫৮]

রাজনীতিতে অধ্যাত্মবাদ ও ধর্মের অনুপ্রবেশকে মানবেন্দ্রনাথ চিরকালই নিন্দা করতেন। রাজনীতিতে ধর্মের অনুপ্রবেশ করানোর জন্য মানবেন্দ্রনাথ গান্ধীর বিরূপ সমালোচনা করেন। জিন্নার মতই তিনি মন্তব্য করেন যে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিন্দুধর্মীয় আদর্শ, বিশ্বাস ও ধর্মকাহিনী দ্বারা পরিকীর্ণ।[৫৯] তার মতে গান্ধী ছিলেন ফ্যাসিবাদী অযৌক্তিকতার একজন প্রতিনিধি আর গান্ধীর অহিংসা হল জনগণকে তাদের ভাগ্যকে মেনে নেওয়ানোর একটা ঘুমপাড়ানী ছড়া। মানবেন্দ্রনাথের মতে গান্ধী ছিলেন জাতীয় পুঁজিবাদের প্রবক্তা। জওহরলাল নেহেরু নিজেকে সমাজতন্ত্রবাদী বলতেন, কিন্তু যেহেতু তিনি অনেক বিষয়ে গান্ধীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব অনুসরণ করতেন সেই কারণে মানবেন্দ্রনাথের সমালোচনার হাত থেকে জওহরলালও রেহাই পান নি। গান্ধীকে মানবেন্দ্রনাথ জাতীয় প্রতিক্রিয়ার [illegible] বলে নিন্দা করেছিলেন [illegible] নেহেরুকে। বলেছি[illegible] [illegible] এবং [illegible] গান্ধী ও নেহেরু উভয়েই [illegible] পরিপূরক।[৬০]

[illegible]

ছিলেন [illegible] [illegible] পরবর্তী [illegible] [illegible] করেন [illegible] [illegible] হন। কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মানবেন্দ্রনাথের [illegible] কালে তিনি স্বাগত জানাতে পারেন নি। 'আফটার নেহরু হু?' গ্রন্থের লেখক ওয়েলেস হ্যাঙ্গেনকে তিনি বলেছিলেন, "সমস্ত জিনিসটার একটা যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণ করতে আমার অনেক সময় লেগেছিল। বলা হয়েছিল যে গণতান্ত্রিক কাঠামোয় মানুষের অধিকারের সব চেয়ে বড় শত্রু হল হিটলারের নাজিবাদ। কিন্তু আমরা ব্রিটিশ ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখতে পাই নি। আমার মনে হয়েছিল যে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করতে হবে এই কথা একটা বুদ্ধিজীবী সুলভ রোমান্টিকতা মাত্র। অবশ্য এই বিষয়ে আমার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব অনেক দিন ধরে চলতে থাকে।"[৬১] চাবন যখন দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে পারলেন তখন তিনি ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং এই আন্দোলনে একটা বিশেষ বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মানবেন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে অক্লান্তভাবে বাগযুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। মানবেন্দ্রনাথের মতে ফ্যাসিবাদ শুধুমাত্র কোন কোন আগ্রাসী রাষ্ট্রের কার্যক্রমের পদ্ধতি নয়, এটি একটি পশ্চাদপসরণের পূর্ণাঙ্গ দর্শন যা অনুসরণ করলে মানুষের ব্যক্তিত্বের

অবনতি ও তার নৈতিক প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিকৃতি ঘটতে বাধ্য। পুঁজিবাদের শেষ প্রতিরোধ এই ফ্যাসিবাদ, এবং তা সমস্ত আধুনিক প্রগতির বিরোধী। এই বিকৃত দর্শন কালের গতিকে পেছনে হটিয়ে নিয়ে মধ্যযুগীয় মনোভাবের দিকে মানুষকে ঠেলে দেয়। এর লক্ষ্যই হল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে চিরস্থায়ী করতে সাহায্য করা, আর আদর্শের দিক থেকে যুক্তিহীনতার দিকে মানুষকে নিয়ে যাওয়া। তিনি বলেছিলেন যে পুঁজিবাদকে রক্ষা করতে গিয়ে ফ্যাসিবাদ জার্মানীকে মধ্যযুগীয়তায় নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।[৬২]

পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থা ব্যক্তিমানুষকে একাকিত্বের পথে নিয়ে যায় এবং তার ফলে ব্যক্তিমানুষ সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। এই মারাত্মক নিঃসঙ্গতা থেকে ব্যক্তিমানুষকে উদ্ধার করতে গিয়ে ফ্যাসিবাদীরা রাষ্ট্রীয় একনায়কত্বের গুণগান করে এই উদ্দেশ্যে যাতে ব্যক্তিমানুষ আঁকড়ে ধরার জন্য একটা কিছু পায়।[৬৩] পুঁজিবাদী সমাজে এই নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ব্যক্তিমানুষ নিজের থেকেও বড় কিছুর ওপর নির্ভর করতে চায়। এই নির্ভরতার অন্বেষণে ব্যক্তিমানুষ স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় আশ্রয় খোঁজে; কিন্তু এই স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিমানুষকেই গ্রাস করে ফেলে।[৬৪]

মানবেন্দ্রনাথের ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের সমালোচনা

ফ্যাসিবাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ গান্ধীবাদ ও ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যের ওপরও আক্রমণ অব্যাহত রেখেছিলেন। শঙ্কর ও রামানুজের ভেতর তিনি মানসিক গোঁড়ামি ও মধ্যযুগীয় অর্থহীন পাণ্ডিত্যের প্রভাব দেখতে পান। তাঁর মতে বৌদ্ধ আন্দোলনের মুক্তিকামী শক্তির প্রতিবন্ধক ছিলেন শঙ্কর ও তাঁর ব্রাহ্মণ্যবাদ। পরজীবী, বিলাসী ও ব্রাহ্মণ্যবাদী পুরোহিতদের বিরুদ্ধে বুদ্ধদেব ছিলেন এক বিদ্রোহী শক্তির প্রতিনিধি।[৬৫] বৌদ্ধধর্ম একটা বিপ্লবাত্মক শক্তি যা মানবেন্দ্রনাথের মতে ব্রাহ্মণ্যবাদী কূট তর্ক ও পুরোহিতাচারের ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর আক্ষেপ ছিল যে কুসংস্কার ও গোঁড়ামির ভিত্তিতে ব্রাহ্মণ্যবাদী নীতি পরে বৌদ্ধ বিপ্লব-চেতনা ও বর্ণভেদবিরোধী শক্তিকে অভিভূত করে ফেলেছিল।

মানবেন্দ্রনাথ কখনই ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের যে প্রকাশ বিবেকানন্দ, অরবিন্দ এবং গান্ধীর মধ্যে হয়েছিল, সর্বশক্তি দিয়ে মানবেন্দ্রনাথ তার বিরোধিতা করেছিলেন। পাশ্চাত্য দেশগুলি সংশয় ও বিশ্বাসহীনতায় জর্জরিত এবং তারা ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের জন্য উন্মুখ হয়ে বসে আছে এই বিশ্বাসের তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর মতে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের প্রতি এই সমর্থন ও তার প্রচার শুধুমাত্র ভারতের অনগ্রসর প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার এক অপচেষ্টা মাত্র। ভারতীয় সভ্যতার 'আধ্যাত্মিক' যে দিকটাকে সনাতন ও অপরিবর্তনীয় বলে অনেকে গর্ববোধ

করতেন সেই দিকটাই সব চেয়ে আগে মানবেন্দ্রনাথ পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। মানবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে পাশ্চাত্যের অবনতি শুধুমাত্র পুঁজিবাদের অবনতি. আর পাশ্চাত্যের সভ্যতার সঙ্কট শুধুমাত্র বুর্জোয়া-শ্রেণীর সমাজব্যবস্থার সঙ্কট। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অধ্যাত্ম অভিমান আসলে একটি অতিমাত্রায় পার্থিব অভিযান। এর উদ্দেশ্য হল প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সামাজিক অবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সেই অবস্থাকে আদর্শ বলে আখ্যা দেওয়ার অপচেষ্টা। ভারতীয় অধ্যাত্মবোধ তাই বাস্তব বিচারে প্রতিক্রিয়াশীল সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতীক মাত্র।[৬৬]

মানবেন্দ্রনাথের মতে ভারতীয় দর্শন বা আদর্শবাদ পাশ্চাত্য দর্শন বা আদর্শবাদ থেকে বিশেষ কিছু সমৃদ্ধতর, উন্নততর বা বিচিত্রতর নয়। তিনি বলেছিলেন, "ভারতীয় চিন্তার আবেগানুভূতির দিক খ্রীষ্টান ভাব-কল্পের থেকে বেশী তো নয় বরং কমই হবে, আর বুদ্ধিজীবনের ক্ষেত্রেও ভারতীয় চিন্তা পাশ্চাত্য চিন্তা থেকে উৎকৃষ্ট নয়। লোকোত্তর রূপকথা রচনাতেও পাশ্চাত্য মন বিন্দুমাত্র কম উর্বর ছিল না। প্রথমসের মহাজ্ঞানীরা, আলেকজান্দ্রিয়ার তপস্বীরা, প্রাথমিক পর্যায়ের খ্রীষ্টধর্মের যাজক সম্প্রদায়, আর মধ্যযুগের মঠবাসী সন্ন্যাসীরা গর্বের সঙ্গে প্রাচ্যের তপস্বী ও চিন্তাবিদ্‌দের সঙ্গে যে-কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হতে পারতেন। নৈতিক মতবাদের দিক থেকেও ইহুদী, সক্রেটিসীয় ও স্টোইক ভাবধারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ভারতের সাধারণ মানুষ পাশ্চাত্যের সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশী নৈতিকতামণ্ডিত, ভাবাবেগে বেশী শুদ্ধাচারী, বা আদর্শে আরও নিষ্ঠাবান্ একথাও সত্যের অপলাপ মাত্র।"[৬৭]

আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ভারত পাশ্চাত্যের থেকে উন্নততর নয়। আসলে অধিকাংশ ভারতীয়ই পার্থিব সমস্যা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত কিন্তু সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার জন্য তারা ধর্মের মাধ্যমেই ভাবে। মানবেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন যে যেহেতু গান্ধী জনসাধারণের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাকে মেনে নিতে চেয়েছিলেন সেইজন্য জনগণ তাঁকে ধর্মগুরুর আসনে বসিয়েছিল। গান্ধীর নীতিবাদের মধ্যে মানবেন্দ্রনাথ খুব সামান্যই সুসংগত দার্শনিকতা খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর কাছে গান্ধীবাদ ছিল 'একরাশ মামুলি ভালো ভালো কথা আর পরস্পর-বিরোধী মতবাদ'। মানবেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, "বিংশ শতাব্দীর ভারতে যে গান্ধীর শিশুসুলভ মতবাদ এত আন্দোলন সৃষ্টি করতে পেরেছে তার থেকে ভারতের জনগণের সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার প্রমাণ পাওয়া যায়। হিন্দু দর্শনের সূক্ষ্ম বিচার সমগ্রভাবে ভারতীয় জনসাধারণের মননশীলতার পরিচয় বা নিরিখ নয়। এ শুধু এক স্বল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর অনুশীলন---যাঁরা আধুনিকতার এক হালকা আবরণের মধ্যে প্রাচীনতার জন্য হা-হুতাশ করছেন। হিন্দু দর্শনের এই সূক্ষ্ম বিচার ছিল সম্ভ্রান্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কল্পনাপ্রসূত এবং এই সম্প্রদায় শাসকশ্রেণীর সঙ্গে ক্ষমতা ও সুবিধা ভাগ করে নিয়ে বাস করছিল। গান্ধীর জনপ্রিয়তা এবং তাঁর ছেলেমানুষিকে মানব-জ্ঞানের চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়াটাই প্রমাণ করে যে ভারতীয় জনগণ পাশ্চাত্যের মানুষদের চেয়ে নৈতিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বেশী উন্নত নয়। আসলে ভারতীয়

জনগণ ধর্মীয় কুসংস্কারে মোহান্ধ। তা যদি না হত তবে গান্ধীবাদ সমাজে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা না পেয়ে অচিরেই মিলিয়ে যেত। ...গান্ধীবাদ নৈতিক দর্শন হিসাবে নয়, ধর্ম হিসাবেই গণমনকে দোলা দিয়েছে। ভারতের জনগণের মাথার মণি হয়েছিলেন যিনি তিনি না দার্শনিক, না নীতিবাদী। জনগণ তাদের শ্রদ্ধার্ঘ দিয়েছে এক মহাত্মাকে যিনি দৈবজ্ঞান ও অতিমানবিক ক্ষমতার অধিকারী বলে তারা মনে করেছে। গান্ধীবাদের সামাজিক ভিত্তি হচ্ছে সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা, আর তার মানসিক অবলম্বন হল কুসংস্কার।. .গান্ধীবাদের স্বর্গরাজ্য হল এক অনড় ও অপরিবর্তনশীল জগৎ যাতে বিরাজ করছে সম্পূর্ণ একটা সামাজিক স্থিতাবস্থা।"[৬৮]

মানবেন্দ্রনাথের মতে গান্ধী দর্শনের উদ্দেশ্য হল স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখা, প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণকে সহিংস বিদ্রোহের পথে না নিয়ে যাওয়া, এবং জনগণের অহিংস প্রতিবাদ কায়েম করা যাতে শক্তিশালীদের বর্তমান বৈষম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থা বজায় রাখতে বিশেষ বলপ্রয়োগ করতে না হয়। এই শান্তির দর্শনের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিষ্ক্রিয় অহিংসার মধ্যে জনগণকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা। মানবেন্দ্রনাথের মতে কোন সমাজই হিংসা বা বলপ্রয়োগকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে পারে না, এমনকি গান্ধীবাদীরাও অহিংসার নীতিকে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবে রূপদান করতে পারবেন না এবং সর্বাবস্থায় অহিংসার সর্বাত্মকতার নীতি তাঁরাও কার্যকর করতে পারেন না। মানবেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "গান্ধী-বাদের ধ্বজাবাহক বা প্রচারকদের তাদের নিজস্ব যুক্তির চরম পর্যায়ে পৌঁছলে নৈরাজ্যবাদে যেতে হবে, কিন্তু তাঁদের পর্যন্ত যাবার সততা বা সাহস তাদের নেই। যদি এই সাহস বা নির্ভীকতা থাকত তবে বলা যেত যে এই মতবাদের একটা বিশেষ গৌরব আছে। তা যা হোক, গান্ধীবাদ একটা স্থিতাবস্থার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে সুস্পষ্ট আদর্শবাদ, তাই গান্ধীবাদ আসলে স্থিতাবস্থায় সমাজকে ধরে রাখার এক প্রতিক্রিয়াশীল কার্যক্রম মাত্র।"

মার্ক্সবাদের সমালোচনায় মানবেন্দ্রনাথ

১৯১৯ সালে মেক্সিকোতে মানবেন্দ্রনাথ মার্ক্সবাদে দীক্ষা নেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর তিনি মার্ক্সপন্থী ছিলেন না। ১৯২৯ সালের জুলাই মাসে কমিনটার্ন তাঁকে বিতাড়িত করে। তারপর থেকে তিনি গোঁড়া মার্ক্সবাদ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে আসতে থাকেন। ১৯৪০ সালে মানবেন্দ্রনাথ মার্ক্সবাদ থেকে সরে র‍্যাডিকাল হিউম্যানিজম্ বা বৈপ্লবিক মানবতাবাদের দিকে যাত্রা শুরু করেন এবং র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট হিসেবে তিনি মার্ক্সবাদী পন্থার সমালোচনা শুরু করেন। মার্ক্সকে তিনি মানবতাবাদী ও মুক্তি-প্রেমিক বলে স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁর মতে মার্ক্সবাদের নৈতিক ভিত্তি দুর্বল। মার্ক্সবাদের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ওপর মানুষের মনের ভূমিকার স্থান যথোপযুক্ত বলে মনে না হওয়ায় মানবেন্দ্রনাথ সেটিকে ত্রুটিপূর্ণ বলে অভিহিত করেন।

মার্ক্সবাদ থেকে র‍্যাডিক্যালবাদে তাঁর উত্তরণের ধারাটি মানবেন্দ্রনাথ

নিজে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর 'সাইন্টিফিক পলিটিক্স্' নামক বইটির মুখবন্ধে। তিনি বলেন, "সাত বছর আগেও আমি গোঁড়া মার্ক্সবাদীদের মত বিশুদ্ধ মতবাদের থেকে চ্যুতি ও ভুল উপলব্ধির কথা বলেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট মতবাদ সংশোধন করে দেখার প্রবণতা তখনই একটি অবস্থান আমার মধ্যে দানা বাঁধছিল। শ্রেণীসংগ্রামের কথা যখন বলেছি তখনই সামাজিক সংগঠনে আমার সংহতির কথাও বলেছি। তাই মার্ক্সবাদকে শ্রেণীগত মতবাদের চেয়েও বড় কিছু বলে ভাবতে আমি চেষ্টা করেছি। পূর্বসূরীদের থেকে যে চিন্তা শুরু হয়েছিল সেই দর্শনের পরিণতি হিসেবে বস্তুগত প্রকৃতি, সামাজিক বিবর্তন এবং ব্যক্তিমানুষে ইচ্ছা ও অনুভূতির সমন্বয়ে এক মতবাদ হিসেবে মার্ক্সবাদকে আমি দেখতে চেষ্টা করেছি।"[৬৯] যে মানবেন্দ্রনাথ শ্রেণীসংগ্রামের বিশেষ প্রবক্তা ছিলেন এবং শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাস করতেন না বলে যে গান্ধীকে উপহাস করেছিলেন, তিনিই এই সময়ে শ্রেণীসংগ্রাম থেকে সরে এসে 'সামাজিক সংগঠনে সংহতির শক্তি'-র কথা বললেন।

১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মানবেন্দ্রনাথ নিজেকে গোঁড়া মার্ক্সবাদী না বলে 'র‍্যাডিক্যাল' বলে পরিচয় দিতেন। পরবর্তী কালে তিনি নিজেকে 'র‍্যাডিক্যাল' না বলে তাঁর ভাষায় 'সংহত বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদে' (integral scientific humanism) বা 'নব মানবতাবাদে' (New Humanism) বিশ্বাসী বলে পরিচয় দিতেন। মানবেন্দ্রনাথ যখন চিন্তাধারায় মার্ক্স-বাদ ছেড়ে নব মানবতাবাদে উপনীত হলেন প্রায় সেই সময়ে এবং তার কিছুকাল পরে আরও কয়েকজন ভারতীয় নেতার চিন্তাধারায়ও এই জাতীয় বিশেষ পরিবর্তন আসে; যেমন জয়প্রকাশ নারায়ণের ক্ষেত্রে, যিনি সমাজবাদ থেকে এলেন সর্বোদয়ে[৭০] এবং এম আর মাসানীর ক্ষেত্রে, যিনি সমাজবাদ থেকে এলেন উদারপন্থী মতবাদে (লিবারালিজম)[৭১] এবং পরে স্বতন্ত্র মতবাদে। পক্ষান্তরে, ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ এবং আরও অনেকে গান্ধীবাদ পরিত্যাগ করে গ্রহণ করলেন মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ।[৭২]

১৯৪৭ সালের অগাস্ট মাসে নব মানবতাবাদের ইশ্তাহারে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে এই মতবাদ কোন-রকম গোঁড়ামির ওপর গড়ে ওঠে নি, তা যুক্তি ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি বললেন যে মার্ক্সবাদকে গোঁড়ামির পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাই তাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। ইউরোপীয় রেনেসাঁর সময়ে যে ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদের সৃষ্টি হয়েছিল, যা আধুনিক বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছে, তারই ওপর ভিত্তি করে এক নূতন সমাজ-ব্যবস্থার কথা মানবেন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন। তিনি এই সময়ে যে রাজনৈতিক পদ্ধতির কথা বলেছিলেন তা হল- ভাল উদ্দেশ্যলাভের জন্য ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। তিনি বললেন, "সাফল্যই পদ্ধতির একমাত্র মান-দণ্ড এবং সাফল্য অর্জনের জন্য যে-কোন পদ্ধতি মেনে নেওয়া যেতে পারে— অধিকাংশ বিপ্লবীই এই মতবাদ গ্রহণ করেছে। কিন্তু বিপ্লবের চূড়ান্ত যুক্তি হচ্ছে নৈতিক---তাই নৈতিকতাবর্জিত পদ্ধতি কিছুতেই মেনে নেওয়া যেতে পারে না। নীতিহীন পদ্ধতি অনুসরণ করে নৈতিক সাফল্যে আসিতে পারে

না। কোন বিশেষ সঙ্কটের সময়ে বৃহত্তর স্বার্থে হয়ত সাময়িকভাবে কিছু কিছু বিষয়ে আপস করা যেতে পারে। কিন্তু যদি নৈতিক আদর্শ-বিরোধী এবং সনাতন মানবিক মূল্যবোধ-বিরোধী পদ্ধতিই বিপ্লবী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার স্থায়ী অঙ্গ হয়ে ওঠে তাহলে উপলক্ষ্যের কাছে লক্ষ্য পরাজিত হতে বাধ্য। সেই কারণেই নৈতিকতাবর্জিত কমিউনিস্ট রাজনৈতিক পদ্ধতি পৃথিবীর কাছে, এমনকি শ্রমিকশ্রেণীর কাছেও, কোনও নূতন স্বাধীনতার ও ন্যায়-বিচারের ব্যবস্থা নিয়ে আসতে পারে নি। বরং তা বিপ্লবের সৈনিকদের, শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রেণীর মানুষদের বুদ্ধিগত বিভ্রান্তিতে, আধ্যাত্মিক সঙ্কটে, অনুভূতিগত ব্যর্থতায় ও সাধারণভাবে নৈতিক অধঃপতনের গভীরে ডুবিয়ে দিয়েছে।"[৭৩] এ জাতীয় কথা, যে ভাল লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে নৈতিকতাবর্জিত পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে না, তা গান্ধীকেই স্মরণ করিয়ে দেয়, যাঁকে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের বেশীর ভাগ সময়ে সমালোচনাই করেছিলেন।

শেষের দিকে যদিও মানবেন্দ্রনাথ গান্ধীর পদ্ধতিগত শুচিতা স্বীকার করেন তবু মানবেন্দ্রনাথের কল্পনার সমাজ-ব্যবস্থা গান্ধীর 'রাম রাজ্য' থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্-ই ছিল। তাঁর নূতন সমাজ-ব্যবস্থার অনুপ্রেরণা গান্ধীর মত দেশীয় বা ভারতীয় ভাবধারা বা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে আসে নি, তা এসেছিল ইউরোপীয় উদারপন্থী ও মানবতাবাদী ঐতিহ্য থেকে। সমাজ-ব্যবস্থার অনুশীলনে তিনি পাশ্চাত্য বস্তুগত বিজ্ঞানের পদ্ধতি গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর 'র‍্যাডিক্যাল'দের মানবতাবাদী মতবাদ তাঁকে ঐ সময়ে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল।[৭৪]

এই জাতীয় মানবতাবাদী কল্পনা স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বজনীন; মানবেন্দ্রনাথ বললেন, এতে জাতি বা শ্রেণীর কথা না ভেবে একমাত্র মানুষের কথাই ভাবতে হবে। এই ধরনের চিন্তার ভিত্তির ওপরই 'নব মানবতাবাদ' গড়ে উঠবে—নব, কারণ আধুনিক সভ্যতার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও সামাজিক অভিজ্ঞতার দ্বারা এই মানবতাবাদ সমৃদ্ধ, বলিষ্ঠ ও বিধৃত।[৭৫] এই রকমের সমাজ হবে মানবতাবাদী ও নৈতিক; ধনতান্ত্রিক, ফ্যাসিস্ট বা অন্য যে-কোন ধরনের রাষ্ট্রের সীমানা বা গণ্ডীর ভেতর এই জাতীয় সমাজ আবদ্ধ থাকবে না।

র‍্যাডিক্যাল মানবতাবাদী হিসেবে মানবেন্দ্রনাথের দর্শন ছিল ব্যক্তি-ভিত্তিক। ঐ ব্যক্তিসত্তা কোনও শ্রেণী বা জাতির অধীন হয়ে পড়বে না। মানবেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদ এবং কমিউনিস্টদের শ্রেণীসংগ্রামের মতবাদ—এই দুটোকেই অস্বীকার করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "র‍্যাডিক্যালিজম্ জাতি বা শ্রেণীর কথা চিন্তা করে না; তার চিন্তা মানুষকে নিয়ে। তার কল্পনার স্বাধীনতা হল ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতা।"[৭৬] শ্রেণী অথবা জাতীয় সমষ্টিগত মানুষের মধ্যে ব্যক্তিসত্তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে না। মানবেন্দ্রনাথ আরও বললেন, "জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র কার্যতঃ সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্টদের শ্রেণীভিত্তিক রাষ্ট্র থেকে কিছু বেশী সুযোগ-সুবিধা ব্যক্তিকে দেয় না। আর কোন আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এখনও পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীতন্ত্রকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি।"[৭৭]

অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদে ফিরে গিয়ে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তি-সত্তাকে বিশ্ব-ব্যবস্থার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন যে শ্রেণীসংগ্রামের মার্ক্সবাদী নীতি শ্রেণী-সচেতনতাকে ব্যক্তি-সচেতনতার উর্ধ্বে আসন দিয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীকে সর্বোচ্চ আসন দেওয়ার জন্যও তিনি মার্ক্সবাদকে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন যে মার্ক্সের ভবিষ্যদ্বাণী যে সমাজ শোষকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাবে তা সত্য প্রমাণিত হয় নি, কারণ মধ্যবিত্তশ্রেণী অন্তর্হিত হয় নি। তাঁর মতে মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে থেকেই ভবিষ্যতে বিপ্লবের জন্ম হবে। মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভূমিকা লেনিন মেনে নিয়েছিলেন বলেই কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনে মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে আসা বিপ্লবী সদস্যদের এক বিশেষ ভূমিকা তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও মানবেন্দ্রনাথের মতে শ্রেণী হিসেবে মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিপ্লবাত্মক গুরুত্ব পরিপূর্ণভাবে লেনিন উপলব্ধি করেন নি।[৭৮]

মানবতাবাদী হিসেবে মানবেন্দ্রনাথ মার্ক্সবাদী শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। কোনরকম সমন্বয়ী শক্তি ব্যতিরেকে সমাজটিকে থাকতে পারে না এবং সেই কারণে শ্রেণীসংগ্রামই একমাত্র বাস্তব সত্য হতে পারে না।[৭৯] সামাজিক সংহতির এই মতবাদের সঙ্গে আধুনিক সমাজে সর্বাধিক প্রগতিশীল শক্তি হিসেবে মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভূমিকা সম্বন্ধে মানবেন্দ্রনাথের চিন্তা জড়িত।

মার্ক্সবাদে যেমন শ্রমিকশ্রেণীর বিশেষ স্থান রয়েছে, মানবেন্দ্রনাথের এই সময়কার চিন্তায় তেমনি মধ্যবিত্তশ্রেণীর একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। আসলে মানবেন্দ্রনাথ শ্রেণীর ওপর জোর না দিয়ে ব্যক্তির ওপর জোর দেন, আর যখন শ্রেণী সম্বন্ধে কথা বলেন তখন তিনি মধ্যবিত্তশ্রেণীকেই সর্বোচ্চ আসন দেন, শ্রমিকশ্রেণীকে নয়। এমন কি প্রলেটারিয়েট শ্রেণীকে তিনি সমাজের সব চেয়ে অনগ্রসর অংশ বলেই অভিহিত করেন।[৮০] মানবতাবাদী হিসেবে মানবেন্দ্রনাথ সর্বহারার একনায়কত্ব ও শ্রেণীসংগ্রামের অনিবার্যতা ও প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন। আসলে তিনি শ্রেণীর থেকে ব্যক্তিকেই বেশী প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন, তা সে মধ্যবিত্তশ্রেণীই হোক বা শ্রমিকশ্রেণীই হোক। মানবেন্দ্রনাথের মতে বর্তমান যুগের দ্বন্দ্ব একনায়কত্ব ও গণতন্ত্রের মধ্যে, একদিকে সর্বগ্রাসী সমষ্টিবাদ---তা জাতিভিত্তিকই হোক বা শ্রেণীভিত্তিকই হোক এবং অপরদিকে মুক্তি-সংগ্রামী ব্যক্তিসত্তা।[৮১]

মানবেন্দ্রনাথ বলেন যে মার্ক্সবাদ সর্বহারার একনায়কত্ব ও বিপ্লবের ওপর যে গুরুত্ব দিয়েছে তা সমাজকে স্বৈরতন্ত্রের দিকেই নিয়ে যাবে। তাই তিনি বিপ্লবের ব্যাপারে রোমান্টিক মোহান্ধতা সম্বন্ধে সতর্ক করে দেন। বিপ্লব অলৌকিক কিছু ঘটাতে পারে না। তাই প্রয়োজন হল যুক্তি ও রোমান্টিকতার সঠিক সমন্বয়। যদিও তাঁর রাজনৈতিক অভিধান থেকে মানবেন্দ্রনাথ 'বিপ্লব' কথাটি তুলে দেন নি, তবুও মানবতাবাদী হিসেবে তিনি বলেন যে সশস্ত্র হিংসা বা শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে বিপ্লব আসবে না, বিপ্লব আসবে মানবতাবাদী শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে।

'শিক্ষা' শব্দটি মানবেন্দ্রনাথ এক ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছিলেন

---জনসাধারণকে বোঝানোর জন্য যত উপায় অবলম্বন সম্ভব তা সমস্তই তার ভেতর থাকবে। কিন্তু শিক্ষার মাধ্যমে পরিবর্তন ধীরগতিতে ও ক্রমানুপুর্বিকভাবে আসে, 'বিপ্লব' বলতে সাধারণতঃ যা বোঝায় সে-রকম অচিরাৎ বা হঠাৎ কিছু শিক্ষার মাধ্যমে ঘটে না। বিপ্লবের জন্য যে শিক্ষা-পদ্ধতির কথা মানবেন্দ্রনাথ বলেছেন তা দাদাভাই নওরোজী, রানাডে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রমুখ পুরাতন নরমপন্থী ও উদারপন্থীদের সাংবিধানিক পদ্ধতির থেকে খুব আমূল পৃথক্ কিছু ছিল না। ভারতীয় উদারপন্থীরাও জনসাধারণকে বোঝানোর ওপর এবং তাদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের ব্যাপারে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। ইতিহাসের এক আশ্চর্য পরিহাস যে, যে মানবেন্দ্রনাথ জঙ্গী জাতীয়তাবাদী হিসেবে প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন এবং পরে মার্ক্সীয় বিপ্লবের নীতির প্রবক্তা হয়েছিলেন, তিনিই শেষ পর্যায়ে বিবর্তনমূলক সাংবিধানিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন। তবে এই প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখযোগ্য যে ভারতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যখন উদারপন্থীরা তাদের আন্দোলন শুরু করেছিলেন সেই সময়কে মানবেন্দ্রনাথ ভারতে ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলে আখ্যাও দিয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালের ৫ই ডিসেম্বর তিনি লিখেছিলেন, "আমার বিশ্বাস, ভারতের ইতিহাসে কখনও স্বর্ণযুগ যদি এসে থাকে তবে তা উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এসেছিল---এই ঐতিহাসিক সত্যকে আমরা যেন ভুলে না যাই।"[৮২]

মানবতাবাদী হিসেবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিসত্তার ভূমিকার ওপর মানবেন্দ্রনাথের প্রগাঢ় আস্থা ছিল। ব্যক্তিসত্তার ওপর তাঁর বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি রাজনৈতিক দল বা সংগঠিত গণতন্ত্রের ওপরও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। একেবারে মৌলিক স্তর থেকে তিনি গণতন্ত্র সংগঠনের কথা বলেছিলেন, যে গণতন্ত্রে একমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতেই রাষ্ট্রশাসনে পরিচালকেরা নিযুক্ত হবেন। কিন্তু এই শাসন-পরিচালনার যোগ্যতা বিচার করবে কে এবং কি পদ্ধতিতে, এ প্রশ্নের খুব পরিষ্কার উত্তর তিনি দেন নি।

রাজনৈতিক জীবন থেকে রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বই মানবেন্দ্রনাথ মুছে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখানেও তিনি এই প্রশ্নের খুব পরিষ্কার জবাব দিলেন না যে রাজনৈতিক দলের অবর্তমানে কেমন করে আধুনিক গণতন্ত্র চলতে পারে। সংগঠিত দল সম্বন্ধে মানবেন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা সুখের হয় নি। যৌবনে তিনি ভারতীয় সন্ত্রাসবাদী ও বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু ভারতীয় বিপ্লবের জন্য বিদেশ থেকে বিশেষ অস্ত্রশস্ত্র বা টাকাকড়ি তিনি আমদানি করতে পারেন নি। জাতীয়তাবাদ থেকে কমিউনিজমে দীক্ষিত হবার পর তিনি লেনিনের পৃষ্ঠপোষকতাও পেয়েছিলেন এবং বেশ কয়েক বছর কমিন্টার্নের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন, কিন্তু ১৯২৯ সালে তিনি কমিন্টার্ন থেকে বহিষ্কৃত হন। তারপর ভারতে ফিরে এসে তাঁকে দীর্ঘ ছয় বছর কারাজীবন ভোগ করতে হয়েছিল। কারামুক্তির পর তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানেও তিনি কোন প্রভাব বা প্রতিপত্তির আসন পান নি। নানা বিপদের

মধ্যে সাহসিকতার সঙ্গে তিনি বেঁচে ছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে তাঁকে একাধিক নৈরাশ্যের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। রাজনীতিতে তাঁর হতাশা এত গভীর হয়েছিল যে জীবনের শেষ দিকে তিনি রাজনৈতিক দলের [illegible] রাজনীতি থেকে মুক্ত দেশের মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। প্রখর মনীষা ও বিপ্লবী চেতনা থাকা সত্ত্বেও কোনও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই মানবেন্দ্রনাথ স্থায়ী আসন পান নি এবং শেষ-জীবন তাঁর অতিবাহিত হয় দেরাদুনের রেনেসাঁ ইনস্টিটিউটে।

মানবতাবাদী হিসেবে মানবেন্দ্রনাথ মার্ক্সবাদের কয়েকটি মৌলিক সমালোচনা করেন। তার মতে মার্ক্সবাদ প্রলেটারিয়েট ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে নি। অতীতে যেমন সামন্ততন্ত্রের উৎখাত করতে বুর্জোয়াশ্রেণী বিপ্লবাত্মক ভূমিকা নিয়েছিল, সেইরকম বিংশ শতাব্দীতে অপর এক শ্রেণী, যথা মধ্যবিত্তশ্রেণী, বিপ্লবাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু মার্ক্সবাদীদের মতে আধুনিক শিল্প-সভ্যতায় কেবলমাত্র দুটি শ্রেণীই থাকবে, শোষকশ্রেণী আর শ্রমিকশ্রেণী, আর মধ্যবিত্তশ্রেণী অবলুপ্ত হয়ে যাবে। মানবেন্দ্রনাথ বললেন যে এই মধ্যবিত্তশ্রেণী অবলুপ্ত তো হবেই না, বরঞ্চ আধুনিক সমাজে তারাই ক্রমবর্ধমানভাবে প্রগতিশীল ভূমিকা নেবে।

মার্ক্সবাদের সমালোচনা করার সময় এবং বামপন্থী মানবতাবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মানবেন্দ্রনাথ মার্ক্সবাদকে অবশ্য একেবারে উড়িয়ে দেন নি। মার্ক্সবাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল নিবিড় এবং তার প্রভাব থেকে তিনি কোন দিনই সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হন নি। মানবতাবাদী হয়েও মানবেন্দ্রনাথ তাই বলেছিলেন যে মার্ক্সবাদ হল 'বাস্তব প্রকৃতি, সামাজিক বিবর্তন ও ব্যক্তিমানুষের ইচ্ছা ও অনুভূতির সমন্বয়-সাধন-প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি'।[৮৩]

মার্ক্সবাদের প্রতি আংশিক আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও মানবতাবাদী হিসেবে মানবেন্দ্রনাথ আর ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন নি। মার্ক্সবাদের বস্তুবাদ এবং অস্তিত্বই সব কিছুর নিয়ামক, এইসব মতের প্রভাব মানবেন্দ্রনাথের ওপর কিছুটা থাকলেও তিনি দাবি করেছিলেন যে ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা বস্তুবাদ দর্শন অনুযায়ী একমাত্র ব্যাখ্যা এ কথা সত্য নয়।[৮৪] মানবেন্দ্রনাথের মতে অস্তিত্বের জন্য জৈবিক যুদ্ধকে জীবিকার্জনের প্রয়োজনে অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এক করে দেখা ঠিক হবে না।[৮৫] তিনি বলেছিলেন যে মার্ক্সবাদী ইতিহাসতত্ত্ব দৈহিক ইচ্ছার সঙ্গে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যকে এক করে ভুল করেছেন। তাঁর মতে জীবিকার্জনের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের আগে এসেছিল আত্মরক্ষার জৈবিক তাড়না, ঠিক যেমনভাবে উৎপাদনের উপায় সম্বন্ধে চিন্তা বাস্তব উৎপাদনের আগে এসেছিল।

মার্ক্সীয় দ্বন্দ্ববাদের প্রতিও মানবেন্দ্রনাথ আন্তরিক সমর্থন জানাতে পারেন নি। যুক্তিশীলতার পদ্ধতি বা অনুসন্ধানের রীতি হিসেবে দ্বন্দ্ববাদকে তিনি স্বীকার করে নেন। কিন্তু তর্কশাস্ত্রের সঙ্গে তত্ত্বকে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয় এবং মননশীলতার নীতির সঙ্গে প্রাকৃতিক বিবর্তনের বিবরণী বা

বাস্তবতাকে এক করে ফেলা উচিত নয়। মানবেন্দ্রনাথ মার্ক্সীয় দ্বন্দ্ববাদের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে এতে দার্শনিক বিদ্যার একটি শাখার সঙ্গে সেই বিদ্যালোচনার পদ্ধতিগুলিকে ভ্রান্তভাবে মিশিয়ে ফেলা হয়েছে।[৮৬] মানুষের চিন্তা দ্বান্দ্বিক পথে গেলেও প্রকৃতির ও ইতিহাসের পদ্ধতি সর্বদাই দ্বান্দ্বিক পথে যায় বা যেতে বাধ্য এ কথা মনে করা ভুল। 'বস্তু'-চরিত্র সম্বন্ধে আধুনিক পদার্থবিদ্যার আবিষ্কার তত্ত্বশাস্ত্রের দ্বান্দ্বিক মতবাদকেও সমর্থন করে না। আবার গণতন্ত্রবাদের সমাজতন্ত্রবাদে বিবর্তন দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে হয় না, হয় ক্রমিক পদ্ধতিতে।[৮৭] মানবেন্দ্রনাথ দ্বান্দ্বিকবাদকে যুক্তিশাস্ত্র ও পদ্ধতিশাস্ত্রের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে দ্বান্দ্বিকতা প্রকৃতি বা ইতিহাসের বিবর্তন-ধারার সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে জড়িত নয়।

মার্ক্সবাদী বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিকবাদকে পূর্ণ স্বীকৃতি না দিলেও, মানবেন্দ্রনাথ তাঁর ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বের সমালোচনায় একজন খাঁটি মার্ক্সপন্থী ছিলেন। তিনি যুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ধর্মতন্ত্র ও ঐতিহ্যবাদের তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। বস্তুতঃ তিনি ফয়েরবাকের মত ধর্মতত্ত্বের মূল উৎস নৃতত্ত্বের মধ্যে অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন।

মানবেন্দ্রনাথ মার্ক্সীয় মতবাদের উদ্বৃত্ত মূল্য (surplus value) ও শ্রেণীসংগ্রামের নীতির সমালোচনা করেছিলেন। উদ্বৃত্ত মূল্য ধনতন্ত্রের এক বৈশিষ্ট্য, এই মতবাদ তিনি স্বীকার করেন নি। বস্তুতঃ ভোগের জন্য যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী উৎপাদন না হলে এবং সেই উদ্বৃত্ত পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ না হলে, কোন সমাজই প্রগতিশীল হয়ে উঠতে পারে না, আর মূলধন গড়ে তুলতে পারে না। উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করা ছাড়া মূলধন সঞ্চিত হতে পারে না এবং মূলধনের সঞ্চয় ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নতি অসম্ভব। ধনতান্ত্রিক সমাজের মূলধন-সঞ্চয় দোষণীয় নয়। বরং মানবেন্দ্রনাথের মতে, যে ধনতান্ত্রিক সমাজ মূলধন-সঞ্চয়ে সহায়তা করে সে সমাজ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে অর্থনৈতিক বিচারে অনেক উন্নত ধরনের। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কেবলমাত্র তার ভোগ্য বস্তুই উৎপাদন করত এবং উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করতে পারত না বলেই মূলধনও সেখানে সঞ্চিত হত না।[৮৮]

যে ধনতান্ত্রিক সমাজ উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে এবং তার ফলে মূলধন-সঞ্চয়ের পথ সুগম করে দেয়, সে সমাজ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে উন্নততর। মানবেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, "শ্রমিকদের শোষণের ভিত্তিতে ধনতন্ত্র গড়ে ওঠে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি সমগ্র সমাজকেও একটা উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যায়। যেহেতু শ্রমিকশ্রেণী সমগ্র সমাজের একটা অংশ তাই সর্বপ্রকার শোষণ সত্ত্বেও পুঁজিপতিদের স্বার্থের সঙ্গে তাদের স্বার্থও জড়িত।"[৮৯] সমাজতান্ত্রিক সমাজেও উদ্বৃত্ত মূল্য ও মূলধনের প্রয়োজন। তবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে ধনতান্ত্রিক সমাজের মূলগত প্রভেদ এই যে, ধনতান্ত্রিক সমাজের মত কোন বিশেষ শ্রেণী সেই উদ্বৃত্ত মূলধন আত্মসাৎ করে না, তা সামগ্রিক স্বার্থে ব্যবহৃত হয়।

মানবেন্দ্রনাথ ধনতন্ত্র বা বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করেন নি এবং এ কথাও মনে করেন নি যে একটি শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে বিকৃত করে দিয়েছে। সমস্ত সংস্কৃতির ভেতরই কালনিরপেক্ষ মূল্য রয়েছে এই বিশ্বাস মানবেন্দ্রনাথের ছিল। তাই তিনি বলেছিলেন, "এই সব মূল্যকে স্বীকৃতি না দিলে আমরা সমস্ত বৃহত্তর মূল্যমানকে অস্বীকার করে ফেলব। এটা ঠিক নয় যে সামন্ততন্ত্র যা কিছু সৃষ্টি করেছে, সামন্ততন্ত্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে হবে। সেটাই যদি সামাজিক উন্নতির পূর্ব শর্ত হত তবে প্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যেত এবং তা হলে আজ আমরা মধ্যযুগের থেকেও অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে বাস করতাম।" যে নীতি কেবল শ্রেণী-বিরোধের ভিত্তিতে ইতিহাস ব্যাখ্যা করে কিংবা শ্রেণীসংগ্রাম বা শ্রেণী-বিরোধের জয়গান করে সেই নীতি মানবেন্দ্রনাথ মেনে নেন নি।

শ্রেণীসংগ্রামের মার্ক্সবাদী বিপ্লবের নীতি অস্বীকার করলেও মানবেন্দ্রনাথ 'বিপ্লব' কথাটা একেবারে বর্জন করেন নি। মানবতাবাদী হিসেবে তিনি বামপন্থী মানবতাবাদী বিপ্লবের কথা বলেছিলেন। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে 'বিপ্লব' কথাটি তিনি মার্ক্সপন্থীদের থেকে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। মানবেন্দ্রনাথের বিপ্লব কোন সশস্ত্র অভ্যুত্থান বা হিংসার দ্বারা সাধিত হবে না, হবে শিক্ষা-বিস্তারের পদ্ধতিতে যা অনেকটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

এ ছাড়া মানবতাবাদী হিসেবে মানবেন্দ্রনাথ সমস্ত উৎপাদন-পদ্ধতির রাষ্ট্রীয় মালিকানা নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। রাষ্ট্রীয় মালিকানার জায়গায় তিনি সমবায় মালিকানার প্রসার ও বিস্তার চেয়েছিলেন। অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা যা যে-কোন সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তাকে অবশ্য মানবেন্দ্রনাথ পুরোপুরি বর্জন করেন নি। কিন্তু তিনি যে পরিকল্পনায় বিশ্বাস করতেন তা হচ্ছে জাতীয় ও গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা, যা স্বতঃপ্রণোদিত সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠবে।

জীবনের শেষভাগে মানবেন্দ্রনাথ ক্রমেই বেশী করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে ও উদারনীতিতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। যে মানবেন্দ্রনাথ মেক্সিকোতে মার্ক্সবাদে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তিনি মার্ক্সবাদী হিসেবে জীবন শেষ করেন নি, করেছিলেন একজন মানবতাবাদী হিসেবে। শেস বয়সে তিনি উদার-নীতির মৌলিক ধারণাগুলি প্রচার ও সেগুলিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তি-বাদের সংমিশ্রণে এক নূতন মতবাদের মাধ্যমে প্রসার করতে চেয়েছিলেন। মানবেন্দ্রনাথ দাবি করতেন যে প্রতিটি সংগ্রামী মানুষের কর্তব্য হল প্রত্যেক ব্যক্তিসত্তাকে তার নিজস্ব যুক্তিশীলতা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা এবং এক বিশ্বজনীন মুক্ত সমাজে নিজের সঙ্গে অন্যের ঐক্য স্থাপন করা। তাঁর চূড়ান্ত বিশ্বাস সম্বন্ধে তিনি বলেন, "মানুষ শূন্য থেকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয় নি। সে এসেছে বস্তুজগতের বুকে এক দীর্ঘ জৈবিক বিবর্তনের পথে। তার জন্মের নাড়ি কোনদিনই ছিঁড়ে যায় নি---মানুষ তার ইচ্ছা, মন ও বুদ্ধি নিয়ে বস্তুজগতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই বস্তুজগৎ এক সুনিয়ন্ত্রিত বিশ্বলোক। সুতরাং মানুষের অস্তিত্ব ও বিকাশ, তার অনুভূতি, ইচ্ছা ও

চিন্তা---এ সবই নির্দিষ্ট; মানুষ অপরিহার্যভাবে যুক্তিশীল। মানুষের মধ্যেকার যুক্তিশীলতা বিশ্বসংসারে সমন্বয়-পদ্ধতির প্রতিধ্বনি মাত্র। নৈতিকতা আসলে মানুষের নিজস্ব যুক্তিশীলতার প্রকাশ; মানুষের এই নিজস্ব যুক্তিশীলতাই সুশৃঙ্খল সংসারের একমাত্র ভিত্তি। এবং এইটাই নৈতিক সংসার, কারণ নৈতিকতা যুক্তিশীলতারই কর্মপ্রয়াস। তাই সমস্ত সামাজিক প্রয়াসের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানুষকে তার এই নিজস্ব যুক্তি-শীলতা সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন করে তোলা।"[৯০]

স্বাধীন ভারত ও নেহেরুর সমাজতান্ত্রিক নীতি

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরই প্রশ্ন ওঠে, কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতাসীন নেহেরু কি তাঁর প্রচারিত সমাজতন্ত্রের নীতি তখনই পুরোপুরি প্রতিষ্ঠার কাজে নামবেন? এই সময়ে বাণিজ্যিক মহলে বিশ্বাসের ভিত্তিতে এক সঙ্কট দেখা দেয়; একজন প্রতিষ্ঠিত সমাজবাদী দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় শিল্পপতিরা কিছুটা আশঙ্কিত হয়েছিলেন এবং সরকারের শিল্পনীতি ঘোষণা না করা পর্যন্ত মূলধন বিনিয়োগে এক ধমথমে ভাব দেখা দেয়। ১৯৪৮ সালে সরকারের শিল্পনীতি ঘোষিত হয়। এই নীতিতে অস্ত্র-নির্মাণ, পারমাণবিক এবং রেল শিল্পের সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয়করণের কথা বলা হয়; অন্য কতকগুলি শিল্প, যেমন কয়লা, লৌহ ও স্টীল এবং বিমান নির্মাণ ও খনিজ শিল্পের ক্ষেত্রে নূতনতর উদ্যোগকে রাষ্ট্রীয় আয়ত্তে আনার কথাও বলা হয়; কিন্তু পুরাতন চালু কলকারখানা ইত্যাদি অন্ততঃ দশ বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রীয়করণ হবে না— এ আশ্বাস দেওয়া হয়। আর বাকী শিল্প ব্যক্তি-উদ্যোগের জন্য খোলা থাকবে এই কথাও ঘোষণা করা হয়। এই শিল্পনীতির মধ্যে জাতীয়করণের কোন বৈপ্লবিক কর্মসূচী ছিল না। আসলে এই নীতি গড়ে উঠল সমাজবাদী নেহেরু ও [illegible] রক্ষণশীল [illegible] মধ্যে এক পারস্পরিক [illegible]। [illegible] সমাজবাদী কর্মীরা পুরোপুরি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না, [illegible] করেছিলেন যে তাঁর দল [illegible] সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক নীতির জন্য প্রস্তুত ছিল না। সরকারের [illegible] বিষয়ক নীতিকে 'পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণ' [illegible] কারণ এতে বলা হয়েছিল যে জাতীয়করণ শুধু সেই সব ক্ষেত্রে চালু করা হবে যেখানে ব্যক্তি-উদ্যোগ হয় ছিল না, না হয় [illegible] চাহিদা মেটাতে অসমর্থ ছিল।

এই সময়ে নেহেরু যে নীতি গ্রহণ করলেন তা সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক ছিল না বটে, কিন্তু তা হলেও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছিল নেহেরুর একটি প্রিয় নীতি।

নেহেরু যখন ক্ষমতাসীন তখন তিনি পরিকল্পনার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন কিন্তু খুব বেশী রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। ১৯৫৮ সালে নেহেরু বলেছিলেন যে তিনি সেই জাতীয় সমাজতন্ত্র চান না যেখানে রাষ্ট্রই সর্বশক্তিমান্ এবং প্রায় সব ক্রিয়াকর্মই রাষ্ট্রের অধীন। তিনি চেয়েছিলেন অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। তিনি বলেছিলেন, "We cannot, of course, decentralise iron and steel and locomotives and such other big industries but you can have small units of industries as far as possible in a general way".[১]

নেহেরু একই সঙ্গে পরিকল্পনা-প্রযোজনা এবং প্রজাপরিমিতিতে বিশ্বাসী ছিলেন, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রে আস্থাবান্ ছিলেন এবং সেই কারণেই

তিনি ভারতবর্ষের জন্য একটি মিশ্র-অর্থনীতি চেয়েছিলেন যেখানে ব্যক্তি-উদ্যোগ এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ পাশাপাশি কাজ করবে, তবে সমস্তটাই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা-বিষয়ক নীতির ভিত্তিতে।

১৯৩৩ সালে নেহেরু সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন যে তাতে উৎপাদন, বন্টন ও বিনিময় ব্যবস্থায় থাকবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ[২] এবং ১৯৩৬ সালে কংগ্রেস সভাপতির ভাষণে তিনি সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা করেছিলেন সমাজের কাঠামোতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে সমস্ত কায়েমী স্বার্থের অবসান বলে।[৩] প্রায় সেই সময়েই তাঁর আত্মজীবনীতে (১৯৩৬) তিনি বলেছিলেন যে যা-কিছু এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বিরোধিতা করবে, তা যদি সম্ভব হয়, শান্তিপূর্ণভাবে সরিয়ে দিতে হবে আর যদি প্রয়োজন হয়, তবে বলপূর্বক সরিয়ে দিতে হবে।[৪] কিন্তু ১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নেহেরুর সামনে প্রশ্ন ছিল, অতীতে তিনি যে আদর্শ প্রচার করেছিলেন ও যে পদ্ধতির সমর্থন করেছিলেন তার কতখানি সেই সময়কার পরিবর্তিত ও পরিবর্তনশীল ভারতে কার্যকর করা সম্ভব হবে। একটি গণতান্ত্রিক জন-মনোনীত রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে নেহেরু কোনও সহিংস বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি এবং তিনি শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পথই বেছে নিয়েছিলেন।

ক্ষমতাসীন যুগে নেহেরু ছিলেন একজন প্রজ্ঞাপরিমিত সমাজবাদী—যিনি মিশ্র-অর্থনীতিতে বিশ্বাস করতেন। এই কারণে কমিউনিস্টরা এবং নেহেরুর কিছু পূর্ব যুগের ভক্তরা অভিযোগ করেন যে নেহেরু সামাজিক বিপ্লবে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিতে পারেন নি। যদিও নেহেরু কমিউনিস্টদের মতই শ্রেণীহীন সমাজে বিশ্বাস করতেন তবু তিনি সর্বদাই সমাজতন্ত্র গণতন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন এবং কমিউনিস্ট পরিকল্পনা-প্রসূত বাধ্যতামূলক পদ্ধতি পরিহার করতে চেয়েছিলেন। অনেকে সন্দিগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করেছেন—বলপ্রয়োগ ছাড়া কমিউনিস্ট উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব কি না এবং সেই পুরাতন প্রশ্ন তুলেছেন রুশ রক্তপাত ব্যতীত রুশ সাফল্য পাওয়া যায় কি-না। নেহেরু অবশ্য শেষ অবধি সমন্বয়বাদী সমাজতন্ত্র ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতেই প্রতিষ্ঠা করার ওপর বিশ্বাস রেখেছিলেন।

স্বাধীনতা-উত্তর কালে কংগ্রেসের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক নীতি-নির্দেশ ঘটে ১৯৫১-৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ইস্তাহারে। এই ইস্তাহারে বলা হল যে দেশের প্রগতি নির্ভর করছে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিকল্পনা-প্রয়োজনার ওপর। শিল্পে 'ল্যাজেফেয়ার' (laissez-faire) নীতি মেনে নেওয়া সম্ভব নয়; কংগ্রেসের বহু পুরাতন নীতিই হল যে মৌলিক শিল্পগুলি রাষ্ট্রের আয়ত্তে থাকবে এবং যদিও ব্যক্তি-উদ্যোগের জন্য একটি বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা উন্মুক্ত থাকবে যাতে দেশে প্রকৃত মিশ্র-অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারে, তবুও ব্যক্তি-উদ্যোগকে পরিকল্পনার উদ্দেশ্যকে স্বীকার করে নিতে হবে এবং তার মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলতে হবে।

এই নির্বাচনী ইস্তাহারের মুখ্য বক্তব্যগুলি পরে প্রথম পাঁচশালা

পরিকল্পনার (১৯৫১—৫৬) অন্তর্ভুক্ত হয়। এই পরিকল্পনাটি অবশ্য পরবর্তী পরিকল্পনাগুলির তুলনায় অনেক নরমপন্থী ছিল। আসলে এই পরিকল্পনাটি প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের পরিকল্পনা-বিভাগ ও তার উত্তরসূরী পরিকল্পনা-বিষয়ক উপদেষ্টা পরিষদের অনুমোদিত কয়েকটি যোজনাকে একটা সুসম্বদ্ধ আকার দিয়েছিল মাত্র। এই পরিকল্পনায় প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয় কৃষিতে। বিনিয়োগের এক-তৃতীয়াংশই কৃষিতে বণ্টন করা হয়েছিল। আর একটি বৃহৎ অংশ, প্রায় শতকরা ২৩ ভাগ, নির্দিষ্ট করা হয়েছিল পরিবহণ ও সড়ক নির্মাণের অগ্রগতির জন্য। কৃষি, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিনিয়োগের উদ্দেশ্য ছিল খাদ্য সরবরাহ-ব্যবস্থায় উন্নতি সাধন করা এবং সেই সঙ্গে খাদ্য আমদানী-জনিত বিদেশী মুদ্রার ব্যয় সঙ্কোচ করা। বস্তুতঃ প্রথম পরিকল্পনার দুই-তৃতীয়াংশ অর্থ দেওয়া হয়েছিল কৃষি, সমাজ-উন্নয়ন, সেচ, বিদ্যুৎ-উৎপাদন, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য। শিল্পে বিনিয়োগ সম্বন্ধে বলা হয়েছিল যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তার প্রতি আরও গুরুত্ব দেওয়া হবে। প্রথম পরিকল্পনার ব্যয়ের শতকরা মাত্র ১০ ভাগ শিল্পের উন্নতিতে ধার্য করা হয়। প্রথম পরিকল্পনা কিছু পরিমাণে সাফল্য অর্জন করে। পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় বাড়ে শতকরা ১৮ ভাগ আর জনসংখ্যা বাড়ে শতকরা ৬ ভাগ। মাথাপিছু বাৎসরিক আয়ও কিছুটা বাড়ে, আর মূলধন ও ভোগ্য পণ্যের উৎপাদনও উল্লেখযোগ্য-ভাবে বৃদ্ধি পায়।

১৯৫৫ সালের জানুয়ারীতে প্রথম পরিকল্পনা চলাকালীন ঐতিহাসিক আবাদী সম্মেলনে কংগ্রেস ঘোষণা করে যে কংগ্রেস সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদ এবং ভারতীয় সংবিধানের উপক্রমণিকা (Preamble) ও রাষ্ট্র-নীতির নির্দেশ (Directive Principles of State Policy) অধ্যায়ের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্য হবে দেশে সমাজ-তান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ প্রতিষ্ঠা। এই প্রথম কংগ্রেস সরকারীভাবে সমাজ-বাদী বিশ্বাস মেনে নিল। কিন্তু আসলে এ প্রস্তাব কংগ্রেস সংবিধানেই যে সমতাভিত্তিক সমবায় সমাজের (কোঅপারেটিভ কমনওয়েলথ) কথা বলা হয়েছে তারই চূড়ান্ত প্রকাশ।

আবাদী প্রস্তাব মুখ্যতঃ নেহেরুর অবদান। এই প্রস্তাবের আদি সূত্র ছিল ১৯৩১ সালের করাচী কংগ্রেসের প্রস্তাব, যাতে বলা হয়েছিল যে মৌলিক ও অন্য কয়েকটি শিল্প রাষ্ট্রের আয়ত্তে থাকবে। খুব সম্ভবতঃ এই প্রস্তাব গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে নেহেরুর চীনভ্রমণ তাঁকে এই উপলব্ধি দেয় যে সমাজতন্ত্রের দিকে ভারতের অগ্রগতি আরও ত্বরান্বিত করতে হবে। চীন থেকে ফিরে এসে নেহেরু চীনা পদ্ধতি ও ভারতীয় সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে তুলনা করেন। কিন্তু তিনি এও জানতেন যে এশিয়ার নিরপেক্ষ জাতিরা চীন ও ভারত—এই উভয়ের দিকেই তাকিয়ে আছে এবং লক্ষ্য করছে অর্থনৈতিক উন্নতি দ্রুততর হয় কোন্ পদ্ধতিতে—গণতান্ত্রিক না কমিউনিস্ট পদ্ধতিতে। ভারতের গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে পরিকল্পনা কমিশন বলেন যে ভারতের পরিকল্পনা পরীক্ষা পৃথিবীতে অন্য যে কোন তুলনীয় পরীক্ষার চেয়ে অনেক বেশী বৃহৎ ও জটিল এবং তাঁদের

ভাষায়, "What is on trial is, in the last analysis, whether democracy can solve the problems of mass poverty."

আবাদী প্রস্তাবে উল্লিখিত সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ কি সমাজতন্ত্রের থেকে পৃথক্? এ প্রশ্নের উত্তরে নেহেরু বলেছিলেন, না। ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে তিনি বলেন, "Some people seem to make fine distinctions among socialistic pattern, socialist pattern and socialism. They are exactly the same . . . But what they are is not such a very easy thing to define."

আবাদী প্রস্তাব গৃহীত হবার পর প্রশ্ন ওঠে—কমিউনিস্টরা কি তখনও কংগ্রেসের পুরোপুরি বিরোধিতা করে যাবে, না নেহেরুকে তাঁর সমাজতান্ত্রিক নীতি-রূপায়ণে সমর্থন জানাবে। ভবানী সেন, অন্যতম কমিউনিস্ট নেতা, বললেন যে নেহেরু সত্যিই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী নীতি কার্যকরী করতে চান এবং ১৯৫৬ সালে পালঘাটে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ সম্মেলনে তিনি বলেন, ভারতীয় শিল্পপতিদের প্রগতিশীল অংশের প্রতিনিধি নেহেরু সাম্রাজ্যবাদ-সমর্থক নীতি বর্জন করেছেন, এবং সামন্ততন্ত্রের পক্ষে ভারতে যে ধনী বুর্জোয়াশ্রেণী আছে তাঁরা সাম্রাজ্যবাদীদের চেয়েও জনসাধারণকে বেশী ভয় করেন বলে তারাই নেহেরুর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তিনি এবং রাজেশ্বর রাও, সোমনাথ লাহিড়ী এবং রমেশচন্দ্র প্রভৃতি অন্য কয়েকজন দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট [illegible] সম্মেলনে একটি প্রস্তাব আনলেন যাতে ঘোষণা করা হল, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে যে [illegible] সংহতি, [illegible] এবং প্রগতিশীল শক্তিসমূহের [illegible] ফলে, জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে [illegible] সম্ভব। প্রস্তাবটি যদিও ভোটে পরাজিত হয় তবুও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির
সমর্থন করেছিলেন, তাঁরা ১৯৫৬-এর জুলাই এবং আগস্ট মাসে মস্কো থেকে প্রকাশিত ইংরেজী পত্রিকা 'নিউ টাইমসে' মডেস্ট রুবেনস্টাইন রচিত দুটি রচনায় তাঁদের মতের কিছুটা সমর্থন পেলেন। রচনা দুটিতে সপ্রশংসভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে কংগ্রেস আবাদী প্রস্তাবের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ-গঠনের উদ্দেশ্য গ্রহণ করেছে এবং নেহেরু সরকার ধনতন্ত্র-বিরোধী সমাজবাদের পথে পা বাড়িয়েছেন।

১৯৫৭ সালের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের ইস্তাহারে কংগ্রেসের আবাদী প্রস্তাবসম্মত বামপন্থী চিন্তার প্রতিফলন ঘটে। এই ইস্তাহার স্মরণ করিয়ে দেয় যে কংগ্রেস সংবিধানই সুযোগের সাম্যের ভিত্তিতে সমবায় সমাজ-গঠনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আর পরবর্তী কালে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ-গঠন সংগঠনগত লক্ষ্য হিসেবে কংগ্রেস ঘোষণা করেছে, তাই কংগ্রেসের বর্তমান লক্ষ্য হচ্ছে সমাজবাদী সমবায় সমাজের প্রতিষ্ঠা। এতে ঘোষণা করা হল যে ভারতীয় পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হবে দারিদ্র্য ও বেকারী সমস্যার সমাধান এবং সাধারণ মানুষের জীবনের মান উন্নয়ন। ইস্তাহারে স্টেট ব্যাঙ্ক ও জীবনবীমার জাতীয়করণকে স্বাগত

জানানো হল এবং বলা হল যে এ দুটি ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ-গঠনের দিকে প্রথম পদক্ষেপ। এতে আরও বলা হল যে জমির মালিকানার ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হবে এবং জমির সমস্ত মধ্যস্বত্ব ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত করা হবে যাতে চাষীই জমির মালিক হতে পারে।

১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগেই দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬০) কার্যকরী হয়েছিল। এই পরিকল্পনায় নেহেরুর পরামর্শ অনুসারে শিল্পকে আগের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হল। তবে জাতীয়করণের নীতি প্রজ্ঞাপরিমিতই রইল এবং সমগ্র শিল্পের জাতীয়-করণের কথা এতে বলাও হয় নি, ভাবাও হয় নি। যা ঠিক হল তা হচ্ছে-যে-সব ক্ষেত্রে ব্যক্তি-উদ্যোগ নেই অথবা যথেষ্ট পরিমাণে নেই, সেই সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করবে। এই পরিকল্পনার আদর্শ ছিল অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে দ্রুততর করে তোলা এবং কল্যাণভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা।

প্রথম পরিকল্পনায় শতকরা ১১ ভাগ জাতীয় আয়বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছিল; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সেটা বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করা হল। খাদ্য উৎপাদনে ২৫ শতাংশ এবং শিল্পে নীট ৬৫ শতাংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হল। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনায় বলা হল যে মোট বিনিয়োগের ২৫ শতাংশ আসবে বর্তমান ও নূতন কর, রেল হতে লাভ ইত্যাদি থেকে, অন্য ২৫ শতাংশ আসবে ঋণ ও স্বল্পসঞ্চয় থেকে, আর এক ২৫ শতাংশ আসবে ঘাটতি অর্থসংস্থানের মাধ্যমে এবং শেষ ২৫ শতাংশ, ধরে নেওয়া হল, আসবে বৈদেশিক সাহায্য ও অব্যবহৃত জাতীয় সম্পদ থেকে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা উচ্চাশার প্রতীক হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনা কয়েকটি অপ্রত্যাশিত অসুবিধার মধ্যে পড়ে গেল। ১৯৫৬-৫৭ সালে ব্যাপক বন্যা, শিলাবৃষ্টি ও খরা দেখা দিল এবং তার ফলে খাদ্যোৎপাদন ব্যাহত হল। শিল্পায়নের কর্মসূচীর জন্য বহুমূল্য যন্ত্রপাতি আমদানী করতে হল এবং তার জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় টান পড়ল। ইতিমধ্যে দেশে মুদ্রাস্ফীতির লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, তাই ১৯৫৮ সালের মাঝামাঝি পরিকল্পনাটি ভীষণ রকম বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে পড়ে। সেই জন্য পরিকল্পনাটি ছাঁটাইও করতে হল। অপরিবর্তিত রাখা হল শুধু অত্যাবশ্যক কর্মকেন্দ্রগুলি—যথা, কৃষি-উৎপাদন, বিদ্যুৎ-সরবরাহ, এবং তিনটি স্টীল উৎপাদনের কারখানা যার একটি ব্রিটিশ, একটি রুশ এবং তৃতীয়টি জার্মানীর সাহায্যে নির্মিত হচ্ছিল।

১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে যে তৃতীয় পরিকল্পনাটি চালু করা হল সেটি দ্বিতীয় পরিকল্পনার থেকেও অনেক বেশী উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিল,—তার লক্ষ্যমাত্রাগুলি দ্বিতীয় পরিকল্পনার দ্বিগুণেরও বেশী স্তরে ধার্য করা হয়। ১৯৫৭ সালে নেহেরু দাবি করেছিলেন যে যদি দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য-মাত্রাগুলিকে বাস্তবায়িত করা যায় তাহলে অনুন্নত ও উন্নত দেশের মধ্যেকার বিপদ-বাধার স্তর ভারত অতিক্রম করবে এবং একবার এই বাধা অতিক্রম করার পর অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার অনেক দ্রুততর হয়ে

উঠবে। তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হল---ভারতের জাতীয় অর্থনীতিকে স্বয়ম্ভর করে তোলা।

তৃতীয় পরিকল্পনা চালু হওয়ার পরই কংগ্রেসের ১৯৬২ সালের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনকালীন ইস্তাহার প্রকাশিত হয়। এই ইস্তাহারে আর্থিক অসমতা দূরীকরণের ওপর জোর দেওয়া হল। এতে বলা হল যে ভারতের মৌলিক লক্ষ্য শুধু জনগণের জীবনযাত্রার মান সাধারণভাবে উন্নয়নই নয়, প্রগতিশীলভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠাও। এতে ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি-বিষয়ক প্রস্তাবের উল্লেখ করা হল এবং স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল যে স্বীকৃত সমাজীকরণের নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্রমিক ব্যাপকতা ঘটবে এবং দেশের দ্রুত শিল্পায়নে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ উত্তরোত্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। যাতে রাষ্ট্রীয়, ব্যক্তি ও সমবায়-উদ্যোগ এক বৃহত্তর কর্মযন্ত্রের অংশ হিসেবে সুসমঞ্জসভাবে সমাজবাদী সমবায় সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে সে বিষয়ে এই ইস্তাহারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হল।

১৯৬৩ সালে জয়পুরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে, যাতে বলা হয় যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ "would play a strategic and predominant role in the fields of industry." রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ প্রগতিশীলভাবে বৃহৎ শিল্প ও বাণিজ্যে বৃদ্ধি পাবে এবং যদিও অর্থ-নীতিতে ব্যক্তি-উদ্যোগের একটি প্রয়োজনীয় ভূমিকা থাকবে তবু সেই ভূমিকা পালন করতে হবে জাতীয় পরিকল্পনার কাঠামোর মধ্যে। আরও বলা হল যে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে সমবায়-উদ্যোগের ওপরই উত্তরোত্তর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হবে, বিশেষ করে কৃষি, ক্ষুদ্র ও কারিগরী শিল্প এবং খুচরা ব্যবসায়ে। এই প্রস্তাবে অর্থনৈতিক অসমতা দূরীকরণে কর-ব্যবস্থার বিশেষ দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়। গ্রামীণ এলাকায় জমির উর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়ার পর, শহরাঞ্চলে আয়ের উর্ধ্ব-সীমা বাঁধার প্রশ্নও ওঠে। এই প্রস্তাবে অবশ্য বলা হল যে যদিও এই নীতি শহরাঞ্চলে পুরোপুরি প্রযোজ্য নাও হতে পারে তবু কর, শুল্ক এবং অন্যান্য ব্যবস্থার দ্বারা শহরাঞ্চলে প্রভূত আয়ের উর্ধ্বসীমা স্থিরীকরণ এবং সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক অসমতা দূরীকরণের বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই প্রস্তাবে আরও বলা হল যে সমাজতন্ত্র শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সম্বন্ধের ওপর নির্ভর করে না। বর্তমান যুগের সম্পদলোলুপ সমাজের অবসান এবং সত্যিকারের সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হবে যদি না অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে আত্মিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির যোগ ঘটে।

১৯৬৪ সালের জানুয়ারীতে ভুবনেশ্বরে কংগ্রেস পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে নিজের লক্ষ্য বলে মেনে নিল। কংগ্রেস সভাপতি তাঁর অভিভাষণে ঘোষণা করলেন যে সমাজতন্ত্র দেশের পক্ষে ভাল কি না এটা আর প্রশ্নই নয়, সমাজতন্ত্রের আদর্শ ইতিমধ্যেই সর্বস্বীকৃত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সমাজ-তান্ত্রিক লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট আইনগত ও ব্যবহারগত কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে কি-না।

সেই বছরেই নভেম্বর মাসে গুন্টুরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি

একটি প্রস্তাবে নির্দেশ দিলেন যে ১৯৬২ সালের নির্বাচনী ইস্তাহার অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে যাতে কৃষি-জমির মালিকানার উর্ধ্বসীমার মত শহরাঞ্চলের সম্পত্তিরও উর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয়।

১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের ইস্তাহারে কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক আদর্শের কথা পুনরুল্লেখ করা হল। এতে বলা হল যে সমাজতান্ত্রিক রূপায়ণের জন্য একটি গতিশীল ও বর্ধিষ্ণু রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ-ক্ষেত্র প্রয়োজন এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ইতিহাসে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক ও জীবনবীমা জাতীয়করণে যে দুটি মূল্যবান পদক্ষেপ হয়েছে সে বিষয়েও উল্লেখ করা হল। শহরাঞ্চলে যে অপব্যয় ও লোক-দেখানো অপচয় বেড়ে চলেছে, তার নিন্দা করে ইস্তাহারে বলা হল যে সমাজবাদী সমাজে এই সবের কোন স্থান থাকতে পারে না, আর সেই কারণেই শহরাঞ্চলের সম্পত্তির আয়ের উর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

১৯৬৭ সালের জুন মাসে নূতন দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় অধুনা বিখ্যাত দশদফা কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই দশদফার মধ্যে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানসমূহের সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, সাধারণ বীমার জাতীয়করণ, রাজন্যবর্গের ভাতা ও বিশেষ সুবিধার লোপ, শহরাঞ্চলে ব্যক্তিগত জমির মালিকানার নিয়ন্ত্রণ, ভাড়াটিয়া সংক্রান্ত আইনসমূহের সংস্কার এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধ ও একচেটিয়া ব্যবসায়ের অবদমনের জন্য মনোপলিস্ কমিশনের প্রস্তাব-গুলির রূপায়ণের কথা বলা হল।

অর্থনৈতিক কর্মসূচীর দিক দিয়ে কংগ্রেসের এর পরের গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হল ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসের ব্যাঙ্গালোরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা। এই অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী একটি পত্র প্রেরণ করেন। তাতে তিনি কয়েকটি বৃহৎ ব্যাঙ্কের ও সমস্ত কাঁচা মালের আমদানীর জাতীয়করণ, একচেটিয়া ব্যবসায়-গৃহের নিয়ন্ত্রণ, প্রগতিশীল ভূমিসংস্কার নীতির রূপায়ণ, জমির মালিকানার উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ এবং ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ বন্ধ করার প্রস্তাব করেন।

প্রধানমন্ত্রীর ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই। তাঁর মতে ব্যাঙ্কগুলির সামাজিক নিয়ন্ত্রণই যথেষ্ট। মোরারজীর বিরোধিতা সত্ত্বেও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি সরকারকে প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবগুলিকেই বাস্তবায়নের আহ্বান জানালেন। এর অব্যবহিত পরেই প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই-এর কাছ থেকে অর্থমন্ত্রক সরিয়ে নেন। দেশাই তখন মন্ত্রিসভা থেকে পদ-ত্যাগ করেন এবং ১৯৬৯ সালের ১৯শে জুলাই একটি অর্ডিন্যান্সের বলে কেন্দ্রীয় সরকার ১৪টি বৃহৎ বেসরকারী ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীকৃত করেন। এর পরেই বিভিন্ন ঘটনার এক দ্রুত ও বিচিত্র পারম্পর্য অবশেষে ১৯৬৯ সালের নভেম্বরে কংগ্রেসকে দ্বিধাবিভক্ত করল।

পরিশিষ্ট (১)

নেহেরু-উত্তর রাজনৈতিক ঝোঁকসমূহ

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে যিনিই সেই সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন তাঁরই জন্য কংগ্রেস মঞ্চে স্থান ছিল। কংগ্রেস সামাজিক ও অর্থনৈতিক মতবাদে ভিন্ন ও বিরুদ্ধপন্থীদেরও যোগক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। যোগ শুধু ওই ব্রিটিশ শাসন অবসানের লড়াইয়ে। কংগ্রেসের মধ্যে তাই ছিল রক্ষণশীল ও প্রগতিবাদী সকলেই। সংগঠনগত এই বৈসাদৃশ্য নেহেরুর সময়েও ছিল, নেহেরুকে কেউ বলতেন বামপন্থীদের নেতা আর প্যাটেলকে দক্ষিণপন্থীদের। নেহেরু ও প্যাটেলের মধ্যে মত-পার্থক্য মাঝে মাঝে সঙ্কটজনক অবস্থার সৃষ্টি করেছে বটে, কিন্তু গান্ধী যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি চেষ্টা করেছিলেন যাতে এই মত-বিরোধের ফলে দলের মধ্যে কোন ভাঙন না আসে। প্যাটেল ১৯৫০ সালে মারা যান, আর তারপর কংগ্রেসের মধ্যে নেহেরুর আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বীই ছিল না।

নেহেরুর উত্তরাধিকারী লালবাহাদুর শাস্ত্রী মধ্যপন্থী ছিলেন। কংগ্রেসের মধ্যেকার বাম ও দক্ষিণপন্থী দুই অংশই তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল, আর বিশেষ করে ভারত-পাকিস্থান সংঘর্ষের পর শাস্ত্রীর নেতৃত্ব অবিসংবাদিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরে এবং ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনের পরে কংগ্রেসের ভিতরে এবং বাইরে বাম ও দক্ষিণপন্থীদের দ্বিকেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রসঙ্গ বারবার আলোচিত হয়। কংগ্রেসের ভিতরে অনেকে ব্যাঙ্ক ও কয়েকটি শিল্পের জাতীয়করণের জন্য দাবি জানাতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে তরুণ তুর্কীদের সঙ্গে মোরারজী দেশাইয়ের, যিনি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, ক্রমাগত সংঘর্ষ বাধতে থাকে। তরুণ তুর্কীদের সঙ্গে অন্য কয়েকজন কংগ্রেস নেতারও ঘন ঘন সংঘর্ষ বাধে; তাঁরা হলেন, এস কে পাটিল, অতুল্য ঘোষ এবং ১৯৬৯-এর কংগ্রেস সভাপতি নিজলিংগাপ্পা।

১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে কংগ্রেসের ফরিদাবাদ সম্মেলনে কংগ্রেসের ভিতরকার বাম ও দক্ষিণপন্থী শক্তির দ্বিকেন্দ্রীভবনের কথাও আবার ওঠে। কেউ কেউ এমন আশঙ্কাও করলেন যে হয়ত পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হতে পারবে না এবং সেইজন্য কংগ্রেসকে সমধর্মী দলের সঙ্গে জোট বাঁধার পরামর্শও দিলেন। অবশ্য ফরিদাবাদে কংগ্রেস কার্যকরী পরিষদ্ সামান্য রদবদল করে চ্যবন, করণ সিং এবং অন্যান্যদের প্রস্তুত যে বিবরণী গ্রহণ করে তাতে এই রকম নৈরাজ্যব্যঞ্জক মতের নিন্দা করা হয়। পরবর্তী নির্বাচনের পর সংসদে স্থিতাবস্থা থাকতে নাও পারে এ কথা এই বিবরণী স্বীকার করে নি। এই বিবরণী কংগ্রেসের

মধ্যে দ্বিকেন্দ্রীভবনের কথা পর্যালোচনা করে বলে যে জাতির দ্রুত প্রগতির জন্য কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক সমাজবাদই একমাত্র পথ।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কংগ্রেস বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মতবাদীদের যোগক্ষেত্র ছিল, তাই কংগ্রেসের ভেতর মতাদর্শগত সংঘর্ষ বরাবরের জন্য এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। ১৯৬৯ সালের নভেম্বরে কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হল। এই ভাঙনের কারণ কংগ্রেসের ইতিহাসের গভীরে। কিন্তু যা উপলক্ষ করে এই ভাঙন দেখা দিল তা হল ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ব্যাঙ্গালোর অধিবেশনে ইন্দিরা গান্ধীর প্রস্তাবমত ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ মেনে নেওয়া, কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসপ্রার্থীর নাম তাঁর পরামর্শ-মত মেনে না নেওয়া, এবং তার পরবর্তী যে-সব ঘটনা দ্রুত পারম্পর্যে ঘটে গেল এইগুলি।

কংগ্রেসের মধ্যেকার প্রগতিপন্থীরা অনেক দিন ধরেই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের জন্য দাবি জানাচ্ছিলেন। ১৯৬৯-র জুলাই মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ব্যাঙ্গালোর অধিবেশনে পাঠানো চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ সমর্থন করলেন। এই চিঠিটি পড়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এস কে. পাটিল এবং মোরারজী দেশাই এর বিরোধিতা করলেন। কিন্তু অধিকাংশ সদস্যই প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবের সমর্থন জানালেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে কেন্দ্র ও সমস্ত রাজ্য সরকারকে এই পত্রের নির্দেশমত কর্মসূচী গ্রহণ করতে আহ্বান জানালেন। চাবন বললেন যে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে একটি বিশেষ পথ নির্দিষ্ট করা হল এবং এই পথ থেকে আর ফেরা সম্ভব নয়। অবশ্য তিনি ঠিক কবে ব্যাঙ্কগুলি জাতীয়কৃত হবে তা বলতে পারেন নি—'আজ, আগামী কাল, না আগামী বৎসর'---কারণ তাঁর মতে দিন স্থির দলের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ওপর নির্ভর করবে।

ব্যাঙ্গালোরে ইন্দিরা গান্ধীর প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ প্রস্তাব গৃহীত হল, কিন্তু জাকির হোসেনের মৃত্যুর পর ভারতের রাষ্ট্রপতির শূন্যপদে কংগ্রেসপ্রার্থীর নাম সম্বন্ধে তাঁর প্রস্তাব কংগ্রেস সংসদীয় বোর্ডের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হল।

কংগ্রেসের ব্যাঙ্গালোর অধিবেশনের অব্যবহিত পরেই ইন্দিরা গান্ধী মোরারজী দেশাইয়ের কাছ থেকে অর্থমন্ত্রক সরিয়ে নিলেন। দেশাই তারপরেই মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলেন। ১৯৬৯ সালের ১৯শে জুলাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপর্ষদের এক জরুরী সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে অন্যূন ৫০ কোটি টাকার মূলধনের ১৪টি বৃহৎ বে-সরকারী ব্যাঙ্ক জাতীয়কৃত হবে। ঐদিনই এই ১৪টি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের জন্য অর্ডিন্যান্স বলবৎ করা হল।

এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে ইন্দিরা গান্ধী বললেন যে ভারতের মত এক দরিদ্র দেশে অর্থনৈতিক ক্ষমতার শিখর ব্যাঙ্কগুলির নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। তিনি বললেনঃ "An institution, such as the banking system, which touches and

should touch the lives of millions has necessarily to be inspired by a larger social purpose and has to subserve national priorities and objectives That is why there has been widespread demand that major banks should be not only socially controlled but publicly owned.. this has been the practice even in some countries which do not adhere to socialism That is also why we nationalised, more than a decade ago, the life insurance business and the State Bank or the Imperial Bank, as it was then called."

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সিদ্ধান্তকে সমালোচনা করলেন স্বতন্ত্র ও জনসঙ্ঘ দল। কিন্তু এই দুটি দল ব্যতীত সব বিরোধী দলই এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানালেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপর্ষদ থেকে দেশাইয়ের প্রস্থানকেও কংগ্রেসের ভিতরের অধিকাংশ সদস্য এবং অন্য সব বামপন্থী দল স্বাগত জানালেন। অন্যদিকে স্বতন্ত্র ও জনসঙ্ঘ দল দেশাইয়ের প্রস্থানে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

দেশাই এই বলে ইন্দিরা গান্ধীর সমালোচনা করলেন যে তাঁর সন্দেহ আছে যে যে-সব রিক্সাওয়ালা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে সভা করে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছে তারা ব্যাঙ্ক অথবা জাতীয়করণ সম্বন্ধে কিছু জানে কি না। ইন্দিরা গান্ধী প্রত্যুত্তরে বলেন, "Many people say that the rickshawallahs, cobblers and others who came to my residence, do not know anything about banks or nationalisation. What I would like to know is that when we go out and seek their votes, do we say that they do not know anything about democracy ?"

ইন্দিরা গান্ধী দুঃখ করে বললেন যে সাম্প্রতিক কালে কংগ্রেস সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কিছুটা সরে এসেছে। এর অন্যতম কারণ হল দলের ১৯৬৪ সালের ভুবনেশ্বর প্রস্তাব, যাতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শপথ নেওয়া হয়েছিল, তাকে যথেষ্ট পরিমাণে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সেই জন্যই কংগ্রেস এবং সরকারের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের উৎসাহ কমে যাচ্ছিল। মানুষের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য "we have to take big steps" আর ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ তার মধ্যে একটি।

ইন্দিরা গান্ধী বললেন, কংগ্রেসকে কখনও মুষ্টিমেয় লোকের বা স্বার্থান্বেষীদের দল হিসাবে যেন ভাবা না হয়, কংগ্রেসকে হতে হবে জনতার দল। ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি বলেন, "The denigration of the poor and illiterate masses which has been indulged in of late by some people runs counter to the democratic traditions taught to us by Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru. The recent nationalisation of banks, although primarily an economic and social measure, has become a dyanamic symbol of the paramountcy of the people. That is why it has released

the latent enthusiasm of the people to such an extent. More than any other decision that we have taken in independent India, it proclaims that the few cannot constitute themselves into the managing agents or arbiters of the destinies and fortunes of the many."

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ও রাজন্যভাতা বিলোপের ব্যাপারে ইন্দিরা সরকার যে কার্যক্রম গ্রহণ করে তাকে অনেক বামপন্থী দল স্বাগত জানান। সংগঠন কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ আর স্বতন্ত্র দল এই সমস্ত কার্যক্রমের বিরোধিতা করেন।

১৯৭০-এর ২০শে ডিসেম্বর সুপ্রীম কোর্ট রাজন্যভাতা বিলোপ-সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির আদেশকে অবৈধ ঘোষণা করল। তারপরই রাষ্ট্রপতি. প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শের ভিত্তিতে লোকসভা ভেঙে দিলেন।

১৯৭১ সালের অন্তর্বর্তীকালীন সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে কোন দলের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতার মধ্যে গেল না। সংগঠন কংগ্রেস এই নির্বাচনে নামলেন কয়েকটি ভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সমঝোতা করে। এই দলগুলির মধ্যে ছিল জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র দল এবং সংযক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টি। এই চতুর্দলীয় নির্বাচনী মোর্চার শ্লোগান ছিল 'ইন্দিরা হঠাও'। অন্যদিকে ইন্দিরা গান্ধীর শ্লোগান ছিল, 'গরিবী হঠাও'।

এই মধ্যবর্তী নির্বাচনে লোকসভায় কংগ্রেস অভূতপূর্বভাবে জয়ী হলেন, ৫১৫টি আসনের মধ্যে তাঁরা পেলেন ৩৫০টি। লোকসভা ভেঙে দেবার আগে তাতে কংগ্রেসের আসন ছিল ২২০টি। আর সংগঠন কংগ্রেসের, যাঁদের ছিল ৬৫টি আসন, তাঁরা পেলেন ১৬টি আসন।

এই নির্বাচনের পরেই কংগ্রেস সংসদে সংবিধানের চতুর্বিংশতিতম সংশোধন বিল আনলেন, যার উদ্দেশ্য হল গোলোকনাথের মামলায় সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছিলেন যে মৌলিক অধিকার সংশোধন সম্ভব নয়, সেই রায় থেকে যে সমস্যা উদ্ভূত হয়েছে তার দূরীকরণ। এই নূতন আইনে সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদের কিছুটা পরিবর্তন করা হল যাতে গোলোকনাথ মামলার রায় যে সমস্যা সৃষ্টি করেছিল তার নিরসন করা সম্ভব হয়।

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী, গোখেল, এই বিল উত্থাপন করতে গিয়ে সংসদে বললেন যে এর উদ্দেশ্য হল এইভাবে আইন করা যাতে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদের ওপর সংসদের অধিকার শুধু পদ্ধতিগত নয়, সে অধিকার মৌলিক। তিনি বললেন যে সংবিধান একটা স্থিতিশীল বস্তু নয়, তার সংশোধন সম্ভব। জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র দল এই বিলটির বিরোধিতা করলেন।

সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ও মোহন কুমারমঙ্গলম, এই দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, এই বিলের সমর্থন করতে গিয়ে বলেছিলেন যে গোলোকনাথের মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায় থেকে মনে হয় যে আমেরিকার ইতিহাসের শিক্ষা এখনও গ্রহণ করা হয় নি।

প্রেসিডেন্ট লিংকন এবং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট দুজনেই প্রগতিশীল সামাজিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম নিতে গিয়ে প্রথমে আমেরিকান সুপ্রীম কোর্টের দ্বারা প্রতিহত হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক মিসৌরী চুক্তিতে দাস-প্রথা বিলোপের পরেও আমেরিকান সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ট্যানী সেই চুক্তিকে বেআইনী ঘোষণা করেন, কারণ ক্রীতদাসেরা নাকি সম্পত্তির মত এবং কোন মানুষের সম্পত্তি আমেরিকান সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনের মাধ্যমে ছাড়া এবং ক্ষতিপূরণ না দিয়ে কেড়ে নেওয়া যায় না। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের ভাষায় আমেরিকার আদালতের এই রায়ের পর প্রয়োজন হয়েছিল, "A civil war, a Lincoln and an amendment of the American Constitution to bring America back to sanity."

পরবর্তী কালে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকেও ঠিক এই রকম বাধার সম্মুখীন হতে হয়। ১৯৩৩ সালে আমেরিকায় শিল্প উৎপাদন ভয়ঙ্কর রকম কমে যায় এবং দেশে ব্যাপক বেকারী দেখা দেয়। এর প্রতিবিধানের জন্য ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট New Deal আইন-সমূহের প্রবর্তন করেন। কিন্তু আমেরিকান সুপ্রীম কোর্ট এই আইন-সমূহের অন্যতম তিনটি---নিউইয়র্ক মিনিমাম ওয়েজ ল, ওয়েগনার লেবার রিলেশনস অ্যাক্ট এবং সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যাক্টকে বেআইনী ঘোষণা করেন। ১৯৩৬ সালের নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আমেরিকা-বাসীদের কাছে পুনর্নির্বাচন চেয়ে আহ্বান করলেন তার নিউ ডিল আইনকে সমর্থন জানাবার জন্য। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সেবার যে ভোটাধিক্যে পুনর্নির্বাচিত হয়েছিলেন তা ইতিপূর্বে কোন প্রেসিডেন্টের ভাগ্যে জোটেনি ---৪৮টি রাজ্যের মধ্যে ৪৬টি রাজ্য সমর্থন জানিয়েছিল তাঁকে।

এর পরই আমেরিকান সুপ্রীম কোর্ট তাঁদের পূর্ববর্তী রায় পরিবর্তন করেন। ১৯৩৭ সালের মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে উল্লিখিত তিনটি আইনের সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হল। সেগুলি আইনসঙ্গত বলে মেনে নেওয়া হল, অবশ্য বিচারপতিদের ৫-৪ ভোটের ব্যবধানে।

সংসদের পূর্ণ অধিকার রক্ষার প্রয়াস হিসেবে ভারতের সংবিধানের চতুর্বিংশতিতম সংশোধন বিল ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে সংসদের উভয় সভায়ই গৃহীত হয়। তারপর অর্ধেকেরও বেশী বিধানসভাগুলিতে বিলটি সমর্থিত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির অনুমোদন বিলটিকে দেওয়া হয়।

এর পরই সংবিধানের পঞ্চবিংশতিতম ও ষড়বিংশতিতম সংশোধন বিল সংসদে উত্থাপিত হয়। পঞ্চবিংশতিতম সংশোধন প্রস্তাব সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদে 'compensation' কথাটির পরিবর্তে 'amount' কথাটি বসায় যাতে ক্ষতিপূরণের অঙ্ক নির্ধারণে আদালতের কোন অধিকার না থাকে। এতে আরও বলা হল যে সংবিধানের নির্দেশক নীতিগুলির বাস্তবায়নের জন্য যে আইন প্রণীত হবে সেটা যেন, মৌলিক অধিকারের পরিচ্ছেদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে অবৈধ ঘোষিত না হয়।

সংবিধানের এই বিশেষ অনুচ্ছেদটি, যেটি তখন ২৪-সংখ্যক ছিল এবং পরে '৩১-সংখ্যক হয়, সংবিধান পরিষদের (Constituent

Assembly) সামনে উত্থাপিত করতে গিয়ে নেহেরু বলেছিলেন যে ক্ষতি-পূরণের মাত্রা শুধুমাত্র সংসদই ধার্য করবেন, বিচার-বিভাগ নয়। কিন্তু এই মত সুপ্রীম কোর্ট অগ্রাহ্য করলেন ১৯৫৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর বেলা ব্যানার্জীর মামলার রায়ে। তাঁরা বললেন যে ক্ষতিপূরণ গৃহীত সম্পত্তির পূর্ণ মূল্যের পরিমাণে হতে হবে, না হলে সে আইন হবে অসংবিধানিক। এই রায়ের প্রভাবমুক্ত হওয়ার জন্য এবং ক্ষতিপূরণের অঙ্ক বিচার-বিভাগীয় সিদ্ধান্তের আওতার বাইরে আনার উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধন বিল গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে সুপ্রীম কোর্টের রায়ের ফলে দেখা গেল যে নেহেরুর চিন্তা এই সংশোধনের মাধ্যমেও পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

সংবিধানের পঞ্চবিংশতিতম সংশোধন বিল তাই উত্থাপিত হল চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট করে দেবার জন্য যে ক্ষতিপূরণের অঙ্কের নির্ণয়ে সংসদের ওপরে আর আপীল নেই। এই বিলের সমর্থনে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নেহেরুর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে বিলটি ""constitutionally correct, economically essential and politically proper and, what is more important, morally just"

বিলটির সমর্থনে মোহন কুমারমঙ্গলম বলেন যে পৃথিবীর কোন গণতান্ত্রিক দেশই সরকার গৃহীত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বাজার দরের পূর্ণ-মূল্যে দেন না। সেই সব দেশে আইনে শুধু এইটুকুই আছে যে কোন সম্পত্তি আইনসঙ্গত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ছাড়া খেয়াল-খুশী মত কেড়ে নেওয়া যাবে না। ক্ষতিপূরণ কী হবে এবং কতটা হবে বিচার করবে সংসদ. "The circumstances may necessitate one rupee The circumstances may necessiate 100 per cent compensation also."

পরবর্তী বিল, সংবিধানের ষড়বিংশতিতম সংশোধন, যাতে রাজন্য-ভাতার বিলোপ ঘটল, তা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেল ১৯৭১ সালের শেষ দিনে। এ দেশে সবশুদ্ধ ২৭৮টি রাজন্যভাতার গ্রাহক ছিলেন যাদের জন্য বাৎসরিক ব্যয় হত ৪৮ কোটি টাকা। এই রাজন্যভাতা ছিল সব রকম করমুক্ত, রাজাদের গাড়ি ছিল কর-বিহীন এবং তাঁরা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য শুল্কবিহীন বিদেশী দ্রব্য আমদানী করতে সক্ষম ছিলেন। বন্দুক ছুঁড়ে তাদের অভিবাদন জানাতে হত এবং তাঁদের অনেককে 'হাইনেস' বলে সম্বোধন করতে হত। সরকারী খরচে তাঁদের জন্য রাজপ্রাসাদে সশস্ত্র প্রহরীর ব্যবস্থা করা হত এবং অস্ত্রশস্ত্র-সম্বন্ধীয় ও অন্যান্য কয়েকটি আইন তাঁদের ছুঁতে পারতো না।

সংবিধানের ষড়বিংশতিতম সংশোধনের উদ্দেশ্য ছিল এই সব রাজন্যবর্গের বিশেষ সুযোগ ও ভাতার বিলোপ। ১৯৭০ সালের ১৮ই মে রাজন্যভাতা বিলোপের জন্য একটি বিল সংসদে আনা হয়েছিল এবং লোকসভায় ৩৩৯--১৫৪ ভোটে গৃহীতও হয়েছিল। কিন্তু রাজ্যসভায় বিলটি প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্য পেল না। কংগ্রেস অবশ্য রাজন্যভাতা বিলোপে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল এবং এই অঙ্গীকারের ভিত্তিতেই কংগ্রেস ১৯৭১ সালের নির্বাচনে নামে। এই নির্বাচনে সাফল্যের পরেই

সংসদে সংবিধানের ষড়বিংশতিতম সংশোধন বিল আনা হয় এবং ১৯৭১ সালের ২রা ডিসেম্বর লোকসভায় এই বিল বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। এই বিলের সমর্থন করেছিলেন শাসক কংগ্রেস দল এবং প্রায় সব বিরোধী দলই। শুধু স্বতন্ত্র দল এর বিপক্ষে ভোট দেন এবং ভোটের সময়ে জনসংঘ সদস্যরা সংসদ কক্ষে অনুপস্থিত থাকেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে যদিও পূর্ববর্তী রাজন্য ভাতা বিলোপ বিল রাজ্যসভায় বিফল হয়েছিল, এই নূতন বিলটি রাজ্যসভাতেও প্রচণ্ড সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল। এই বিল ১৬৭ জন সদস্যের সমর্থন পায় ও মাত্র ৭ জন এর বিরোধিতা করে।

১৯৭২ সালে বিভিন্ন রাজ্যে সাধারণ নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে কংগ্রেস ২৫২৯ জন প্রার্থী মনোনীত করে। ১৯৮টি আসনে কংগ্রেস প্রার্থী দেয় নি আর তার মধ্যে ১২৪টি আসন রাজ্য নির্বাচনী সমঝোতার ভিত্তিতে সি পি আই. দলকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

নীচের তালিকায় ১৯৭২ সালের নির্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রার্থী ও জিত আসনের সংখ্যা দেওয়া হল।

১৯৭২-এর নির্বাচনের ফলাফল

দল	প্রার্থী	জিত আসন	মোট আসনের সঙ্গে জিত আসনের শতকরা ভাগ
কংগ্রেস	২,৫২৯	১,৯২৭	৭০ ৭৭
কংগ্রেস (সং)	৮৭০	৮৯	৩ ২৭
জনসংঘ	১,২৩৩	১০৪	৩ ৮২
স্বতন্ত্র	৩০৭	১৬	০ ৫৯
সি পি আই	৩৩০	১১২	৪ ১১
সি পি আই (এম.)	৪৬৭	৩৪	১.২৫
সোশ্যালিস্ট পার্টি	৬৫৯	৫৭	২ ১০
অন্যান্য রাজ্য দল	৪৫৬	১১৪	৪.১৮
নির্দল ও অন্যান্যরা	৫,১৭৭	২৭০	৯.৯১
মোট—	১২,০২৮	২,৭২৩	১০০.০০

পরবর্তী তালিকায় ১৯৭২ সালের নির্বাচনের রাজ্যভিত্তিক ফলাফল দেওয়া হল।*

১৯৭২-এর নির্বাচনের রাজ্যভিত্তিক ফলাফল

রাজ্য	কংগ্রেস প্রার্থী	কংগ্রেস জয়	কংগ্রেস (সং) প্রার্থী	কংগ্রেস (সং) জয়	জনসংঘ প্রার্থী	জনসংঘ জয়	স্বতন্ত্র প্রার্থী	স্বতন্ত্র জয়	সি.পি আই প্রার্থী	সি.পি আই জয়	সি.পি.(এম) প্রার্থী	সি.পি.(এম) জয়	এস.পি. প্রার্থী	এস.পি. জয়
অন্ধ্র ..	২৮৭	২১৯	১১	---	৫৬	---	২০	২	৫৯	৭	৩২	১	৪	---
আসাম ..	১১৪	৯৫	১৪	---	৩	---	১	১	২৮	৩	২০	---	৩৮	৪
বিহার .	২৫৯	১৬৭	২৭৮	৩০	২৭১	২৫	৪৯	২	৫৬	৩৫	৫০	---	২৬৫	৩৩
গুজরাট ..	১৬৮	১৪০	১৩৮	১৬	১০০	৩	৪৭	---	১১	১	৪	---	১৫	---
হরিয়ানা .	৮১	৫২	২৪	১২	১৯	২	---	---	৯	---	৪	---	৯	---
হিমাচল ..	৬৮	৫১	১৮	---	৩১	৫	---	---	১০	---	৪	১	২	---
জম্মু ও কাশ্মীর .	৭৪	৫৭	৯	---	৩১	৩	৪	---	১	---	---	---	৪	---
মধ্যপ্রদেশ .	২৮৯	২২০	২৩	---	২৬১	৪৮	২৩	---	৫	৩	৪	---	১০০	৭
মহারাষ্ট্র ..	২৭০	২২২	৪৯	---	১২২	৫	৫	---	৪৪	২	২০	১	৫২	৩
মহীশূর	২১২	১৬৫	১৭৬	২৪	১০২	---	২৯	---	৪	৩	১৭	---	২৮	৩
পাঞ্জাব	৮৯	৬৬	৮	১	৩৩	---	৪	---	১০	১০	১৭	১	৮	---
রাজস্থান .	১৭৯	১৪৫	৩৬	১	১১৯	৮	১১৯	১১	৫	৪	২০	---	৩৬	৪
পশ্চিমবঙ্গ	২৫৭	২১৬	৬৩	২	১৬	---	---	---	৪০	৩৫	২০৮	১৪	২৬	---
দিল্লী	৫২	৪৪	১৯	২	৫৬	৫	৬	---	৪	৩	---	---	১১	---
গোয়া .	১৯	১	---	---	৯	---	---	---	২	---	৫	---	৪	---
মনিপুর	৩০	১৭	১০	১	১	---	---	---	৫	৫	৫	---	১৬	৩
ত্রিপুরা	৫৯	৪১	---	---	৩	---	---	---	১১	১	৫৭	১৬	---	---
মেঘালয়	১২	৯	---	---	---	---	---	---	২	---	---	---	---	---

১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ২৮০ আসনের মধ্যে ২১৬টি আসন অধিকার করে। এই নির্বাচনে সি.পি আই. (এম.) ১৯৭১ সালে বিজিত ১১৩টি আসনের মধ্যে ১৪টি আসন বজায় রাখতে সক্ষম হন। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭২ সালের নির্বাচনের ফলাফল নিচের তালিকায় দেওয়া হল।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭২-এর নির্বাচনের ফলাফল

দল	বিজিত আসন	ভোটের শতকরা অংশ
কংগ্রেস	২১৬	৪৮ ৯৯
কংগ্রেস (সং)	২	১ ৪৭
সি পি আই (এম)	১৪	২৬ ৭১
সি পি আই.	৩৫	৮ ১৮
এস ইউ সি	১	১ ০৫
ফরওয়ার্ড ব্লক	---	২ ৫৭
আর এস পি	৩	১ ২৬
জনসংঘ	---	০ ১১
বাংলা কংগ্রেস	---	০.২০

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে নানাবিধ অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনা সম্ভব। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করে, রাজন্যভাতার বিলোপ সাধন করে, এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা যাতে সামাজিক অর্থনৈতিক প্রগতির পথ রুদ্ধ করতে না পারে সেইজন্য সংবিধান সংশোধন করে, ভারতীয় সংসদ প্রমাণ করেছে যে বিনা রক্তপাতে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রগতিশীল কার্যক্রম রূপায়িত করা সম্ভব।

কার্ল মার্ক্স সমাজবাদ প্রতিষ্ঠায় দুটি পদ্ধতির কথা ভেবেছিলেন শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি ও সহিংস বিপ্লব। তাঁর মতে এই দুটির কোন্‌টি কোন্‌ দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে সেটা নির্ভর করবে সেই দেশের বিশেষ পরিস্থিতির ওপর। পরবর্তী কালে ১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে মস্কোয় পৃথিবীর ৮১টি কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে সমাজতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ উত্তরণের পথকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে বিশ্বের অনেক ধনতান্ত্রিক দেশেই রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের পথ অনুসরণ না করেও জনসাধারণের পক্ষে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা সম্ভব।

গণতন্ত্র ভারতবর্ষের অনেক দিনকার আদর্শ। এই গণতান্ত্রিক আদর্শ আমাদের দেশের চিরন্তন মূল্যবোধ, যা আমাদের সহিষ্ণু হতে শিখিয়েছে, তা থেকে উদ্ভূত। তবে ভারতে অনেক রাজনীতিবিদ মনে করেন যে

রাজনৈতিক গণতন্ত্র অর্থনৈতিক গণতন্ত্রে পরিপূর্ণতা পেতে পারে না, সমাজতন্ত্র ছাড়া। সমাজতন্ত্র যে গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই কথা জহরলাল নেহেরু বার বার ঘোষণা করেছিলেন। পরবর্তী কালে বহু ভারতীয় রাজনৈতিক নেতা ও চিন্তাবিদ্ বলেছেন, জনসাধারণ সমাজতন্ত্রের জন্য অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করে থাকবে না এবং বলিষ্ঠ সমাজতান্ত্রিক কার্যক্রম ছাড়া গণতন্ত্রের ভিত শক্ত করা যাবে না।

পরিশিষ্ট (২)

কমিউনিজম্ ও ভারত

ভারতের স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুযায়ী সংবিধান পরিষদ্ গঠনের জন্য যে নির্বাচন হয়েছিল, কমিউ-নিস্টরা তাতে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে মাত্র একজন নেতা, সোমনাথ লাহিড়ী, এই পরিষদে নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে যখন সংবিধান পরিষদ্ আহূত হয়, তাতে সোমনাথ লাহিড়ী যোগ দেন এবং তিনি একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন যে সংবিধান পরিষদ্ প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নূতন এক সংবিধান পরিষদ্ গড়ার আহ্বান জানাক্। পরিষদের সভাপতি এই প্রস্তাবকে গঠিত পরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব হিসেবে গণ্য করে নাকচ করে দেন।[১]

১৯৪৭ সালে যখন স্বাধীনতা এল, তখন সি পি আই. তাকে স্বাগত জানান এবং দক্ষিণপন্থী প্যাটেলের বিরুদ্ধে বামপন্থী নেহেরুকে শক্তিশালী করতে চান। এই নীতি কিন্তু তৎকালীন সোবিয়েৎ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপন্থী ছিল। সোবিয়েৎ-ভারততত্ত্ববিদ্ ডায়াকোভ তাঁর New Stage In India's Liberation Struggle শীর্ষক রচনায় লেখেন, "In June 1947, the Communist Party of India also was not able to give a correct evaluation of the Mountbatten Plan and characterised it as a certain step forward. It did not immediately understand the treachery of the leadership of the National Congress and counterposed its Right to its Left elements as though the latter was a progressive one. Therefore, it called upon the masses to rally round Nehru and assist him to get rid of Patel"

এই সময়ে সি পি আই-এর মধ্যেকার চরমপন্থীরা তখনকার সাধারণ সম্পাদক পি সি. যোশীর নরমপন্থী নেতৃত্বে অধীর হয়ে উঠেছিলেন। এরপরই তাঁরা ১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বরে পোল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত কমিনফর্মের অধিবেশনে ঝানোভ ও কারদেলজের বক্তৃতায় নিজেদের মতবাদের সমর্থন খুঁজে পান। কারদেলজের মতে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যৌথ হবে এবং সে বিপ্লব সমগ্র বুর্জোয়াজির বিরুদ্ধে হতে হবে।

কমিনফর্মের এই আলোচনা তৎক্ষণাৎ ভারতীয় কমিউনিস্টদের ওপর ছায়াপাত করে এবং ১৯৪৭-এর ডিসেম্বরে যে কেন্দ্রীয় সমিতির বৈঠক হয় তাতে যোশীর নীতি, যা জনগণের চাপে নেহেরু সরকারকে প্রগতিশীল করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করত, তা নিন্দিত ও বর্জিত হয় এবং এক জঙ্গীনীতি গৃহীত হয়। পরবর্তী কালে ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারীতে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কংগ্রেসে জঙ্গী ঝানোভ নীতি গ্রহণ করে বলা হয় জাতীয় আন্দোলনের বুর্জোয়া নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি

বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এতে সাংগঠনিক পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র আনা সম্ভব, এই বিশ্বাস বা স্বপ্নকে 'ভুয়ো স্বপ্ন' বলে অভিহিত করা হয়।

এই কংগ্রেসে পি সি যোশীর স্থলে বি টি রাণদিভেকে সাধারণ সম্পাদক করা হল। রাণদিভে হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানায় সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থানকে সমর্থন জানালেন। তেলেঙ্গানাতে প্রায় একটা প্রচ্ছন্ন গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি গড়ে ওঠে। ওখানকার কমিউনিস্টদের লক্ষ্য ছিল এক ইয়েনান তৈরী করার, যে অধিকৃত এলাকা থেকে চীনা কমিউনিস্টদের মত ভারতীয় কমিউনিস্টরাও রাষ্ট্র দখলের লড়াই করবে।

রাণদিভের নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজ্য সরকার কমিউনিস্টদের সৃষ্ট এই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য ব্যবস্থা নেয়। ১৯৪৮-এর মার্চ মাসে বাঙলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিরণশঙ্কর রায় বলেন যে কমিউনিস্টদের কাছ থেকে পুলিস অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে এবং জননিরাপত্তা আইনবলে তিনি বাঙলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করেন। দেশের অন্যান্য স্থানেও এই দল বেআইনী ঘোষিত হয়। বাঙলায়, কেরালায় এবং অন্ধ্রে দলের মুখপত্র নিষিদ্ধ হয় এবং এস এ ডাঙ্গে, জ্যোতি বসু, মুজফ্ফর আহমেদ প্রমুখ বহু নেতৃস্থানীয় কমিউনিস্ট গ্রেপ্তার হন।

১৯৪৮-এর আগস্টে দলের সদস্যদের কাছে এক গোপনপত্রে রাণদিভে বলেন যে ছয় মাসের মধ্যে দেশে এক সাধারণ ধর্মঘট ও ব্যাপক কৃষক অভ্যুত্থান ঘটবে। তিনি এও চান যে দেশব্যাপী এক রেল ধর্মঘট করা হোক্। কিন্তু সরকার এবং সর্বভারতীয় রেল ফেডারেশনের সভাপতির মধ্যে এক চুক্তি হওয়ার ফলে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। তা সত্ত্বেও কমিউ-নিস্টরা ধর্মঘটের আহ্বান জানান ও প্রস্তুতি চালিয়ে যান; কিন্তু তা' সফল হয় নি।

এই সময়ে কমিউনিস্টরা নানাবিধ সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন। পুলিস দেশের বিভিন্ন স্থানে কমিউনিস্ট কেন্দ্রগুলিতে তল্লাসী চালায় এবং অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করে। পুলিস যেসব কমিউনিস্ট পত্রপত্রিকা আবিষ্কার করে তার মধ্যে পিস্তল ও হাতবোমা ছোড়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ ছিল। এই সব কাগজপত্রে থানা, জমিদার ও জোতদারদের বাড়ি আক্রমণ, পুলিসদলের উপর চোরাগোপ্তা আক্রমণ, অস্ত্রসংগ্রহ, 'শত্রুর' পরিবহণ-ব্যবস্থা বানচাল করা, এবং 'শত্রুর' টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ্-ব্যবস্থা বিনষ্ট করার আহ্বান ছিল।[২] বাঙলায় পুলিস যেসব কাগজপত্র পেয়েছিল তাতে কংগ্রেস সদস্যদের গৃহ আক্রমণ, বন্দুক বেয়নেট দিয়ে 'কংগ্রেস ফ্যাসি-বাদী'দের হত্যা এবং 'কংগ্রেস ব্যাসটিল' ধ্বংস করার কথা বলা ছিল।[৩]

নেহেরু ১৯৪৯-এর ফেব্রুয়ারীতে হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুঠ ও অন্যান্য কার্যকলাপের জন্য কমিউনিস্টদের ধিক্কার দেন।[৪] তিনি অভিযোগ করেন যে কমিউনিস্টরা দেশের রেল ও পরিবহণ-ব্যবস্থা বিনষ্ট করার চেষ্টা করছেন।

রাণদিভে বিশ্বাস করতেন যে নেহেরুর নেতৃত্বে ভারত সরকার ইংরেজ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পুতুল মাত্র হয়ে আছে এবং এই সরকারকে

সবলে ও সশস্ত্রভাবে উৎপাটিত করা উচিত। ১৯৪৯-এর অক্টোবরে সি.পি.আই.এর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনি মাও-সেতুংকে লেখেন, "I wish to assure you and through you the people of China that the Nehru Government does not represent the wishes and the will of the people of India The Nehru Government follows the dictates of the Anglo-American Imperialists, who wish to build India as a bastion of reaction against China. I wish to assure you ...that the Communist Party of India will unmask all the anti-Chinese intrigues that the Nehru Government might hatch under the dictates of the American Imperialists and rally the people to defeat them."[৫]

এই সময়ে তেলেঙ্গানাতে কমিউনিস্টরা রাণদিভের গৃহযুদ্ধের পদ্ধতি চালিয়ে যেতে থাকেন। অনেক গ্রাম-সোবিয়েত গড়ে ওঠে, জমি দখল করে নেওয়া হয় এবং বহুসংখ্যক জমিদার ও সরকারী কর্মীকে হত্যা করা হয়। হায়দ্রাবাদের নলগোণ্ডা ও ওয়ারঙ্গল জেলা-দুটি গেরিলা বাহিনীর দখলে চলে যায়। এই সব কাজে হায়দ্রাবাদের কমিউনিস্টরা পার্শ্ববর্তী রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশের কমিউনিস্টদের কাছ থেকে সহায়তা পায়।

ভারতীয় কমিউনিস্টরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথে গিয়েছিলেন এই বিশ্বাসে যে ভারত বিপ্লবের মুখে। কিন্তু পরবর্তী কালে কিছু কমিউনিস্ট নেতা বলেছেন যে ভারতীয় পরিস্থিতির এই বিশ্লেষণ বাস্তবনিষ্ঠ ছিল না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে যদিও ১৯৪৮-এর জুনে ডায়াকোভ ভারতীয় সরকারের প্রতি জনতার হতাশার কথা বলেছিলেন, ভারতে যে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত একথা কিন্তু তিনি কোনক্রমেই বলেন নি।[৬] ভারতীয় দলেও রাণদিভের এই অতিবাম নীতির বিরুদ্ধে অসন্তোষ জমা হচ্ছিল। অজয় ঘোষ রাণদিভেকে 'পাতি বুর্জোয়া বিপ্লবী' বলে অভিযুক্ত করেন। তাতে রাণদিভে অজয় ঘোষকে দল থেকে বহিষ্কারের হুমকী দেন, কিন্তু অজয় ঘোষকে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এস এ ডাঙ্গে সমর্থন করেন, কারণ ডাঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে রাণদিভের চরমপন্থী কার্যকলাপে শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্টদের প্রভাব নষ্ট হয়ে যাবে। পি সি যোশীও মনে করতেন যে রাণদিভে হঠকারী ট্রটস্কি নীতি অনুসরণ করছিলেন।[৭]

রাণদিভে নীতির সবচেয়ে বড় সমালোচক ছিলেন অন্ধ্র কমিউ-নিস্টরা। তার কারণ এ নয় যে তাঁরা সাংবিধানিক আর রাণদিভে বৈপ্লবিক ছিলেন; মতপার্থক্য ঘটে বিপ্লবের প্রকৃতি ও পদ্ধতির ব্যাপারে। অন্ধ্র কমিউনিস্টরা কৃষিবিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁদের প্রেরণা ছিল চীন, রাশিয়া নয়। ১৯৪৮-এর জুনে তাঁরা দাবি করেন যে মাও-এর নীতি 'নবগণতন্ত্র' অনুসরণ করতে হবে। এই চিন্তায় বিপ্লবের শত্রু হল কেবলমাত্র বড় বুর্জোয়াজি ও বড় জমিদাররা। মধ্যবিত্ত কৃষকরা বিপ্লবের মিত্র হতে পারেন। এমনকি ধনী কৃষকদেরও কিছু সময় পর্যন্ত বিপ্লবের মিত্র করা সম্ভব। অন্ধ্র কমিউনিস্টরা বলেন, "Our revolution in many aspects differs from the classical Russian Revolution ; and is to

a great extent similar to that of the Chinese revolution The perspective is not that of general strikes and general rising leading to the liberation of the rural side ; but the dogged resistance and prolonged civil war in the form of an agrarian revolution culminating in the capture of political power by a democratic front."

মাও-এর 'নবগণতন্ত্রে' বিশ্বাসী অন্ধ্র কমিউনিস্টরা রাণদিভের মতবাদ, যে ভারতীয় বিপ্লব রুশ পথে আসবে, তাকে 'চ্যালেঞ্জ' করেন। তাঁরা মনে করতেন যে ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশে চীনা পদ্ধতিই প্রযোজ্য, ভারতে বিপ্লব হবে শহর থেকে নয়, গ্রাম থেকে, এবং এই রকম গ্রামের বিপ্লব-আন্দোলন কালক্রমে শহরগুলিকে ঘিরে ফেলবে। এই বিপ্লব, তাঁদের মতে, চীনের মত এক দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধের পর আসবে।[৮]

পি সি. যোশী, যিনি পূর্বে রাণদিভে নীতির বিরোধিতা করেছিলেন, তিনি অন্ধ্র কমিউনিস্টদের এই মতের সঙ্গেও একমত হতে পারেন নি। তিনি বললেন যে রাণদিভে যেমন গোঁড়াভাবে রুশ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে-ছিলেন, তেমনি অন্ধ্র কমিউনিস্টরা যান্ত্রিকভাবে চীনা দৃষ্টান্ত অনুসরণ করছেন।

অন্ধ্র কমিউনিস্টদের মতবাদ, যে ধনী কৃষকদের বিপ্লবের মিত্র করা সম্ভব, তা রাণদিভে সমালোচনা করেন। তিনি এই নীতিকে শোধন-বাদের সবচেয়ে বেশী নির্লজ্জ ও স্থূল সংস্করণ বলে অভিহিত করেন। তাছাড়াও রাণদিভের সমালোচনায় এরকমও ইঙ্গিত করা হয় যে অন্ধ্র কমিউনিস্টরা নিজেরা ধনী ও মধ্যবিত্ত কৃষকসম্প্রদায়ের সন্তান বলে এই নীতি সমর্থন করছেন।

যাই হোক, রাণদিভে মাওকে কমিউনিস্ট নীতির যথার্থ ভাষ্যকার বলে মানতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, "Firstly we must state emphatically that the..Communist Party of India has accepted Marx, Engels, Lenin and Stalin as the authoritative sources of Marxism. It has not discovered new sources of Marxism beyond these. Nor for the matter of that is there any Communist Party which declares adherance to the so-called theory of new democracy alleging it to be a new addition to Marxism." তিনি আরও বলেন, "Some of Mao's formulations are such that no Communist can accept them. They are in contradiction to the world understanding of the Communist Parties.... Why do the Chinese have to go through the protracted civil war ? Just because the leadership of the Chinese Communist Party at times failed to fight for the hegemony of the proletariat."

১৯৪৮-এর সেপ্টেম্বরে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী হায়দ্রাবাদ অভিযান করে। ভারতীয় বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে আসেন কমিউনিস্টরা, যাঁরা

আজাদ হায়দ্রাবাদ ঘোষণা করেছিল; আর আসে রাজাকাররা, যারা নিজামের অনুগত এক চরমপন্থী মুসলিমদের বেসরকারী বাহিনী হিসেবে গঠিত হয়েছিলেন। রাজাকারদের প্রতিরোধ চূর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু কমিউনিস্টরা গেরিলা পদ্ধতিতে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকেন।

পরবর্তী কালে সমগ্র পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে, ১৯৪৯-এর জুন মাসে সোবিয়েত পণ্ডিতেরা এশিয়ার বিভিন্ন দেশে people's democracy বা জনগণতন্ত্র নীতির সমর্থন করে। জুকোভ বলেন, "In the struggle for People's Democracy in the colonies and semi-colonies are united not only the workers, the peasants, the petty bourgeoisie, and the intelligentsia, but even certain section of middle bourgeoisie which is interested in saving itself from cut-throat foreign competition and imperialist oppression."

জুকোভ ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, মালয়, বর্মা প্রভৃতি ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশে সশস্ত্র সংঘর্ষকে এবং ভারতে কৃষক অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানালেন। এই মতই ডায়াকোভও তাঁর 'Crisis of the Colonial System' রচনায় মন্তব্য করেন যে ভারতীয় বিপ্লবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল কৃষক অভ্যুত্থান, যা সময়ে সময়ে সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ নেবে।

১৯৪৯-এর নভেম্বরে পিকিং-এ অনুষ্ঠিত এক এশীয় ও অস্ট্রেলেশীয় দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়ন সমাবেশ চীনা সংগ্রামের পদ্ধতিকে শক্তিশালী সমর্থন জানায়। এই সমাবেশে চীনা নেতা লিউ শাও চি বলেন যে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বিপ্লব চীনা পথে আনতে হবে। তিনি চীনা বিপ্লবের চতুঃশ্রেণী-পদ্ধতিকে সমর্থন জানিয়ে যেখানেই সম্ভব সশস্ত্র সংঘর্ষের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তিনি ভিয়েৎনাম, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, এবং ফিলিপিন্স্-এ গৃহযুদ্ধের সপ্রশংস উল্লেখ করে সশস্ত্র সংঘর্ষকেই সংগ্রামের প্রকৃত স্বরূপ বলে অভিহিত করেন। লিউ শাও চি বলেন, "The path taken by the Chinese people...is the path that should be taken by the people of many colonial and dependant countries in their struggle for national independence and People's Democracy...the mass movement that unfolded the war and developed into an armed struggle forced the British imperialists to make tactical retreat. A sham independence was bestowed on India. But the interests of British imperialism remain 'sacred and inviolable'...In these conditions, the task of the Indian Communists drawing on the experience of national liberation movement in China and other countires is naturally to strengthen the alliance of the working class with all the peasantry, to fight for the introduction of urgently needed agrarian reforms and on the basis of common struggle for freedom and national independence of their country, against the Anglo-American imperialists oppressing it and against the

reactionary big bourgeoisie and feudal princes collaborating with them--to unite all classes, parties, groups andorganisations willing to defend the national independence and freedom of India."

১৯৫০-এর জানুয়ারীতে 'কমিনফর্মে' প্রকাশিত এক নিবন্ধে এশীয় দেশগুলির জন্য চীনা সংগ্রামপদ্ধতির প্রশংসা করা হয়, যদিও লিউ শাও চির মত সেটাই একমাত্র পদ্ধতি একথা বলা হয় নি। এই নিবন্ধটি নূতন সোবিয়েত দৃষ্টিভঙ্গীর ইঙ্গিত দেয়। তাই চীনা পদ্ধতির কড়া সমালোচক রাণদিভেকে এবার মত পরিবর্তন করতে হয়। তিনি স্বীকার করে নিলেন যে তিনি 'ভুল, গোঁড়া ও একদেশদর্শী নির্দেশ' দেওয়ার দোষে অপরাধী। কিন্তু এ সত্ত্বেও রাণদিভে দলের সম্পাদক থাকতে পারলেন না। ১৯৫০-এর মে মাসে তাঁর পরিবর্তে অন্ধ্র কমিউনিস্ট নেতা সি রাজেশ্বর রাও দলের সম্পাদক হলেন। দলের মুখপত্র 'কমিউনিস্ট'-এর সম্পাদকমণ্ডলী পুনর্গঠিত হল এবং পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় একটি রচনায়[৯] রাণদিভেকে বামগোষ্ঠীর ট্রটস্কিপন্থী চিন্তার উত্থাপন, রূপায়ণ এবং সংরক্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হল এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হল যে ঔপনিবেশিক দেশগুলির কমিউনিস্ট দলগুলি চীনা কমিউনিস্ট দলকে নিজেদের আদর্শ হিসেবে মনে করে।

রাজেশ্বর রাও চীনা নীতি অনুযায়ী কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত বুর্জোয়াদিকে নিয়ে নয় এমনকি ধনী কৃষকদের নিয়েও এক যুক্ত জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করতে চান। তিনি বলেন, সশস্ত্র সংঘর্ষ চীনা বিপ্লবপন্থার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এই সংঘর্ষের ধারা গ্রামে মুক্তাঞ্চল-ভিত্তিক গেরিলা-বাহিনীর দ্বারা পরিচালিত হবে। এই সময় ভারতীয় কমিউনিস্টরা বিশ্বাস করতেন যে দেশ বিপ্লবের কিনারে এসে পৌঁছেছে এবং তাই তাঁরা ভারতের সর্বত্র সশস্ত্র কৃষিসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন।

রাণদিভে বা রাজেশ্বর রাও-এর মতবাদ যাই হোক, পি সি যোশী সশস্ত্র সংঘর্ষের নীতির বিরোধিতা করলেন। তিনি বললেন, "I think my comrade holding the present situation to be a revolutionady situation is unable to use the evidence of his own eyes anr ears. Of all our sectarian mistakes this has been the mest disastrous, for it has led to the adoption of tactics suited to an insurrectionary or semi-insurrectionary situation. The result has been that the masses have not responded to our calls and our comrades have landed themselves into the torrorist mire."

১৯৪৯-এর জুন মাসে ডাঙ্গে একটি বিবৃতিতে খেদ প্রকাশকরে বলেন যে কমিউনিস্ট পার্টি-নেতৃত্বের একটি অংশের অপরিণত ব্যবহারে লোকে ভাবছে যে বুঝি এই দল সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা করছে। তৎক্ষণাৎ দলের সংবাদপত্রে এর প্রতিবাদ প্রকাশ করা হয় এবং বলা হয় যে ডাঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত কথা বলছিলেন মাত্র, তাঁর বিবৃতি দলের মত নয়।

কিন্তু ১৯৫০-এর এপ্রিলে একটি পত্রে ডাঙ্গে আবার নেতৃত্বের চরমপন্থী নীতির সমালোচনা করেন। মধ্যপন্থী অজয় ঘোষ এবার ডাঙ্গেকে সমর্থন করে বলেন, "Today the reality is that nobody in the Indian Party can solve the crisis. It was the international comrades who pointed out our mistakes. Since we are not agreed on the interpretation, only they can help us. None of us is clear what the "Lasting Peace" editorial means."

১৯৫০-সালের অক্টোবরে এই আন্তর্জাতিক বন্ধুদের সাহায্য এসে পৌঁছলো—ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির লেখা ভারতীয় দলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি একটি গোপন পত্রের মাধ্যমে। এতে বলা হল যে ১৯৫০-এর জানুয়ারীতে 'কমিনফর্মে' প্রকাশিত 'ফর লাস্টিং পীস্' নিবন্ধের ভুল ব্যাখ্যা করে ধরে নেওয়া হচ্ছে বুঝি সশস্ত্র সংঘর্ষই ভারতের পক্ষে একমাত্র পথ। এ পদ্ধতি যথাকালে এবং অবস্থা অনুকূল হলে অনুসৃত হতে পারে, কিন্তু ভারতীয় কমিউনিস্টরা হঠকারী ট্রটস্কি নীতি যেন অনুসরণ না করে। তাদের উচিত সেই সময়ে আইনসঙ্গত সংগ্রামের সমস্ত পন্থা অনুসরণ করা—এমনকি নির্বাচনে অংশগ্রহণ পর্যন্ত।

ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা রজনী পাম দত্ত ঘোষণা করলেন[১০] যে ভারতীয় পরিস্থিতি সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত নয়। কমিউনিস্টদের উচিত এমন একটি ব্যাপক গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট গঠনে প্রয়াসী হওয়া যার দ্বারা প্যাটেল ও নেহেরুর দ্বন্দ্বকারী ও দ্বিধাগ্রস্ত দুই গোষ্ঠীর উপরে গণ-আন্দোলনের চাপ সৃষ্টি করে ভারত সরকারকে সত্যকার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পথ গ্রহণ করতে বাধ্য করা যায়। এই জাতীয় চাপ সৃষ্টি করার জন্য চারটি শ্রেণীকে নিয়ে একটি ব্যাপক গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট তৈরী করতে হবে যার লক্ষ্য হবে পরবর্তী কালে 'জনগণতন্ত্র' বা নবগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

আন্তর্জাতিক বন্ধুদের উপদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় কমিউনিস্টরা গণ অভ্যুত্থানের কথা আপাতত স্থগিত রাখলেন এবং তার পরিবর্তে ভারতীয় সংবিধানে নির্দিষ্ট আইনসঙ্গত সংগ্রামের পথ গ্রহণ করলেন, যার মধ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ একটি। নীতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নেতৃত্বের পরিবর্তনও হল। ১৯৫১ সালের ১লা জুলাই রাজেশ্বর রাও-এর পরিবর্তে দলের সাধারণ সম্পাদক হলেন মধ্যপন্থী অজয় ঘোষ। অজয় ঘোষ জানতেন যে দেশ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হয় নি, তাই তিনি নেহেরু সরকারের সাংবিধানিক বিরোধিতার নীতিতে মনঃসংযোগ করলেন। তিনি চেষ্টা করলেন যাতে দল হঠকারী নীতি অনুসরণ না করে। বস্তুতঃ ১৯৫১ সালে পলিট ব্যুরো আক্ষেপ করে একটি বিবৃতিতে বলে, "We woke up suddenly like Rip Van Winkle at the end of 1947 to jump into left sectarianism which has brought the party and the mass movement to the present plight of total disruption."

কিন্তু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে গেলে দলকে তার বিপ্লবী কার্যক্রমের

কিছুটা পরিবর্তন করতে হয়। সুতরাং ১৯৫১-৫২-র প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে সি. পি. আই তাঁদের নির্বাচনী ইস্তাহারে বলেন যে সমাজতন্ত্র যদিও লক্ষ্য তবু ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে সি. পি. আই তৎক্ষণাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার কথা বলছেন না। তখনকার মত সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন মিশ্র অর্থনীতিই মেনে নেওয়া হল—এমনকি বিদেশী শিল্পের পরিবর্তে দেশী বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠাও। প্রলেটারিয়েট, কৃষকসমাজ ও পেটি বুর্জোয়াজি ছাড়া মধ্য-বুর্জোয়াজির স্বার্থ-সংরক্ষণও দলের উদ্দেশ্য ঐ রকমই ঘোষণা করা হল।[১১] অবশ্য সেই সঙ্গেই জনগণকে আহ্বান জানানো হল যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে এবং তাদের সতর্ক করে দেওয়া হল যে নেহেরু সরকার সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আবদ্ধ এবং তাঁর শান্তিনীতি বহুলাংশে মিথ্যাচরণ মাত্র।[১২]

প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সি পি আই. লোকসভার ১৬টি আসনে বিজয়ী হয়ে বৃহত্তম একক বিরোধী দল হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করলেন। এই সাফল্যের ভিত্তিতে ১৯৫৩-র মাদুরাই সমাবেশে দলের সদস্যদের বলা হল তাঁরা যেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতির আইনসঙ্গত কর্মসূচীকে অবহেলা না করেন। এই নীতির আরও সুফল পাওয়া গেল দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে. যখন কেরালায় কমিউনিস্টরা সরকার গঠন করতে সক্ষম হলেন। কেন্দ্রেও তাঁদের অবস্থার উন্নতি হল, এবং কয়েকটি রাজ্যেও। নিচের তালিকা থেকে একথা বোঝা যাবে ঃ

বিভিন্ন রাজ্যে কমিউনিস্টদের স্থান

রাজ্য	ভোটের শতকরা ভাগ	
	১৯৫১-৫২ নির্বাচন	১৯৫৭ নির্বাচন
কেরালা	১৭.৫	৩৫.৩
পশ্চিমবঙ্গ ..	১০ ৪	১৭.৮
অন্ধ্র .	২২.৮	২৯.৫
উড়িষ্যা	৫ ৭	৮ ৪
মাদ্রাজ	৯ ৮	৭.৪
পাঞ্জাব .	৬ ২	১৩ ৬
বিহার .	১ ১	৫ ২
আসাম ..	২.৪	৮.১
মহারাষ্ট্র ..	২ ৫	৬ ৩
উত্তরপ্রদেশ ..	০.৯	৩.৮

বিভিন্ন রাজ্যে কমিউনিস্টদের স্থান

রাজ্য		ভোটের শতকরা ভাগ	
		১৯৫১-৫২ নির্বাচন	১৯৫৭ নির্বাচন
রাজস্থান	..	০.৬	৩ ০
মহীশূর	.	১ ৪	১ ৯
মধ্যপ্রদেশ	.	০ ৭	১ ৬
গুজরাট	..	২ ৫	০ ৮

লোকসভায় কমিউনিস্টদের স্থান

সাল	ভোটের পরিমাণ	আসনের পরিমাণ
১৯৫২	৩,৪৮৪,৪০১	১৬
১৯৫৭	১০,৭৫৪,০৭৫	২৭

এইসব নির্বাচনের ফলাফলে প্রতীয়মান হল যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান-গুলির মাধ্যমে বেশ সুফল আসতে পারে। তাই ১৯৫৮ সালে এপ্রিলে অমৃতসরে কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ কংগ্রেসে বলা হল যে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রসারকে ছোট করে দেখা উচিত হবে না। অমৃতসরে গৃহীত দলের নূতন সংবিধানে লেখা হল যে, দল সমস্ত দেশপ্রেমী ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে একতাবদ্ধ করবে ও নেতৃত্ব দেবে। নূতন সংবিধানে বিপ্লবের অনিবার্যতা বা সর্বহারার একনায়কত্ব সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ রইল না, বলা হল যে দলকে "democratic centralism"-য়ের ভিত্তিতে গঠিত করে তোলা হবে। কিন্তু একটি অভিনব ও ইঙ্গিতপূর্ণ কথা সংবিধানে অনুপ্রবিষ্ট হল "The Communist Party of India strives to achieve full democracy and socialism by peaceful means. It considers that by developing a powerful mass movement, by winning a majority in Parliament and by backing it with mass sanctions, the working class and its allies can overcome the resistance of the forces of reaction and ensure that Parliament becomes an instrument of people's will for effecting fundamental changes in the economic, social and state structure."

১৯৬২ সালের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে পার্টির আরও উন্নতি ঘটেছে। এই নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির ভোটের শতকরা প্রাপ্তির হিসাব একটু পরে সন্নিবেশিত হল, শুধু কেরালা আর উড়িষ্যার অঙ্কগুলি যথাক্রমে ১৯৬০-এর ফেব্রুয়ারীতে ও ১৯৬১-র জুনে অনুষ্ঠিত অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের সূচক।

কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে কেরল রাজ্য সরকারের পতনের পর যে অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন কেরালায় হয়, তাতে সমস্ত অ-কমিউনিস্ট দলগুলি যুক্তফ্রন্ট করেন এবং তার ফলে কমিউনিস্টরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে যান; কিন্তু তা সত্ত্বেও কমিউনিস্টদের মোট ভোটের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। পরবর্তী নির্বাচনে আবার কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় ফিরে আসেন।

১৯৬৭ সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের আগেই কমিউনিস্টরা সি. পি. আই. এবং সি পি আই (এম.)---এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে যান। ১৯৬৭-র সাধারণ নির্বাচনে লোকসভায় সি পি আই. ২৩টি আসন ও মোট ভোটের ৫ ১৯ ভাগ পায় এবং সি পি আই (এম) ১৯টি আসন ও ভোটের শতকরা ৪.২১ ভাগ পায়। পরবর্তী কালে ,১৯৭১-এর লোকসভা নির্বাচনে সি পি আই ২৩টি আসন ও ভোটের শতকরা ৪ ৮৯ ভাগ পায় এবং সি. পি আই (এম) পায় ২৫টি আসন ও ভোটের শতকরা ৪.৯৭ ভাগ।

১৯৬২-র সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টির স্থান

রাজ্য	ভোটের শতকরা ভা
কেরালা	৩৯ ১
পশ্চিমবঙ্গ	২৫ ০
অন্ধ্র	১৯ ৩
উড়িষ্যা	৮ ০
মাদ্রাজ	৭ ৮
পাঞ্জাব	৭ ১
বিহার	৬ ৩
আসাম	৬ ৩
মহারাষ্ট্র	৫ .৪
রাজস্থান	৫ ৪
মহীশূর	২ ৩
মধ্যপ্রদেশ	২ ০
গুজরাট	০ ২

মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালাতেই কেন্দ্রীভূত। এই দুই দলের অঞ্চল-ভিত্তিক সদস্যসংখ্যা নিচে দেওয়া হল।[১৩]

বিভিন্ন রাজ্যে সি.পি.আই. ও সি.পি.আই. (এম.) সদস্যসংখ্যা

রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	সি.পি.আই. ১৯৬৬	সি.পি.আই (এম). ১৯৬৮	সি.পি.আই ১৯৭০
অন্ধ্র	২৫,৯০৯	৯,৪২৮	৩৭,০৪৩
আসাম	৫,০৫৫	৭৫১	৭,২০০
বিহার	২৫,১৬২	২,৮৮২	৪৮,৫৮০
দিল্লী	১,৩২৬	২৫০	৪,২৮৮
গোয়া	২৫০	২৫০	৪০০
গুজরাট	৭৯০	২৫০	২,১৯৪
হরিয়ানা	১,০৭৮	৪০০	২,৩৩০
হিমাচল প্রদেশ	৫৬৭	---	৮৬১
জম্মু ও কাশ্মীর	১৫৩	---	৩১৫
কর্ণাটক	১,২০০	১,১৯৪	১,০০০
কেরালা	২১ ২১৭	২০,৯১২	৩৩,০০০
মধ্যপ্রদেশ	৩,০০০	৪৮৬	৪,৯৭৫
মহারাষ্ট্র	১১,১৭৫	২,৩১৬	১০,৬৩০
মণিপুর	১,৫০০	২০০	৯৬৫
উড়িষ্যা	৪,০০০	৫৪১	৫,০৬৪
পাঞ্জাব	৯,০০০	৪,১০০	৭,৯৮৪
রাজস্থান	২,৬০০	১,১৯৫	১,১৯৭
তামিলনাড়ু	১৮,৫০০	১০,০১১	২৩,৫০০
ত্রিপুরা	১,০০০	২,০৯২	৭৫০
উত্তরপ্রদেশ	২১,৭২৬	৩,০৯৫	২৪,০০০
পশ্চিমবঙ্গ	১৭,৬৩৯	১৬,০৬৬	২৮,৮৫৬
পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থা	৫৫	---	১০৬
	১,৭২,৯০২	৭৬,৪১৯	২,৪৫,২৩৮

যদিও স্বাধীনতার পর থেকে সবকয়টি নির্বাচনে কমিউনিস্টরা অংশ-গ্রহণ করছেন, তবুও সংসদীয় গণতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁদের কি দৃষ্টিভঙ্গী হওয়া উচিত সে কথা বিতর্কিত থেকে গেছে। লেনিন সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান বলে আখ্যা দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গেই বলেছিলেন যে কমিউনিস্টদের তাতে অংশগ্রহণ করা উচিত—অন্ততঃ এই সব প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে জনসাধারণের ভ্রান্ত আশা ভেঙে দেবার জন্য। তিনি বলেছিলেন, "Precisely because the backward masses of the workers and to an even greater degree---the small peasants are in Western Europe much more imbued with bourgeois-democratic and parliamentary prejudices than they are in Russia, precisely because

of that, it is onlyf rom within such institutions as bourgeois parliaments that communists can (and must) wage a long and persistent struggle, undaunted by any difficulties, to expose, dissipate and overcome these prejudices."[১৪]

কমিউনিস্টরা বিশ্বাস করেন, যে ধনতন্ত্র ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ধ্বংস অনিবার্য এবং সেই স্থানে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা একটি ঐতিহাসিক বিধান। আর মার্ক্সীয় কমিউনিজমের মূল নীতিই হল যে সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে জনসাধারণের নেতৃত্ব দিতে পারে একমাত্র শিল্প-শ্রমিকরা—প্রলিটারিয়েটরা। এই কারণেই প্রলিটারিয়েটের একনায়কত্বের প্রয়োজন। এই প্রলিটারিয়েট একনায়কত্বই মার্ক্স-লেনিনবাদীদের সঙ্গে সমাজবাদী গণতান্ত্রিকদের সবচেয়ে বড় পার্থক্য। লেনিন লিখেছিলেন, "Only he is a communist who extends the recognition of the class struggle to the recognition of the dictatorship of the proletariat This is what constitutes the most profund difference between the Marxist and the ordinary petty (as well as big) bourgeoisie. This is the touchstone on which the real understanding and recognition of Marxism is to be tested."

কমিউনিস্টদের বিশ্বাসে প্রলিটারিয়েটের একনায়কত্ব সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের রূপ নেয়। লেনিন বলেছিলেন যে এই ধরনের গণতন্ত্রই কৃষক ও শ্রমিকদের সবচেয়ে বেশী গণতন্ত্রের সুযোগ দেয় এবং সেই সঙ্গে বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন এটা বিশ্ব-ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ নূতন সংযোজন এনে দেয়। এরই নাম প্রলিটারিয়েটের গণতন্ত্র বা প্রলিটারিয়েটের একনায়কত্ব। এই একনায়কত্ব বুর্জোয়াজির বিরুদ্ধে। এই একনায়কত্বে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে সমগ্র শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য সাধিত হবে কিন্তু তা হবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে।

প্রলিটারিয়েট একনায়কত্ব বিভিন্ন রূপ নিতে পারে—রাশিয়াতে এর রূপ নিয়েছে সোবিয়েৎ প্রতিষ্ঠায়, যেখানে বলা হয় যে ক্ষমতা প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীর হাতে সীমাবদ্ধ, শ্রমিক ও কৃষক। চীনে এই রূপ নিয়েছে যাকে বলা হয় 'জনগণতন্ত্র' (People's Democracy) প্রতিষ্ঠায়। দাবি করা হয় যে জনগণতন্ত্রে শ্রমিকশ্রেণী, সকল স্তরের কৃষক, শহর-অধিবাসীদের মধ্যস্তর এবং বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত বুর্জোয়াজির কিয়দংশ অংশগ্রহণ করছে।

কমিউনিস্টরা বলেন যে সম্পত্তিবান্দের প্রতিকূলতার জন্য সংসদীয় গণতন্ত্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দ্রুত ও ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা সামাজিক সাম্য আনতে পারবে না। তবুও তাঁরা দাবি করেন যে সংসদীয় গণতন্ত্রকে পরীক্ষা করার জন্য তাঁরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন।[১৫] এই প্রসঙ্গে তাঁরা লেনিনের একটি উক্তির[১৬] উল্লেখ করেন, "Communists must not stew in their own juice, but learn how to penetrate into the prohibited premises where the representatives of the bourgeoisie exercise influence over the workers; they

must not hesitate to make certain sacrifices and not be afraid to make mistakes, which are inevitable in every new and difficult undertaking."

বুর্জোয়া সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে যোগদানের ফলে কমিউনিস্টরাই কিছু পরিমাণে নমনীয় হয়ে যাবেন কিনা এ প্রশ্নও ওঠে। কিন্তু কমিউনিস্টরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে তাঁরা নমনীয় হবার জন্য সংসদে প্রবেশ করেন নি, এমনকি সংসদীয় গণতন্ত্রের নীতি অনুযায়ী একদল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবে এবং একদল তার বিরোধী হবে এই ব্যবস্থাও চিরকাল থাকবে বলে তাঁরা মেনে নেন নি। তাঁরা বলেন যে এটা ঠিক যে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে, যেমন ব্রিটিশ ইতিহাসের আধুনিক কালে, রাজনৈতিক ক্ষমতা দুটি বৃহৎ দলের মধ্যে ওঠানামা করেছে; কিন্তু এই ব্যবস্থাকেই রাজনৈতিক জীবনের সর্বজনীন ব্যবস্থা বলে স্বীকার করার কোনও কারণ নেই। তাঁরা দাবি করেন যে যখন লক্ষ্যবস্তু সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, তখন ধনতান্ত্রিক মতাদর্শী বিরোধী দল, যা স্বভাবতঃই ধনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাইবে, তাকে কোন স্থান দেওয়া যেতে পারে না। কারণ যখন সামাজিক অর্থনৈতিক মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন তখন বিরোধী মতের প্রশ্রয় দেওয়ার মানে হবে ধ্বংসকে ডেকে আনা।[১৭]

মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলার অন্যতম আসামী ফিলিপ স্প্রাট জবরদস্ত একতন্ত্র পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে খুব সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন, "It seems that we who are communists need not be careful to disguise the brutal blood-thirsty side of our proposals. Modern society is based on brutality, and if we want to get rid of it, we have to use fierce brutality .. We shall not disguise the fact that in the course of attainment of our aims and the establishment of communism, we shall have to indulge in brutal dictatorial methods."[১৮]

কমিউনিস্টরা ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র উচ্ছেদ করে প্রলিটারিয়েটের একনায়কত্ব চান। তাঁরা বলেন যে একমাত্র দ্রুত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রযোজনার দ্বারা অনগ্রসর ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব এবং সেটা সম্ভব কেবলমাত্র একনায়কত্বের মাধ্যমে পুঁজিবাদীদের নির্মম অবদমনে। এই একনায়কত্বের বিকল্প হল ধনতান্ত্রিক বা ফ্যাসিবাদী স্বৈরতন্ত্র। তাঁরা মনে করেন যে এই জাতীয় একনায়কত্বে বহুর স্বার্থসংরক্ষণ সম্ভব আর অন্য যে-কোন ব্যবস্থায় শুধুমাত্র সুবিধাভোগী স্বল্প লোকের স্বার্থ রক্ষিত হবে।

যখন সমাজ এমন একটা ভারসাম্যে পৌঁছায় যে সমাজের সংগঠন ও চরিত্র সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্নের অবকাশ থাকে না কেবল তখনই, কমিউনিস্টদের মতে, ব্রিটেনের মত দুই দলের সংসদীয় ব্যবস্থা যথার্থভাবে কার্যকরী হতে পারে। কারণ এই অবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এমন একটা মূলগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় যাতে সরকারের পরিবর্তনের সঙ্গে কোন চরিত্রগত সামাজিক বা অর্থনৈতিক পরিবর্তন আসে না। কিন্তু

কোন একটা জাতীয় সঙ্কটের মুহূর্তে যখন সমগ্র জাতির চেতনা ও প্রয়াস ঐক্যবদ্ধ করা অপরিহার্য, সেই সময়ে বিরোধী সত্তাকে স্বীকার করা যায় না। এই কারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্রিটেনে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সংসদীয় বিরোধিতার অস্তিত্বই ছিল না। ঠিক সেই রকমই যখন দেশে একটি নূতন সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে তখন সেই নূতন কাঠামোর বিরুদ্ধবাদীদের দেশের রাজনৈতিক জীবনে, কমিউনিস্টদের মতে, কোন স্থান থাকতে পারে না। এই যুক্তির ভিত্তিতে কমিউনিস্টরা বলেন যে সোবিয়েত দেশে ব্রিটেনের মত সংসদীয় বিরোধী দল নেই বলেই যে সে দেশ স্বৈরতন্ত্রী এ কথা বলা যায় না।

১৯৫৬ সালে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বিংশতিতম কংগ্রেসে সমাজ-তন্ত্রে শান্তিপূর্ণ উত্তরণের নীতি গৃহীত হয়। তারপর দক্ষিণপন্থী কমিউ-নিস্টরা দাবি করেন যে ভারতবর্ষেও শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা দখল করা সম্ভব হতে পারে। তাঁরা এই যুক্তি দেন যে মার্ক্স এ কথা বলেন নি যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বলপ্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী, তিনি বলেছিলেন যে ব্রিটেন কিংবা যুক্তরাষ্ট্রে যদি শ্রমিকশ্রেণী পার্লামেন্ট অথবা কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে তা হলে তাঁরা সমাজতান্ত্রিক উত্তরণের পথে বাধাস্বরূপ যে আইনগুলি আছে সেগুলিকে নাকচ করে দিতে পারেন।

মার্ক্স শ্রমিকশ্রেণীকে দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই জন্য তিনি শ্রমিকশ্রেণীকে দেশের অন্যান্য বঞ্চিত শ্রেণীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করতে বলেছিলেন, বিরোধিতা করে নয়। যদি শ্রমিকরা এইভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে তাহলে আর বল-প্রয়োগের কোন প্রয়োজনীয়তা বা ঔচিত্য থাকে না।

দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টদের মতে বলপ্রয়োগ কমিউনিস্ট রণ-কৌশলের অপরিহার্য অঙ্গ তো নয়ই, বরং শাসকশ্রেণীই শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামকে অবদমনের জন্য বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেয়। কিন্তু তাঁরা এ আশঙ্কাও প্রকাশ করেন যে যখন সংসদীয় গণতন্ত্রের পদ্ধতিতে সত্যিই মৌলিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দেবে তখন ক্ষমতাসীনেরা শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা সমর্পণ না করে তাদের ক্ষমতা অব্যাহত রাখার জন্য লড়াই করতে পারেন। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় উত্তরণ এত মৌলিক ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনে যে, তাঁদের মতে, সর্বদা ও সর্বত্র তা যে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সংঘটিত হবে একথা মনে করা অবাস্তব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন কমিউনিস্ট প্রভাবান্বিত রাষ্ট্রগুলি পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের উপর কর্তৃত্ব পেল এবং শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি প্রচণ্ড পরিমাণে বেড়ে গেল, তখন ক্রুশ্চেভ-প্রমুখ কিছু কমিউনিস্ট নেতা মনে করলেন যে রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়ত সম্ভব হবে। তাই ১৯৫৬ সালের সোবিয়েৎ কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে এবং ১৯৫৭-এর নভেম্বরে মস্কোতে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ও শ্রমিকদলের সমাবেশের

ঘোষণাতে সমাজতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ উত্তরণের কথাই বলা হল। এরও পরে ১৯৬০ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত ৮১টি দলের সমাবেশেও এই শান্তিপূর্ণ উত্তরণে বিশ্বাস পুনঃপ্রচারিত হল। এই শান্তিপূর্ণ উত্তরণের ভাবধারা কমিউনিস্ট আন্দোলনের ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব আনে; কিন্তু চীনা কমিউনিস্টরা এবং তারপর ভারতের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট দল এই মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন।

সি পি আই. দাবি করেন যে ভারতে সমাজতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ উত্তরণ সম্ভব এই চিন্তা মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ বিরোধী নয়, বরং ভারতে যখন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ও শক্তিশালী গণ-আন্দোলন গড়ে উঠেছে সেই পরিস্থিতিতে এ চিন্তা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের সৃজনধর্মী প্রয়োগ হিসাবেই গ্রহণ করতে হবে। সি পি আই বলেন, "It is possible that by developing a powerful mass revolutionary movement, by winning a stable majority in Parliament, backed by such a movement, the working class and its allies will be able to overcome the resistance of the forces of reaction and transform Parliament from an instrument serving the bourgeoisie into a genuine instrument of people's will for effecting a fundamental transformation in the social, economic and state structure. It is possible in India to avoid the possiblity of going through an armed civil war as the form of the revolutionary transformation. Such a possibility has been made real by the changed balance of forces in the world to the advantage of the forces struggling for revolutionary transformation of society and for socialism. This change has made the possibility of the imperialist export of counter revolution more difficult than in the past and it was precisely this export of counter revolution which is one of the most important factors making armed civil war more or less inevitable and peaceful transition a rare chance. Besides, in India, the class alliance for national democratic revolution is a very broad one and the forces opposing the revolution have a very narrow social base and can be isolated to a considerable extent. Finally, in India people through their struggles have won certain democratic rights and a parliamentary democratic form of state has been secured which offer certain scope to the democratic forces and whose potential can be increased through the extension of democracy. In the countries where the revolution succeeded through bitter armed civil war, such rights and such a system did not exist."[১৯]

সি পি আই এ কথা বলেন না যে তাঁরা চিরকালের জন্য বলপ্রয়োগের পদ্ধতি পরিহার করলেন, কারণ যদি শাসকশ্রেণী বলপ্রয়োগ করে তাহলে

শ্রমিকশ্রেণীকেও সেই পদ্ধতিই গ্রহণ করতে হবে। কমিউনিস্টদের তাই সবরকম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তবুও ভারতের বিশেষ পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সফল হবার প্রচেষ্টা করা উচিত। সি পি আই বলেন যে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ কোথাও বলে না যে বিপ্লব আর বলপ্রয়োগ ও সশস্ত্র গৃহযুদ্ধ এক জিনিস, কিংবা বৈপ্লবিক ক্ষমতা একমাত্র বন্দুকের নলের ভিতর দিয়ে জন্ম নেয়। কমিউনিস্টরা বলপ্রয়োগ বা অহিংসা কোনটা নিয়েই মাতামাতি করেন না। তাঁরা বিপ্লবের জন্য সংগ্রাম করেন, সম্ভব হলে শান্তিপূর্ণভাবে, আর প্রয়োজন হলে সশস্ত্র গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে।[২০]

সি পি আই (এম) কিন্তু সমাজতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ উত্তরণের এই চিন্তাধারাকে লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুতি বলে মনে করেন। লেনিন অবশ্য সশস্ত্র সংঘর্ষকেই বিপ্লবের বাধ্যতামূলক পদ্ধতি বলে স্বীকার করেন নি। তিনি একথা কল্পনা করেছিলেন যে কোন ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, যার প্রতিবেশী একটি বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আছে, সে সমাজতন্ত্রে শান্তিপূর্ণভাবে এগিয়ে যেতে পারে, যদিও এ রকম ঘটনা বহুল হবে বলে তিনি মনে করেন নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রণ বলবৎ হল এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রে সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলি কার্যকর হয়ে উঠল তখন ক্রুশ্চেভ প্রমুখ কয়েকজন সোবিয়েৎ নেতা আশা করেছিলেন যে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব হবে। কিন্তু মার্ক্সবাদী ভারতীয় কমিউনিস্ট দল এইরূপ মতবাদকে সমালোচনা করে বলেন, "But the modern revisionists maintain that in view of the changed correlation of forces on an international scale as well as in each country in favour of the proletariat and in view of the ever-increasing grip of ideas of socialism on the minds of wide masses of people, the universal law of violent revolution as propounded by Marx, Engels, Lenin and Stalin forced on the proletariat by the bourgeoise, and as universally accepted by the Marxist Leninists has become outmoded and hence to be discarded. In its place, they argue, the law of peaceful transition and parliamentary path is to be substituted ; they even expound the thesis that socialist transformation can be effected by a state of so-called national democracy where bourgeoisie and proletariat hold joint hegemony of the National Democratic Revolution and the National Democratic State...."[২১]

মার্ক্স অবশ্য নির্বাচনের দ্বারা ক্ষমতা পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে পুরোপুরি অস্বীকার করেন নি। ১৮৭০ সালে তিনি এবং এঙ্গেলস্‌ ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে বলেন যে এই দেশ-দুটিতে যেহেতু সংসদীয় প্রতিষ্ঠান-গুলির সম্যক অগ্রগতি হয়েছে সেইজন্য এই দুটি দেশকে বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের নীতির ব্যতিক্রম বলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু সি.পি.আই. (এম) দাবি করেন যে তারপর থেকে বাস্তব পরিস্থিতির

আমূল পরিবর্তন ঘটেছে এবং সেই কারণেই লেনিন সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদ স্তর পর্যন্ত ধনতন্ত্রের বিকাশ সমীক্ষা করে বলেছিলেন যে ১৮৭০ সালে মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্ ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে যে ব্যতিক্রমের কথা ভেবেছিলেন তা আর প্রযোজ্য নয়।

১৯৬০ সালের মস্কো সমাবেশে গৃহীত সমাজতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ উত্তরণের নীতি পুনরায় ১৯৬৯ সালের মস্কো সমাবেশে গৃহীত হয়। সি পি.আই (এম) ১৯৬৯ সালের মস্কো সমাবেশের বিবৃতির সমালোচনা করে উল্লেখ করেন যে ১৯৬০ সালের সমাবেশের বিবৃতিতে তবু যে সতর্কবাণীটুকু ছিল যে "Leninism teaches and experience confirms that ruling class never relinquish power voluntarily", সেটুকুও ১৯৬৯-এর বিবৃতি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।[২২] মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের যুদ্ধ ও বিপ্লব সম্বন্ধে চিন্তাধারার এই বিশিষ্ট অঙ্গটি বাদ পড়ার ফলে মার্ক্সীয় ভারতীয় কমিউনিস্টরা আশঙ্কা করেন যে এই নূতন মতবাদ সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি একটি ভ্রান্ত মোহ সৃষ্টি করবে এবং বৈপ্লবিক উদ্দীপনাকে স্তিমিত করে দেবে। সি পি আই (এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি বলেন, "The document (issued by 1969 Moscow conference) sustains the illusion that far reaching social changes can take place in newly liberated countries, and these countries can develop a socialist orientation without an organised party of working class based on Marxism-Leninism and without the leading rule of the working class"[২৩]

যদিও মার্ক্সবাদী কমিউনিস্টরা সমাজতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ উত্তরণের নীতি অস্বীকার করেছিলেন তবুও তাঁরা মাওবাদী বা নক্‌শালবাদীদের মত একথা মনে করতেন না যে সংসদীয় পথে কোন ফলই পাওয়া যাবে না। সি পি আই (এম) দলের ১৯৬৪ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে গৃহীত কার্যসূচীতে বলা হল, "However, universal adult franchise and parliamentary and State legislatures can serve as instruments of the people. Although a form of class rule of the bourgeoisie, India's present parliamentary system also embodies an advance of the people. It affords certain opportunities to them to defend their interests..."[২৪]

সঙ্গে সঙ্গে কর্মসূচীতে এই সাবধানবাণীও সংযোজন করা হল যে আসলে সংসদীয় কাঠামোতে ভাঙন ধরায় শোষকশ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণী নয় এবং "it will be a serious error and dangerous illusion to imagine tha our country is free from all such threats. It is of utmost importance that parliamentary and democratic institutions are defended in the interest of the people against such threats, and such institutions are skilfully utilised in combination with extra-parliamentary activities."[২৫]

এই সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবহারের জন্য সি.পি.আই. (এম.)

১৯৬৭-র চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর কেরালায় এবং পশ্চিমবঙ্গে যেসব সহযোগী দলের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে পরে তাঁদের নানা কারণে সংঘর্ষ বাধে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী-কালীন নির্বাচনের পরেও সেই একই ঘটনা ঘটেছিল। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার কিছুদিন পর থেকেই ফ্রন্টের অন্যান্য শরিকরা অভিযোগ তোলেন যে সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি অথবা মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্ববোধ পালনে সি পি আই (এম)-এর বিশ্বাস বা আস্থা নেই, এবং তাঁরা সরকারে এসেছেন দলের স্বার্থে সরকারী যন্ত্রকে ব্যবহার করার জন্য। কেরালায় এই অভিযোগ তোলেন সি পি আই আর পশ্চিমবঙ্গে তোলেন সি পি আই. ছাড়াও বাংলা কংগ্রেস, এস ইউ সি. এবং অন্যান্য কিছু দল। এই অন্তর্দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য কেরালায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হল ১৯৬৯-এর অক্টোবরে এবং পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭০-এর মার্চে।

১৯৬৯-এর জুন মাসে সি পি আই দলের সাধারণ সম্পাদক রাজেশ্বর রাও বলেন যে কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম) দল যুক্তফ্রন্টের বৃহত্তম শরিক হিসেবে অন্যান্য শরিকদের প্রতি এবং বিশেষ করে সি পি আই-এর প্রতি আধিপত্য ও হুকুম করার মনোভাব পোষণ করছেন।[২৬] যদিও পশ্চিমবঙ্গের আগেই কেরালার যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হয় তবুও পশ্চিমবঙ্গের সহযোগী দলগুলির সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আরও বেশী ছিল। ১৯৬৯-এর জুন মাসে সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট দল মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট দলের বিরুদ্ধে নালিশ করেন যে তাঁরা সংযুক্ত সোশ্যালিস্টদলের কর্মীদের মারধোর করছেন এবং মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট মন্ত্রীর অধীনের পুলিস তাতে হস্তক্ষেপ করছে না।[২৭] ১৯৬৯-এর জুন মাসে প্রজা-সোশ্যালিস্ট দল অভিযোগ করেন যে নক্শালবাদীদের মতই গণতন্ত্রে অবিশ্বাসী সি পি আই (এম) পশ্চিমবঙ্গে শান্তি ও শৃঙ্খলা ভেঙে অরাজকতা আনতে চাইছেন।[২৮] ১৯৬৯-এর জুলাই মাসে এস.ইউ.সি. দল বলেন, পশ্চিমবঙ্গের অশান্তির কারণ হল এই যে সি পি আই (এম) অন্য সব দলকে নিশ্চিহ্ন করে একমাত্র দল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন।[২৯] অপরপক্ষে সি পি আই (এম) দল এইসব অভিযোগের উত্তরে বলেন যে তাঁদের প্রস্তাবিত প্রগতিশীল কার্যক্রমকে বানচাল করার জন্য যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিক তাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। যা হোক, ১৯৬৯-এর সেপ্টেম্বরে অবস্থা এই দাঁড়ায় যে সি পি আই দল ঘোষণা করেন যেহেতু সি পি আই (এম) দলের কর্মীরা সি পি আই দলের কর্মীদের লাঞ্ছনা করছেন এবং মার্ক্সীয় দলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নিতে অস্বীকার করেছেন সেই জন্য তাঁরা আর যুক্তফ্রন্ট সভায় যাবেন না।[৩০] পরিশেষে বাংলা কংগ্রেস নেতা ও যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রি-সভার মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করেন যে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুলিসকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছেন এবং প্রধানতঃ সেই জন্যেই পশ্চিম বাঙলায় আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে।[৩১] ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বরে তিনি বলেন যে পুলিস-নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে কলকাতার

কার্জন পার্কে তিনি তিন দিন অনশন করবেন। অনশনের পর তিনি পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘোষণা করেন যে গলায়-লাল-রুমাল-বাঁধা যুবকরা শ্রেণীসংগ্রামের নামে রাজ্যে নানাবিধ অনাচার করছেন।[৩২] এমনকি পশ্চিম বাঙলার সরকারকে তিনি বর্বর বলে আখ্যা দেন। ১৯৬৯ সালের ১৬ই মার্চ তিনি পদত্যাগ করেন এবং সেই সঙ্গে পশ্চিম বাঙলায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের অবসান হয়।

যদিও অন্য দলের সঙ্গে একযোগে যুক্তফ্রন্ট সরকার চালাতে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্টরা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তবুও তাঁরা সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে কাজে লাগানোর নীতি পরিত্যাগ করেন নি। এইখানেই তাঁরা নক্‌শালপন্থীদের থেকে পৃথক্—কারণ নক্‌শালপন্থীরা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কাজ করা একেবারেই অর্থহীন বলে মনে করতেন।[৩৩]

নক্‌শালপন্থীদের মতে ভারত সরকার একটি ক্রীড়নক সরকার এবং ভারত রাষ্ট্র একটি নব ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এবং উভয়কেই সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা অপসারিত করতে হবে। তাঁদের কর্মসূচীতে বলা হল, "In this situation fearing revolution, the big bourgeoisie (representingt the monopoly and big capitalists) of the country established Congress rule in 1947 on the basis of collaboration with imperialism so as to preserve in fact the interest of imperialism and to exploit jointly with imperialism Indian labour and resources." ভারত রাষ্ট্রের এই বিশ্লেষণ স্বাভাবিকভাবেই সেই রাষ্ট্রকে সশস্ত্র সংঘর্ষের দ্বারা অপসারণের নীতিতেই নক্‌শালপন্থীদের নিয়ে যায়। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্টরা ১৯৬৭ সালের আগস্টে বলেন যে এই বিশ্লেষণ "বাম-বিচ্ছিন্নতা ও হঠকারিতার ভ্রান্তিতে ভ্রান্ত। . ক্রীড়নক সরকার আর নব-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কথা দুটির অর্থ কী? . .এর অর্থ হল যে রাষ্ট্রের সরকার ইতিমধ্যে জনবিচ্ছিন্ন, সম্পূর্ণ একাকী, সর্বজনীনভাবে ঘৃণিত এবং সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া জনসাধারণের আর কোন উপায়ই নেই।"[৩৪] এই বিশ্লেষণের সঙ্গে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্টরা একমত হতে পারেন নি।

ভারত রাষ্ট্রকে নব-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এবং সরকারকে ক্রীড়নক সরকার ধরে নিয়ে নক্‌শালপন্থীরা জনসাধারণকে সম্পূর্ণভাবে সংসদীয় পথ পরিত্যাগ করতে বলেন। মাও-এর শিক্ষা যে 'ক্ষমতা বন্দুকের নল থেকে জন্ম নেয়' সেই শিক্ষাই তাঁরা ভারতীয়দের অনুসরণ করতে বলেন। কিন্তু সি পি আই এবং সি পি আই. (এম)ও বলেন যে এই চিন্তা, যা সংসদীয় পদ্ধতিকে সংগ্রামের একটি অনুপূরক হিসেবে মানতে অস্বীকার করে, তা' লেনিনের শিক্ষার বিরোধী।[৩৫] লেনিন বলেছিলেন, "You say that Parliament is an instrument with the aid of which the bourgeoisie deceive the masses. But this argument should be turned against you, and it does turn against your thesis. How will you reveal the true character of Parliament if you remain outside Parliament ?....can you conceive of any other institution

in which all classes are as interested as they are in Parliament ? If all classes are drawn into the Parliamentary struggle, it is because the class interests and conflicts are reflected in Parliament. If it were possible everywhere and immediately to bring about, let us say, a decisive general strike so as to overthrow capitalism at a single stroke, the revolution would have already taken place in a number of countries. But we must reckon with the facts, and Parliament is a scene of the class struggle."[৩৫]

সংসদ-ব্যবস্থায় কোনও আস্থা না থাকায় নক্‌শালপন্থীরা ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবর্তী নির্বাচন বর্জন করার আহ্বান জানালেন। ১৯৬৯-এর ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে পশ্চিমবঙ্গের ও অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের নক্‌শালপন্থী ও অন্যান্য চরমপন্থীদের নিয়ে সংগঠিত 'অল ইণ্ডিয়া কো-অর্ডিনেশন কমিটি অফ্‌ কমিউনিস্ট রেভ্যুলিশনারীস' সংস্থা একটি গোপন-সভায় মিলিত হন। এই সভায় গৃহীত প্রস্তাবে এমন একটি নূতন কমিউনিস্ট দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যে দল দৃষ্টিভঙ্গীতে মাও-বাদী হবে, কর্মসূচীতে বৈপ্লবিক শ্রেণী-সংগ্রামে লিপ্ত হবে এবং "the parties of the ruling classes including the various revisionist parties, which are feverishly trying to strengthen parliamentary' এই সব দলের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখবে না। নির্বাচন-বর্জন প্রস্তাবকে সমর্থন করে বলা হল যে, 'the hollowness of parliamentarianism and counter-revolutionary character of the revisionist and neo-revisionist parties' জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশ ও কেরালায়ও নক্‌শাল আন্দোলন দেখা দেয়, কিন্তু এই সব রাজ্যের মাও-পন্থীদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের নক্‌শালপন্থীদের কৌশলগত নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ মতানৈক্য দেখা দেয়।

অন্ধ্রপ্রদেশে ১৯৬৮ সালে প্রায় আট হাজার নক্‌শালপন্থী সি পি আই. (এম) দল থেকে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু তাঁদের বেশীর ভাগই নাগি রেড্ডির নেতৃত্ব অনুসরণ করে, অল ইন্ডিয়া কো-অর্ডিনেশন কমিটিতে যোগ দেন নি, কারণ তাঁরা এই কমিটির কৌশলগত নীতি গ্রহণ করতে পারেন নি।[৩৬] নাগি রেড্ডি ও তাঁর অনুসারীরা নির্বাচন বর্জনে খুব উৎসাহী ছিলেন না এবং তাঁরা মনে করতেন যে সংসদে কিছুটা অংশগ্রহণের ফল ভালই হবে।

১৯৬৯-এর মে মাসে শোনা যায় নাগি রেড্ডি একটি নূতন মাও-বাদী দল বা 'কেন্দ্র' স্থাপন করে প্রতিষ্ঠিত সরকারের সশস্ত্র উৎখাত করার একটি গোপন কর্মসূচী প্রণয়ন করেছেন।[৩৭] এই কর্মসূচীতে মাও-নীতি অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চলে বিপ্লব শুরু করার কথা বলা হয়, এবং আরো বলা হয় যে পরে যতই গণ-আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পেতে থাকবে ততই আন্দোলন সমতলে বিস্তৃতি লাভ করবে ও শহরগুলিকে গ্রাস করে নেবে। অবশেষে

দেশের 'প্রচলিত ধনিক ও সামন্ত শাসনের' অবসান হবে এবং বড় বড় জোতদারদের জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা হবে।

নাগি রেড্ডি এবং তাঁর দূতেরা কলকাতা-সমেত দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে সমধর্মীদের সঙ্গে এই রকম 'কেন্দ্র' স্থাপনের আলোচনা চালান। 'কেন্দ্র'টি মাও-বাদের তিনটি মূল নীতিকে গ্রহণ করবে, যথা, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-ভিত্তিক সুসংগঠিত দল গঠন, দলের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে একটি সংগঠিত সেনাবাহিনীর প্রতিষ্ঠা ও সমগ্র বিপ্লবী শ্রেণীর যৌথ নেতৃত্বে এক যুক্তফ্রন্টের রূপায়ণ। এই 'কেন্দ্র'টির অবশ্য সি পি আই (এম এল)-এর সঙ্গে কোনও যোগ থাকবে না। নাগি রেড্ডি গোষ্ঠীর আশঙ্কা ছিল যে সি পি আই (এম এল) খুব সম্ভবতঃ পাতি-বুর্জোয়া রোমান্টিক্‌ধর্মী, গোষ্ঠীতন্ত্রী আর সন্ত্রাসবাদী হয়ে উঠবেন আর তার ফলে তাঁরা মাও-বাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে চে গুয়েভারা পদ্ধতির কাছাকাছি পৌঁছে যাবেন।

অন্ধ্রের শ্রীকাকুলামের শালবন থেকে তেলেঙ্গানার বিচ্ছিন্ন বনাঞ্চল অবধি এলাকায় সশস্ত্র কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা সক্রিয় হয়ে ওঠেন। প্রোলে-টারিয়ান বিপ্লবের অঙ্গ হিসেবে তারা ধনী জমিদারদের বাড়ি আক্রমণ ও পুলিস বাহিনীর ওপর চোরা-গোপ্তা আক্রমণ চালাতে থাকেন। অন্ধ্র প্রদেশে এই কার্যকলাপ শুধু মুষ্টিমেয় জঙ্গী বিপ্লবীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না---এই রাজ্যে একাধিক নকশালপন্থী গোষ্ঠী প্রায় সমধর্মী ও সমান্তরাল কার্যসূচী নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। অন্ধ্রপ্রদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী দুটি দল, একটির নেতা নাগি রেড্ডি আর অন্যটি সি পি আই (এম এল)-এর অংশ---দুটি দলই 'আগামী বিপ্লবের' প্রস্তুতির জন্য অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহের অভিযানে নামেন।

মাওপন্থীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব শুধু অন্ধ্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এই দ্বন্দ্ব পশ্চিমবঙ্গেও ছিল। পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম এল) দলের সদস্যদের মধ্যে বিপ্লবের পদ্ধতি ও গণতন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গুরুতর মতবিরোধ হয়, চারু মজুমদারের ও অসীম চ্যাটার্জীর অনুগামীদের মধ্যে। ১৯৭১-এর নভেম্বর মাসে গোড়ার দিকে পুলিস অসীম চ্যাটার্জীকে গ্রেপ্তার করে এবং তার কিছুদিন পরেই চারু মজুমদার সি পি আই (এম এল)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বহিষ্কৃত হন। এই দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে জেলের ভেতরে প্রায়শঃই সংঘর্ষ হতে থাকে।

কলকাতায় এক মে দিবস সমাবেশে[৩৮] কানু সান্যাল ঘোষণা করে-ছিলেন যে নতুন কমিউনিস্ট দল, কমিউনিস্ট পার্টি অফ্ ইণ্ডিয়া (মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৬৯ সালের ২২শে এপ্রিল। তিনি বলেন, দেশে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ঘনিয়ে উঠেছে এবং সেই পরিস্থিতিতে এক নতুন বিপ্লবী দলের জন্মের প্রয়োজন আছে, যদিও 'শোধনবাদীরা' এই জন্মলগ্নকে পিছিয়ে দিতে চেয়েছিল। তিনি জনসাধারণকে পাতি-বুর্জোয়া 'বিপ্লব-বিপ্লব' খেলা থেকে বিরত হয়ে মাও-বাদের সার্থক প্রয়োগ হিসেবে নকশালবাড়ী আন্দোলনের সামিল হতে বলেন। তিনি শ্রীকাকুলাম[৩৯] ও অন্যত্র যে 'আগুন' ছড়িয়ে পড়েছে তাকে স্বাগত জানিয়ে ভারতের মত

'আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততন্ত্রী' দেশে সশস্ত্র কৃষিসংগ্রামের ওপর জোর দেন।

এই মে দিবস সমাবেশে একটি গৃহীত প্রস্তাবে কমিউনিস্ট চীন 'যা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মহৎ দুর্গ', তাকে রক্ষার এবং ভারতীয় বিপ্লব, 'যা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে', তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান হল। কানু সান্যাল ভারতীয় জনগণের অতীত বিপ্লবপ্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে বলেন যে এই প্রচেষ্টা যোগ্য দলের অভাবে প্রতিহত হয়ে গেছে। তিনি নকশালবাড়ী আন্দোলনের জন্য কৃষি সমাজ ও দলের নীতিবিশারদ চারু মজুমদারকে[৪০] কৃতজ্ঞতা জানান এবং 'শোধনবাদী ও নয়া-শোধনবাদী'দের প্ররোচনায় যাতে জনসাধারণ সংসদীয় গণতন্ত্রের কানাগলিতে বিপ্লবী চেতনাকে না হারিয়ে ফেলে সে সম্বন্ধে তাঁদের সতর্ক করে দেন।

সি পি আই (এম এল) তাঁদের একনিষ্ঠ সদস্যদের গ্রামে ফিরে গিয়ে মাও-এর শিক্ষা অনুযায়ী কৃষকদের মধ্যে বিপ্লব গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। বলা হয়, বিপ্লবের সাফল্যের জন্য চারটি প্রধান শত্রুকে পরাভূত করতে হবে। তারা হল, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোবিয়েৎ সমাজবাদী সাম্রাজ্যবাদ, বৃহৎ ধনিকশ্রেণী ও তার অনুসারী আমলাতন্ত্র, এবং সামন্ততান্ত্রিক জমিদারশ্রেণী। সি পি আই (এম এল) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোবিয়েৎ রাশিয়াকে একই পর্যায়ে ফেলে দাবি করেন যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আর সোবিয়েৎ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ অর্থনৈতিক সহায়তার নামে ভারতকে এক নয়া উপনিবেশে পরিণত করেছে এবং এই দুটি দেশই এই নয়া ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার মাধ্যমে শোষণ ও শাসন চালিয়ে যাচ্ছে।[৪১]

সি পি আই, সি পি আই (এম) ও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি সম্বন্ধে সি পি আই (এম এল)-এর বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য ছাড়া আর কিছু ছিল না। এই সব কটি দলই প্রতি-বিপ্লবী যেহেতু তারা সংস্কারবাদ ও সংসদীয়তার প্রশ্রয় দিয়েছে। সি পি আই (এম এল) ঘোষণা করলেন, "We must reject the hoax of parliamentarianism and accomplish the People's Democratic Revolution through revolutionary people's war by uniting the fighting masses in a revolutionary way under the leadership of the Communist Party and the working class and on the firm basis of workers' peasants' alliance

বিপ্লবকে সফল করবার জন্য সি পি আই (এম এল) গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলার কথা বললেন। এই সব মুক্তাঞ্চল থেকে কৃষি-বিপ্লবীদের গেরিলা-বাহিনী ক্রমক্রমে শহরগুলিকে ঘিরে ফেলবে এবং দখল করে নেবে। এই বিপ্লবের পথই দেখিয়েছে নকশালবাড়ী[৪২] ও তার প্রতিবেশী দার্জিলিং জেলার অঞ্চলগুলি। ১৯৬৭ সালে এখানে চরমপন্থীরা, পরে যারা সি পি আই (এম এল) নামে পরিচিত, ভূমিহীন ও স্বল্পভূমির মালিক কৃষকদের নিয়ে জমিদারদের, চা বাগিচা-মালিকদের ও সরকারী আমলাদের আক্রমণ করে, জমি, অস্ত্র এবং ধান লুঠ করে,

গণ-আদালতে 'স্থানীয় অত্যাচারী'দের শাস্তিবিধান করে এবং এই কৃষি-বিপ্লবকে সশস্ত্র প্রতিরোধ দিয়ে রক্ষা করে।

সি.পি.আই. (এম.এল.)-দের ব্যাখ্যায় ভারত একটি নয়া উপনিবেশ এবং এখানে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা ও দেশী সামন্তপ্রভুরা স্বাধীনতার মুখোশের আড়ালে পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে রেখেছে। এই অবস্থায় ভারত সরকার জনসাধারণের কোন উপকার বা সত্যিকারের কল্যাণকর কোনও ব্যবস্থা করতে অক্ষম। অন্য দিকে, এই সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ত-তন্ত্রীদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে তারা দেশের অর্থনৈতিক সংকট আরও ঘনীভূত করে তুলবে এবং জনসাধারণের থেকে দূরে চলে যাবে। তাই এই রকমের সরকার ধ্বংস করতে হবে ভোটের পদ্ধতি দিয়ে নয়, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে।[৪৩]

সি.পি আই (এম এল) ভোটাধিকারকে জনতাকে প্রবঞ্চনা করার একটা কৌশল বলে মনে করতেন।[৪৪] আর তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, কোন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্ম হয় বলপ্রয়োগের মাধ্যমে। তা ছাড়া তাঁরা ভারতীয় আধুনিক পরিস্থিতিকে জারের রাশিয়া অথবা প্রাক্‌বিপ্লব চীনের পরিস্থিতির চেয়ে কোন অংশে ভাল বলে মনে করেন নি। সংসদীয় গণতন্ত্র, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক মৌল অধিকারের অস্তিত্বের ফলে ভারতের অবস্থা যে জার-শাসিত রাশিয়া অথবা সামন্ত-যুদ্ধবাজদের চীনের থেকে পৃথক্ এ কথা তাঁরা স্বীকার করেন নি। কিন্তু এক চরমপন্থী পথ বেছে নেওয়ার ফলে সি পি আই. (এম.এল) সাধারণ জন-জীবন বা ভারতীয় মূল রাজনৈতিক প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

নির্দেশিকা

রামমোহন, মেকলে, ডিরোজিও ও ইংরেজী শিক্ষা

১ Jawaharlal Nehru, *Independence and After*, 1949, pp. 276 77
২ Rabindranath Tagore, "A Retrospect", *Indian Writing*, August 1941, pp. 187-88
৩ Rabindranath Tagore, *Towards Universal Man*, 1961, p. 359
৪ Mazumdar, *Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century*, 1960, p. 32
৫ G. D. Bearce, *British Attitudes Towards India*, 1748-1858, Oxford, 1961, p. 161
৬ Jawaharlal Nehru, *The Discovery of India*, 1946, pp. 20-21
৭ Jawaharlal Nehru, *The Unity of India*, 1944, p. 176
৮ Francis Bradley-Brit, *Poems of Henry Derozio*, Oxford 1923, pp. xlvxlvii
৯ Francis Bradley-Brit. *op.cit*, p. 2.
১০ *The English Works of Raja Rammohan Roy*, 1906, pp 471-72
১১ *Ibid.*, p. 474
১২ *The Works of Sir William Jones*, V, pp. 165-66
১৩ B N. Bandopadhyaya. *Ishwar Chandra Vidyasagar*, Calcutta, 1943, pp. 131-36
১৪ Thomas Babington Macaulay, *Prose and Poetry*, selected by G. M. Young, 1952, pp. 121-29
১৫ Earl of Ronaldshay, *The Heart of Aryavarta*, p. 45
১৬ *Speeches of the Honourable G K. Gokhale*, pp 258-59
১৭ B. N. Dhar, *Young Men and Social Service*, pp 33-34
১৮ *Speeches and Writings of Sir Dinshaw Edulji Wacha*, pp. 135 36
১৯ *Reminiscences, Speeches and Writings of Sir Gooroo Das Banerjee*, Part II, p. 208
২০ Lajpat Rai, "The Problem of National Education", *The Modern Review*, January 1919, p 6-8
২১ Ibid.

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় নবজাগরণ

১ Romain Rolland, *The Life of Vivekananda*, p. 40
২ *The Complete Works of Swami Vivekananda*, Almora. Vol. IV, p. 307

৩ Sister Nivedita, *The Master as I Saw Him*, 3rd ed, p. 145
৪ *The Complete Works of Swami Vivekananda*, Almora, Vol, IV, pp. 408-10
৫ Ibid , Vol III, pp. 276-77
৬ *Keshub Chunder Sen's Lectures in India*, London, 1901, pp 322-26
৭ *The Complete Works of Swami Vivekananda*, Almora, Vol IV, pp 151-52
৮ Ibid , Vol II, p 325
৯ *The Complete Works of Swami Vivekananda*, Almora, Vol III, p 460
১০ Ibid
১১ *The Complete Works of Swami Vivekananda*, Almora, Vol IV, pp 408-13
১২ Ibid,
১৩ Vivekananda, *From Colombo to Almora (Seventeen Lectures)*, 1897, p 126
১৪ Ibid , p 123
১৫ *Selections from Swami Vivekananda*, Almora, 2nd ed , 1946, p 129
১৬ Ibid , p 130
১৭ Ibid , pp 474-75
১৮ *History of the Ramakrishna Math and Mission*, p 136
১৯ *Speeches and Writings of Swami Vivekananda*, p 645
২০ D S Sarma, *The Renaissance of Hinduism*, p 284
২১ Romain Rolland, *Life of Vivekananda*, p 72
২২ Ibid , pp 165-66
২৩ Ibid , p 126
২৪ *Epistles of Swami Vivekananda*, Second Series, p 23
২৫ প্রমথ চৌধুরী, বীরবলের হালখাতা, পৃ ১৮
২৬ *Speeches and Writings of Swami Vivekananda*, p. 604
২৭ বিবেকানন্দ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পৃ. ৬
২৮ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৭
২৯ বিবেকানন্দ, ভাববার কথা, পৃ: ২০-২২
৩০ Romain Rolland, op cit , p 74
৩১ Vivekananda, *India and Her Problems*, Almora, 4th ed , 1946, p. 26
৩২ Charles H Heimsath, *Indian Nationalism and Hindu Social Reform*, 1964, p. 335
৩৩ ভারতে বিবেকানন্দ, পৃ: ৬৩১

৩৪ *Speeches and Writings of Swami Vivekananda*, p. 194
৩৫ Ibid , pp 592-93, 640
৩৬ Vivekananda, *From Colombo to Almora . Lectures*, p. 8
৩৭ বিবেকানন্দ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পৃ ২০
৩৮ Vivekananda *From Colombo to Almora . Lectures*, pp 8-9
৩৯ বিবেকানন্দ. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পৃ ২১–২৪
৪০ Letter dated 27th September 1894 (*Epistles of Swami Vivekananda*, Second Series), p. 20
৪১ ভারতে বিবেকানন্দ, পৃ ১২৯-১৩০
৪২ *Speeches and Writings of Swami Vivekananda*, pp. 75-76. 606-7
৪৩ Arthur Schopenhauer, *The World as Will and Idea*, Vol I (translated from German by R B Haldane and J Kemp), London. 1907, p 458
৪৪ Ibid , pp 460-61
৪৫ Vivekananda. *From Colombo to Almora Lectures*, p 10
৪৬ ভারতে বিবেকানন্দ, পৃ ২২৮, ৩২৭
৪৭ *Speeches and Writings of Swami Vivekananda*, p. 600
৪৮ *The Complete Works of Swami Vivekananda* Vol IV, pp. 307-8

মানবিক ধর্ম ও রাজনৈতিক সক্রিয়তা

১ Rabindranath Tagore, *Gitanjali*, p. 9
২ Ibid , p 68
৩ Lajpat Rai, "National Education", in *The Modern Review*, April 1919, p 333
৪ Ibid , pp 333-34
৫ Har Dayal, "The Wealth of the Nation", in *the Modern Review*, July 1912, p 48
৬ Ibid
৭ Har Dayal, "India and the World Movement", in *The Modern Review*, February 1913, p 187
৮ Har Dayal, "The Wealth of the Nation," in *The Modern Review*, July 1912
৯ "Mr. Har Dayal's Rejoinder" *The Modern Review*, December 1912, p 648
১০ Ibid
১১ *The Indian Annual Register*, 1942, Vol II, p. 283
১২ Jawaharlal Nehru, *An Autobiography*, p. 377

১৩ *Conversations with Mr. Nehru*, 1956, p. 144
১৪ Jawaharlal Nehru, *The Discovery of India*, 1946, pp. 114-15
১৫ *Netaji Speaks to the Nation*, pp. 44-47
১৬ Jawaharlal Nehru, *Speeches* (1949-53), p 419

তিলক ও চরমপন্থী আন্দোলন

১ Henri Nevinson, *The New Spirit in India*, pp. 257-58
২ T. L. Shay. *Legacy of Lokamanya Tilak*, Bombay, 1956, p. 215
৩ B. C. Pal. *The Spirit of Indian Nationalism*, p. 46
৪ B. C. Pal. *Nationality and Empire*. 1956, p 34

চরমপন্থী আন্দোলন ও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ

১ Vivekananda, *Lectures from Colombo to Almora*. p 8
২ Letter dated 27 September 1894 (*Epistles of Swami Vivekananda*, Second Series, p. 20)
৩ Aurobindo Ghose, *The Ideal of the Karmayogin*. pp. 3-4. *Uttarpara Speech*. pp 7, 17
৪ D. V. Tahmankar. *Lokmanya Tilak*. London 1956, pp. 77-78
৫ Ibid. pp 60-63
৬ নবীনচন্দ্র সেন, রৈবতক
৭ Bankim Chatterji, *Dharmatattva*, ed B N Bandopadhyaya and S. K Das, pp 20-21
৮ Bankim Chatterji. *Krishnacharitra*, ed B N Bandopadhaya and S K Das, p. 283
৯ Bankim Chatterji, *Anandamath* (The Abbey of Bliss). pp. 31-37
১০ বঙ্কিম, চট্টোপাধ্যায়. কমলাকান্তের দপ্তর
১১ B. C. Pal. *The Spirit of Indian Nationalism*, pp. 36-38
১২ *Bankim-Tilak-Dayananda*. pp. 13-14; *Aurobindo Ghose's Letters to his Wife*, p. 10
১৩ Aurobindo Ghose, *Uttarpara Speech*, p 7
১৪ B. C. Pal, *The Soul of India*, pp. 191-99
১৫ B. C. Pal, *The Spirit of Indian Nationalism*, p. 11
১৬ Ibid , pp. 37- 38
১৭ Ibid., pp 39- 40
১৮ B. C. Pal, *Swadeshi and Swaraj*, pp. 85-86
১৯ B. C. Pal, *The Soul of India*, p. 199

অরবিন্দ ঘোষ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ

১ Aurobindo Ghose, *The Present Situation in India*, pp. 9-10
২ Ibid., pp. 15-20
৩ Aurobindo Ghose. *Uttarpara Speech*, pp 12, 16
৪ Aurobindo Ghose, *Speeches*, pp. 7-8
৫ Ibid., p. 55
৬ Aurobindo Ghose, *The Ideal of the Karmayogin*, p 4
৭ Ibid , p 13
৮ Ibid., p. 39
৯ Aurobindo Ghose, *The Present Situation in India*, p 5
১০ Aurobindo Ghose, *The Ideal of the Karmayogin*, pp 32-34
১১ Earl of Ronaldshay, *The Heart of Aryavarta*, p. 5
১২ বিপিন পাল, **আলোচনা**, কলিকাতা, ১৩১৯ সাল, প ২১৩-২১৪
১৩ Aurobindo Ghose, *Bankim-Tilak-Dayananda*, p. 21
১৪ Aurobindo Ghose, *The Ideal of the Karmayogin*, p 7
১৫ Ibid , pp 6-7
১৬ Ibid., pp. 5-8
১৭ Ibid.
১৮ Ibid , pp 48-49
১৯ Ibid.
২০ Ibid., pp 11, 19-20
২১ Ibid , p 4. Aurobindo Ghose, *Uttarpara Speech* pp 7, 16-17
২২ Joseph Mazzini, *The Duties of Man and Other Essays* (Everyman's Edition), London, 1929, p 121
২৩ Guiseppe Mazzini · *Selected Writings*, Ed N. Gangulee, pp. 109-10
২৪ Aurobindo Ghose, *Uttarpara Speech*, pp 7, 16-17
২৫ Aurobindo Ghose, *Speeches*, p 140
২৬ Ibid. pp 33-34

বিপ্লবীদের পথ

১ *Report of the Sedition Committee*, para 1
২ Ibid., Para 2
৩ Ibid., Para 3
৪ From *The Pioneer Mail*, 8 July 1897, "Current Comments"
৫ See *The Pioneer Mail*, 8 July 1897
৬ *Report of the Sedition Committee*, Para 3

৭ A few extracts from the *Kal* were given in *The Pioneer Mail* of 7 October 1904

৮ *The Pioneer Mail*, 7 October 1904. "Killing no Murder"

৯ "Some Notable Views of the Month", *The Pioneer Mail*; "India and Japan", *The Indian World*, July 1905, p. 417

১০ This extract, which was cited in the Swaraj sedition case, is taken from *The Bengalee* of 6 August 1908

১১ Quoted in Valentine Chirol, *Indian Unrest*, p 16

১২ See the "dying speech" of Dhingra, who assassinated Sir Curzon Wyllie (Appendix III of W S Blunt's *My Diaries*)

১৩ *Report of the Sedition Committee*, Para 30

১৪ Ibid , footnote of para 22

১৫ *The Pioneer Mail*, 26 June 1908, "The Anarchist Trial"

১৬ *Report of the Sedition Committee* Para 9

১৭ Ibid , para 7

১৮ Ibid , p 44

১৯ Ibid , para 27

২০ Ibid

২১ Animananda, *The Blade*, pp 170-71

২২ পাকডাশা, "অগ্নিদিনের কথা" প ১৮

২৩ Ibid , p 51

২৪ *Report of the Sedition Committee*, para 29

২৫ Dhananjay Keer, *Savarkar And His Times*, p. 55

২৬ Ibid , p 56

২৭ Sir Valentine Chirol, *India Old And New*, p 146

২৮ Wilfrid Blunt, *My Diaries*, II p 288

২৯ Wilfrid Blunt, op cit , p 276

৩০ *The Modern Review*, XI, p 562

৩১ *The Modern Review*, VI, p 83

৩২ This extract is taken from the report of the speech of Sir Henry Adamson (*The Proceedings of the Council of the Governor-General of India, April* 1908 *to March* 1909, p 10)

৩৩ Ibid., p 11

৩৪ স্বামী বিবেকানন্দ, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পৃ, ২৪

৩৫ Upendranath Banerjee, *Memoirs of a Revolutionary*, p. 11

৩৬ *Report of the Sedition Committee*, para 27

৩৭ Ibid , para 30

৩৮ *The Song of God:* Bhagavadgita, tr. Swami Prabhavananda and Christopher Isherwood (London, 1948), p. 43

৩৯ N. C. Sen Gupta, *The Abbey of Bliss*, p. 34. (The *Anandamath* was translated into English by N C Sen Gupta as *The Abbey of Bliss*)
৪০ Ibid., p. 98
৪১ পাকড়াশী, "অগ্নিদিনের কথা" পৃ ৬২, ১০২
৪২ Ibid., pp 101-3
৪৩ See report of conversation between Khaparde who supported the terrorists and Blunt (W S. Blunt, *My Diaries*, pp 677-78). পাকড়াশী, অগ্নিদিনের কথা, পৃ ৫৫
৪৪ Randhir Singh, *The Ghadar Heroes*, Bombay, 1945. p 819
৪৫ R C. Mazumdar, *The History of the Freedom Movement in India*, Calcutta, 1963, Vol II, p 394
৪৬ Ibid , pp 404-5
৪৭ *M. N Roy's Memoirs*, 1964 pp 289-90
৪৮ Ibid
৪৯ Mahendra Pratap, *My Life Story of Fifty-five Years*, Delhi, 1947

গান্ধীজী ও আইন অমান্য আন্দোলন

১ D G. Tendulkar. *Mahatma* 1960. Vol, I, p 240
২ Ibid , p. 242
৩ D G Tendulkar. *Mahatma* 1961, Vol II, p 9
৪ Ibid , p. 101
৫ *Congress Presidential Addresses, Second Series*, p 867
৬ Ibid , p. 794
৭ *Indian Quarterly Register, 1928*, Vol. II, p 45
৮ D G. Tendulkar, *Mahatma*, 1961, Vol II, p 331
৯ *Report of the Forty-Second Indian National Congress*, Madras, 1927, pp 20-21
১০ A. F. Brockway, *The Indian Crisis*, London, 1930, p 114
১১ *The Indian Quarterly Register*. 1928, Vol II, p 35
১২ Jawaharlal Nehru, *An Autobiography*, 1942. p 418
১৩ *Selected Speeches of Subhas Chandra Bose*. 1962, pp 41-44
১৪ *The Indian Quarterly Register, 1928*, Vol. II, p 34
১৫ *Report of the Forty-Fourth Annual Session of the Congress*. 1929, p 88
১৬ *Debates on Indian Affairs House of Commons*, 1917-18, p. 445

১৭ *India in 1929-30*, Appendix II, pp. 466-68
১৮ Frank Moraes, *Jawaharlal Nehru*, 1959, p. 180
১৯ *Struggle for Freedom*, ed R C Majumdar, Bombay, 1969. pp. 512-20
২০ P. Sitaramayya, *The History of the Indian National Congress*, Vol I, p. 565
২১ Samuel Hoare, *Speeches, 1931-35*, pp. 132-35
২২ *Parliamentary Debates, House of Commons*, Vol 297 (1935). cols 1650-55
২৩ Ibid., Vol. 302 (1935), cols 1824-25
২৪ Lord Linlithgow, *Speeches and Statements*, 1936-43, pp. 80-81

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন

১ *Parliamentary Papers, X, India and the War* (1939-40). Cmd. 6219
২ Jawaharlal Nehru, *The Discovery of India*, pp. 374-75
৩ *Lord Privy Seal's Mission*, Cmd. 6359 (1942), pp. 4-5
৪ D. G. Tendulkar, *Mahatma*, 1962, Vol. VI, p. 76
৫ Maulana Azad, *India Wins Freedom*, Calcutta, 1967, p 65
৬ Ibid., p. 67
৭ Ibid., p. 68
৮ Ibid.
৯ *Struggle for Freedom*, ed R C. Majumdar Bombay, 1969. p. 655
১০ Ibid
১১ Jawaharlal Nehru, *The Discovery of India*, 2nd ed., London, 1947, p. 418
১২ P. Sitaramayya, *The History of the Indian National Congress*, Vol. II, pp. 373-74
১৩ Maulana Azad, *India Wins Freedom*, 1967, pp. 164-69
১৪ *India, Statement by Cabinet Mission and His Excellency the Viceroy*, Cmd. 6821 (1936)
১৫ P. Chakravorty and C. Bhattacharyya, *Congress in Evolution*, Calcutta, 1940
১৬ M. Gwyer and A. Appadorai, *Speeches and Documents on the Indian Constitution* London, 1957, pp. 577-84
১৭ *Parliamentary Debates, House of Commons*, Vol. 433 (1947), cols 1395-97
১৮ *House of Commons Debate, 1946-47*, Vol. 434, cols 673-74

১৯ *Parliamentary Debates, House of Commons*, Vol. 434 (1946-47), cols 497-508
২০ D. G. Tendulkar, *Mahatma*, 1963, Vol. VIII, p 44
২১ Ibid., pp. 44-45
২২ Leonard Mosley, *The Last Days of British Raj*, p. 12
২৩ *Indian Policy Statement*, Cmd. 7136 (1947)
২৪ *Parliamentary Debates, House of Commons*, Vol. 439 (1947),
২৫ Jawaharlal Nehru, *Independence and After*, pp. 3-4

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ ফৌজ

১ D. K. Roy, *The Subhas I Knew*, pp. 170-71
২ *Important Speeches and Writings of Subhas Bose*, ed. J. S. Bright, Lahore, 1947, p. 65
৩ Subhas Bose, *The Indian Struggle, 1935-42*, Appendix 1, p. 57
৪ *Important Speeches and Writings of Subhas Bose*. Lahore. 1947, p. 84
৫ D. K. Roy. *The Subhas I Knew*, p. 79
৬ Subhas Bose, *Through Congress Eyes*, Allahabad, 1938, p. 144
৭ *Important Speeches and Writings of Subhas Bose*, pp 57-58
৮ *Netaji Speaks to the Nation*, Lahore, 1946. pp 44-47
৯ D. G. Tendulkar, *Mahatma*, Vol. 8, p. 56
১০ Jawaharlal Nehru. *A Bunch of Old letters*. 2nd ed., 1960, p 329
১১ Ibid., p. 356
১২ Ibid., p. 380
১৩ *Selected Speeches of Subhas Chandra Bose*, ed S. A. Ayer, 1962, p. 204
১৪ Ibid., p. 168
১৫ Ibid., pp 155-56
১৬ Ibid.
১৭ Ibid., pp. 182-83
১৮ *Netaji Speaks to the Nation*, Lahore, 1946, p. 318
১৯ *Selected Speeches of Subhas Chandra Bose*, pp. 170-71
২০ Ibid.
২১ Ibid., pp. 154-55

মৌলানা আজাদ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ

১ Jawaharlal Nehru, *The Discovery of India*, 2nd ed., 1947, p.293
২ Maulana Azad. *India Wins Freedom*. Orient Longmans, June 1967, p 5
৩ Ibid., p.4

৪ Ibid.
৫ Ibid., p 6
৬ Ibid., p 164
৭ Ibid.
৮ Ibid., p. 166
৯ Ibid., p 167
১০ Michael Brecher, *Nehru : A Political Biography*, 1961, pp 144-45
১১ Leonard Mosley, *Last Days of the British Raj*, p 148
১২ Azad, *India Wins Freedom*, Calcutta, 1967, p 167
১৩ Lumley, *The Transfer of Power in India*, p. 161
১৪ Azad, *India Wins Freedom*, p 168
১৫ Ibid., p 160
১৬ Norman D Palmer, *The Indian Political System*, 1961, p 86

জিন্না, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়

১ *Speeches and Writings of Mr. Jinnah*, ed. Jamil-ud-din Ahmed, Vol 1, p 138
২ Edwin Montagu, *An Indian Diary*, London, 1930, p 57
৩ *Speeches and Writings of Mr Jinnah*, ed Jamil-ud-din Vol 1, pp 155-56
৪ Ibid., pp 160-61
৫ Ibid., pp 174-80
৬ Ibid
৭ Gokhale and S P Sinha said this to Lord Hardinge (*My Indian Years* : The Reminiscences of Lord Hardinge p 115) and Lady Minto (Lady Minto, *India : Minto and Morley*, p 298), respectively
৮ F K Khan Durrani *The Meaning of Pakistan*, p. 146
৯ *The Dawn*, Karachi, 9 January 1956 (quoted in *Birth of a Nation : The Story of How East Pakistan Turned into Bangladesh*, Calcutta, 1971, p 21)
১০ *Birth of a Nation*, p 24
১১ "*East Pakistan : Even the Skies Weep*", *a Report in Time*, 25 October 1971, p 17
১২ The text of the broadcast was published in *Socialist India*, 4 December 1971
১৩ Statement in Parliament on 6 December 1971, *Socialist India*, 11 December 1971, p 17

অর্থনৈতিক পটভূমিকা

Joan Beauchamp, *British Imperialism in India*, 1929, p 16

Vera Anstey, *The Economic Development of India*. London, 1929, p 210

Report of the Indian Industrial Commission, para 107

Ibid., para 108

The Reminiscences of Lord Hardinge of Penshurst, pp. 3-4

Speech of V. G. Kale in the *Report of the Twenty-Ninth Indian National Congress*, p 94

Speeches of A. C. Mazumdar and V V J Pantulu in the *Report of the Twenty-Seventh Indian National Congress* pp 81-82 , and the views of R C Dutt in *The Swadeshi Movement . A Symposium* (Published by G A Natesan. Madras), 2nd ed . p. 92

Speeches of G Subramanian Iyer and of N K Ramaswami Aiyar in the *Report of the Seventeenth Indian National Congress*, pp 122-25 132 and a speech of Dadabhai in the *Proceedings of the Council of the Governor General of India April 1910 to March 1911*, p 649

৯ *Montagu-Chelmsford Report*, p 267

১০ Ibid , para 342

Report of the Indian Fiscal Commission (1921-

১২ S B Jathar and K G Jathar *Indian Economics*. London 1947, p 189

১৩ Wadia and Merchant, *Our Economic Problem*, 1943

১৪ L. C Jain *Indian Economy during the War* 1949, p 48

১৫ *Towards A Self-Reliant Economy . India* *1961-66*, Publications Division Government of India pp. 62-63

১৬ D R Gadgil. *The Industrial Evolution of India in R… Times*, 1944, p 148

১৭ Margaret Mead, *The Indian Peasant* 1931, pp

১৮ D. H Buchanan, *The Development of Capitalistic Enterprise in India*, 1934, p 416

১৯ Ramsay MacDonald *The Awakening of India* 1910, p. 179

২০ Lenin. *The National Liberation Movement in the East* pp 14 15

২১ S. D Saklatwala, *History of the Mill Owners' Association 1875-1930*

২২ *Report of the Sixth Session of the All India Trade Union Congress*, 1926, p. 8
২৩ B. P. Wadia, *Labour in Madras*, 1921, pp. xvi-xvii
২৪ V. B. Karnik, *Indian Trade Unions : A Survey*, 1960, p. 50
২৫ *Indian Annual Register*, 1923, Vol. I, pp. 843-44
২৬ *Indian Annual Register*, 1925, Vol. I
২৭ R. P. Dutt, *India Today*, London, 1940, p. 383
২৮ Ibid., p. 386
২৯ *The Indian Labour Year Book*, 1950-51, p. 175
৩০ Ibid.
৩১ K. B. Panikkar, *An Outline of the History of the AITUC*, 1959, p. 15
৩২ *People's Democracy*, 24 May 1970; see speeches at the rally organised by CITU at Calcutta and reported in the *Statesman*, 1 June 1970.
৩৩ *New Age*, Central Organ of the CPI, 31 May 1970
৩৪ B. C. Pal, *Memories of My Life and Times*, p. 288
৩৫ On 26 September 1888, *The Pioneer Mail*, which voiced the opinions of an important section of Anglo-Indian officials, very favourably reviewed this book
৩৬ The Raja of Bhinga, *Democracy Not Suited to India*, p. 26
৩৭ Ibid., p. 102
৩৮ *Report of the Fourth Indian National Congress* pp. 24-25
৩৯ R. C. Saunders, *A Glance at India's Aristocracy : Or should there be a House of Lords for India ?* pp. 4-10
৪০ For Saunders' views see *The Journal of the East India Association*, 1889, pp. 75-77
৪১ See the Raja's article "The Decay of the Landed Aristocracy in India", *The Nineteenth Century*, May 1892, p. 835
৪২ Syed Ahmed Khan, *The Present State of Indian Politics*, p. 59
৪৩ Ibid. p. 4
৪৪ *The Indian Mirror*, 17 January, 1888 ; *The Hindoo Patriot*, 23 January 1888
৪৫ *The Indian Spectator*, 22 January 1888
৪৬ *The Tribune*, 25 January 1888
৪৭ Lady Minto, *India : Minto and Morley*, p. 31
৪৮ Letter to Morley dated 27 February 1907 (ibid., p. 104)
৪৯ Ibid., p. 29
৫০ *Evolution of India and Pakistan.1858-1947. Select Documents*, ed. C. H. Philips, p. 76

৫১ *Circular from the Government of India to Local Governments and Administrations dated 24 August 1907* (Cd. 3710). paras 5-6

৫২ Ibid., paras 4-5

৫৩ *Proposals of the Government of India dated 1 October 1908*, paras 4-6

৫৪ *Dispatch of the Secretary of State dated 27 November 1908*, para 4

৫৫ *Congress Presidential Addresses, First Series*, p. 808

৫৬ *Proposals of the Government of India, 1 October 1908*, para 20

৫৭ *Report of the Twenty-Sixth Indian National Congress*, p. 24

৫৮ Speech of Pandit Malaviya of 24 January 1911 (*The Proceedings of the Council of the Governor-General of India, April 1910 to March 1911*, p. 136)
Gokhale, however, was not opposed to the separate representation of landlords (Ibid., p. 146)

৫৯ B. N. Dhar, "The Reform Scheme and the Councils Regulation", *The Indian World*, April-May 1911, p. 266

৬০ *Report of the Twenty-Sixth Indian National Congress*, p. 24

৬১ E. S. Montagu, *An Indian Diary*, 1930, pp. 79-80

৬২ Mohit Sen, "Gandhism after Freedom," in *The Mahatma : A Marxist Symposium*, 1969, p. 65

৬৩ *The Statesman*, 31 October, 1969

৬৪ Ibid.

দাদাভাই নৌরজী, বিপিন পাল ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তার পূর্বাভাষ

১ R. P. Masani, *Dadabhai Naoroji*, p. 398

২ Dadabhai Naoroji, *Poverty and Un-British Rule In India*. London, 1901, p. 203

৩ Ibid.

৪ *Essays, Speeches, Addresses and Writings of the Hon'ble Dadabhai Naoroji*, 1887, p. 135-36

৫ Romesh Dutt, *The Economic History of India Under Early British Rule* (1759-1837), 1963, p. xxiv

৬ Ibid., pp. xxv-vi

৭ Ibid., p. xxix

৮ *Speeches of the Honourable Mr. G. K. Gokhale*, 1st ed., p. 499

৯ Ibid., p. 501

১০ K. T. Telang, *Select Writings and Speeches*, ed. V. V. Thakur, pp. 153-56
১১ J. S. Mill, *Principles of Political Economy* (people's Edition, London, 1886), pp. 570-71
১২ K T Telang, *Select Writings and Speeches*, pp. 147-49
১৩ M. G. Ranade, *Essays on Indian Economics*, pp. 19-20
১৪ *Report of the Seventeenth Indian National Congress*, 1901, p 22
১৫ *Report of the Eighteenth Indian National Congress*, 1902, pp 13-14
১৬ Ibid
১৭ *Report of the Twenty-First Indian National Congress*, 1905, pp 8-15
১৮ N. C Sen Gupta, "The Boycott Movement". *The Indian Review*, May 1909. p 351
১৯ *Report of the Twenty-First Indian National Congress*, p 70
২০ *Report of the Twenty-Second Indian National Congress*, p, 81
২১ *Report of the Thirtieth Indian National Congress*, p 112
২২ Annie Besant, *Future Socialism*, p 22
২৩ Lajpat Rai, *The Political Future of India*, p 202
২৪ Lajpat Rai, *Ideals of Non-Co-operation*, p 32
২৫ Lajpat Rai. *India's Will To Freedom* Madras, 1921, pp 23-24, 29-30
২৬ B. C Pal, *The World Situation and Ourselves*, pp. 61-64
২৭ Lajpat Rai, *India's Will To Freedom*, pp. 36-37

নেহেরু, সুভাষচন্দ্র ও সমাজতন্ত্র

১ *Important Speeches of Jawaharlal Nehru*, pp 4-14
২ Jawaharlal Nehru, *An Autobiography*, London, 1955, pp.56-63
৩ *Nehru on Socialism*, pp 50-51
৪ *Indian National Congress*, 1920-23, p. 34
৫ *Report of the Thirty-Seventh Indian National Congress*, 1922, p 3
৬ *Report of the Forty-Third Session of the Indian National Congress*, Calcutta, 1928, p. 148
৭ Jawaharlal Nehru, *India and the World*, p. 27
৮ Jawaharlal Nehru, *Glimpses of World History*, Vol. II, pp. 851-52
৯ *Important Speeches of Jawaharlal Nehru*, pp. 4-14

১০ Jawaharlal Nehru, *A Bunch of Old Letters*, end ed., 1960, pp. 188-89
১১ Jawaharlal Nehru, *India and the World*, 1936, pp. 27-28
১২ *Selected Speeches of Subhas Chandra Bose*, 1962. p. 50
১৩ Ibid., p. 69
১৪ Subhas Bose, *The Indian Struggle*, London, 1935, pp. 345-47
১৫ Jawaharlal Nehru, *The Unity of India*, 1944, pp 397
১৬ *Selected Speeches of Subhas Chandra Bose*, 1962, p. 91
১৭ Subhas Bose, *The Indian Struggle*, p 344
১৮ Jawaharlal Nehru, *The Discovery of India*, 1941. p. 488
১৯ Jawaharlal Nehru, *An Autobiography*, 1936, pp. 551-52
২০ Ibid., p. 591
২১ *The Hindu*, 29 November 1954 (Michael Brecher, *Nehru - A Political Biography*, 1961, paper-back edition, p. 234)

মানবেন্দ্রনাথ ও কমিউনিজম

১ *M N Roy's Memoirs*, pp. 219-20
২ "Lenin-Roy Controversy on Revolution Strategy" *New Age*, 22 February 1970
৩ M N. Roy, *India in Transition* p. 205
৪ M. N. Roy, *Memoirs*, 1964, p. 543
৫ Ibid , p 544
৬ *Tribune*, 4 November 1922
৭ Overstreet & Windmiller, *Communism in India*, 1960, p 56
৮ Ibid , p 55
৯ M. N Roy & Ellen Roy, *One Year of Non-Cooperation* 1923, pp. 40-41
১০ P. C. Roy, *Life and Times of C R Das*, pp 267-68
১১ Overstreet & Windmiller, *Communism in India*, 1960. p 65
১২ M. N. Roy & Ellen Roy, op. cit , pp 56-60
১৩ M. N. Roy, "Anti-Imperialist Struggle in India", *The Communist International*, No. 6 (1924), pp 92-93
১৪ Ibid., pp 70-71
১৫ *Indian Annual Register*, 1925, *II*, p 367
১৬ Ibid., p 371
১৭ Overstreet & Windmiller, op. cit , p. 79
১৮ M. N. Roy, *The Aftermath of Non-Cooperation*, 1926, p. 13
১৯ Ibid., p. 14

২০ M. N. Roy, *The Future of Indian Politics*, pp. 98, 117
২১ Ibid., p. 90
২২ Ibid., p. 95
২৩ Ibid., p. 114
২৪ Ibid., p. 85
২৫ M. N. Roy, *Fragments of a Prisoner's Diary*, Vol. II, p. 114
২৬ M. N. Roy, *The Future of Indian Politics*, p. 17
২৭ R. Palme Dutt, *Modern India*, London, 1927, p. 129
২৮ Ibid., p. 148
২৯ Ibid., pp. 17-18
৩০ Spratt, *Blowing Up India*, p 29
৩১ Overstreet & Windmiller, op. cit., p. 89
৩২ Jawaharlal Nehru, *An Autobiography*, 1942, p. 161
৩৩ Soumyendranath Tagore, *Historical Development of the Communist Movement in India*, 1944, pp. 10-11 (Quoted in Overstreet & Windmiller, op cit., pp 96-7)
৩৪ Overstreet & Windmiller, op. cit., p. 92
৩৫ Ibid., p. 102
৩৬ Ibid., pp. 104-5
৩৭ R. Palme Dutt, "Notes of the Month", in *Labour Monthly*, *June 1928*, p. 335
৩৮ Overstreet & Windmiller, op cit., pp. 119-20
৩৯ Philip Spratt, *Blowing Up India*, 1955, p 42
৪০ M. N. Roy, *Our Difference*, Calcutta, 1938, p. 25
৪১ Ibid., p. ii
৪২ M. N. Roy, *I Accuse*, 1932, pp. 26-29
৪৩ Ibid.
৪৪ Ibid.
৪৫ M. N. Roy, *Scientific Politics*, p 189
৪৬ M. N. Roy, *The Alternative*, Bombay, 1940, pp. 16-17
৪৭ Ibid., pp. 78-79
৪৮ M. N. Roy, *War and Revolution*, 1942, p. 20
৪৯ M. N. Roy, *Jawaharlal Nehru*, Delhi, 1945, pp. 28-29
৫০ M. N. Roy, *War and Revolution*, p 101
৫১ Ibid., p. 96
৫২ M. N. Roy, *The Communist International*, 1943, p. 4
৫৩ M. N. Roy, *National Government or People's Government*, 1946, pp. vii-x
৫৪ M. N. Roy, *Nationalism and Democracy*, 1942, p. 5
৫৫ M. N Roy, *Scientific Politics*, 1947, pp. v-vii

৫৬ Jayaprakash Narayan, *Socialism, Sarvodaya And Democracy*, 1964, p. 40

৫৭ M. N. Roy, *Freedom or Fascism*, December 1942, pp. 103-4

৫৮ Ibid., p. 105

৫৯ M. N. Roy, *National Government or People's Government*, 1943, p. 49

৬০ M. N. Roy, *The Problem of Freedom*, pp 39-46

৬১ Welles Hangen, *After Nehru, Who?*. London, 1963, p. 137

৬২ M. N. Roy, *The Communist International*. p. 60

৬৩ M. N. Roy, *War and Revolution*, 1942, p. 13

৬৪ M. N. Roy, *The Problem of Freedom*, pp 22-27

৬৫ M N. Roy, *From Savagery to Civilization*, Calcutta, 1940, p.15

৬৬ M. N. Roy, *India's Message (Fragments of a Prisoner's Diary*, II), Calcutta, 1950, pp 190-218

৬৭ Ibid

৬৮ Ibid

৬৯ M. N. Roy, *Scientific Politics*, 2nd Edition, 1947, p. viii

৭০ Jayaprakash Narayan, *Socialism, Sarvodaya And Democracy*, ed, Bimla Prasad. 1964

৭১ M. R. Masani, *Congress Misrule and the Swatantra Alternative*, 1966, pp. 159-69

৭২ E. M. S Namboodiripad, *The Mahatma and the Ism*, 2nd ed. 1959, Introduction, p. vii

৭৩ M. N. Roy. *New Humanism : A Manifesto*, Calcutta, 1947, pp 34-47

৭৪ Ibid.

৭৫ Ibid

৭৬ M. N. Roy. *New Humanism*, p 36

৭৭ M. N. Roy. *Radical Humanism*, 1952, p 21

৭৮ M. N. Roy. *New Humanism*. pp. 28-29

৭৯ Ibid . p 26

৮০ Ibid., p 31

৮১ Ibid , p. 33

৮২ *The Radical Humanist*, 5 December 1954

৮৩ M. N. Roy, *Scientific Politics*, p. vii

৮৪ M. N. Roy, *Materialism*, 1951, p 198

৮৫ M. N. Roy, *Reason Romanticism and Revolution*, Vol.II, p.217

৮৬ M. N. Roy, *Materialism*, p. 199

৮৭ M. N. Roy, *Reason, Romanticism and Revolution*, Vol. II, p. 194

৮৮ M. N. Roy, *New Humanism*, pp. 23-26
৮৯ M. N. Roy, *Scientific Politics*, p 83
৯০ M. N. Roy, *New Humanism : A Manifesto*, Calcutta, 1947. pp. 34-47

স্বাধীন ভারত ও নেহেরুর সমাজতান্ত্রিক নীতি

১ Michael Brecher, *Nehru—A Political Biography, 1961*, paper-back edition, p 204
২ Jawaharlal Nehru, *Glimpses of World History*, Vol. II, pp. 851-52
৩ *Important Speeches of Jawaharlal Nehru*, pp. 4-14
৪ Jawaharlal Nehru, *An Autobiography*, 1936, pp. 551-52
৫ Hiren Mukherjee, *The Gentle Colossus . A Study of Jawaharlal Nehru*, Calcutta, 1946, p. 176
৬ *Conversations with Mr. Nehru*, 1956, pp. 31-32
৭ Planning Commission, *The New India : Progress through Democracy*, 1958, p. 4

কমিউনিজম্ ও ভারত

১ *Constituent Assembly Debates*, Official Report, Vol. I, p. 80
২ *Communist Violence in India*, Government of India Publication, 1949, pp. 8-13
৩ Ibid., pp 13-14
৪ Ibid. pp. 3-7
৫ *The Communist*, January 1950, pp. 108-9
৬ A. Dyakov, "The Situation in India", *New Times*, 2 June 1948
৭ P. C. Joshi *Problems of the Mass Movement*. pp. 37-38
৮ P. C. Joshi, *For a Mass policy*, p. 15
৯ *The Communist*, July-August 1950, pp. 1-26
১০ R. P. Dutt, *Situation in India*, pp. 2-6
১১ *Programme of the Communist Party of India*. October 1951 p. 20
১২ *Election Manifesto of the Communist Party of India*, October 1951, p. 29
১৩ Horst Hartmann, *Political Parties in India*, 1971, p. 128
১৪ Lenin, "*Left Wing*" *Communism · An Infantile Disorder*. Moscow, 1950, pp. 81-82
১৫ Hiren Mukherjee, *India and Parliament*, 1962, p. xiv

১৬ Ibid., p 130
১৭ Hiren Mukherjee, *India and Parliament*, 1962, p. xiv
১৮ *Judgment Delivered by R. L. Yorke in the Meerut Conspiracy Case*, Simla, 1932-33, p. 225
১৯ *A Course of Party Education, Second Stage (For Branch Secretaries)*, Communist Party publication, 1968, p. 113
২০ Ibid., p. 114
২১ *Central Committee Draft for Ideological Discussion Adopted by the Central Committee of the Communist Party (Marxist)*, Madurai, August 18-27, 1967, pp 27-29
২২ Ibid., p 29
২৩ *Statement on Moscow Conference Adopted by the Central Committee of the Communist Party of India (Marxist) at its Session at Calcutta July, 15-20, 1969*, Calcutta 1969, p 7
২৪ Ibid., p. 8
২৫ *Programme of the Communist Party of India Adopted by the Seventh Congress of the Communist Party of India, Calcutta, October 31-November 7, 1964*, Calcutta, 1966, p 30
২৬ Ibid., pp 30 31
২৭ *The Statesman*, 16 June 1969
২৮ *The Statesman*, 21 June 1969
২৯ *The Statesman*, 3 September 1969
৩০ *The Statesman*, 15 September 1969
৩১ *CPM Terror in West Bengal*, CPI publication, 1970, pp 32, 42-43
৩২ *The Statesman*, 8 October 1969
৩৩ *The Statesman*, 19 December 1969
৩৪ *Central Committee Resolutions Adopted by the Central Committee of the CPI(M), Madurai, August 18-27, 1967*, Calcutta, p. 22
৩৫ *On the Left Deviation : Resolution of the Central Committee, Communist Party of India (Marxist), Madurai, August 18-27, 1967, and Other Information Documents*, Calcutta, pp 4-5
৩৬ Lenin, *Collected Works*, Vol 31, pp. 255-56
৩৭ "Politics of Nagi Reddy", *Liberation*, October 1969, No. 12, pp. 37-45
৩৮ *The Statesman*, 11 May 1969
৩৯ *The Statesman*, 2 May 1969
৪০ Charu Mazumdar, "Srikakulam,—Will it be the Yenan of India?", *Liberation*, Vol. 2, No 5

৪১ *Liberation*, September 1969, Vol. 2, No. 11, pp. 81-82
৪২ "Soviet Revisionists New Tsars Use 'Aid' to Stretch Their Claws into Asia, Africa, and Latin America", *Liberation*, October 1969, Vol. 2, No, 12, pp. 76-83
৪৩ "Fight against the Concrete Manifestations of Revisionism", *Liberation*, September 1969, Vol. 2. No. 11, p. 8
৪৪ *Liberation*, September 1969, Vol. 2, No. 11, pp. 75, 81-82

ইংরেজী গ্রন্থপঞ্জী

PRIMARY AUTHORITIES

A. BOOKS, PAMPHLETS, SPEECHES AND MISCELLANEOUS WRITINGS

Agarwal, Shriman Narayan, *Gandhian Constitution for Free India*, Allahabad 1946

Ahmed, Muzaffar, *The Communist Party of India and Its Formation Abroad*, Calcutta, 1962

Ali, Rahamat, *The Continent of Dinia or the Country of Doom*, Cambridge

Azad Maulana, *India Wins Freedom*, Delhi, 1959

Banerjea, S. N., *A Nation in Making*, Oxford, 1927

Besant, Annie, *The Future of Indian Politics*, Madras, 1922

Bhave, Vinoba, *Revolutionary Sarvodaya*, Bharatiya Vidya Bhavan, 1964

Bose, Subhas, *The Indian Struggle*, 1920-34, Calcutta, 1948

-*The Indian Struggle*, 1935-42, Calcutta, 1952

-*Important Speeches and Writings of Subhas Bose*, ed. J. S. Bright, 1945

-*Netaji Speaks to the Nation*, ed Durlab Singh, Lahore, 1946

-*Selected Speeches of Subhas Chandra Bose*, Publications Division, Government of India, 1962

-*Through Congress Eyes*, Allahabad, 1938

—*Crossroads* : Being the Works of Subhas Chandra Bose, Netaji Research Bureau, Calcutta

Chatterji, Bankim, *Krishnacharitra*, eds B.N Bandopadhyaya and S. K. Das, Calcutta, 1940

—*Dharmatattva*, eds B N Bandopadhyaya and S K. Das, Calcutta, 1940

Chavan, Y. B., *Direct Action and Parliamentary Democracy*, Mavlankar Memorial Lecture, 1961

Das, C. R., *India for Indians*, 3rd ed , 1921

—*Speeches of C. R . Das*, Calcutta, 1918

Dange, S. A., *On the Indian Trade Union Movement*, Bombay, 1952

—*Gandhi Versus Lenin*, Bombay, 1921

Dayal, Har, *Writings of Har Dayal*

Deva, Acharya Narendra, *Socialism and the National Revolution*, Bombay, 1946

Durrani, F K. Khan, *The Meaning of Pakistan*, 1944

Dutt, Romesh, *India in the Victorian Age*, London, 1940

Dutt, R. P., *Modern India*, London, 1927

--*India Today*, London, 1940

---*India Today and Tomorrow*, Delhi, 1955

Dyakov, A M, *A New Stage in India's Liberation Struggle*. 1947

-- *Crisis in the Colonial System*, Bombay, 1951

Gandhi, M. K, *Hind Swaraj*, Madras, 1921

An Autobiography, Ahmedabad, 1959

- *Selected Writings*, London, 1951

Mahatma Gandhi · His Life, Writings and Speeches, Madras, 1918

--*Socialism of My Conception*, Bharatiya Vidya Bhavan, 1957

The Essential Gandhi An Anthology, ed Louis Fischer, London, 1963

-*To the Students*, Ahmedabad, 1958

Selected Writings, London, 1951

Ghose, Aurobindo, *Bankim-Tilak-Dayananda*, Calcutta, 1940

---*The Doctrine of Passive Resistance*, Calcutta, 1948

Two Lectures, Bombay, 1908

-*Uttarpara Speech*, Calcutta, 1943

---*The Ideal of Karmayogin*, Calcutta, 1937

The Present Situation, Madras, 1909

Ghose, Ajoy, *On the Work of the Third Congress of the Communist Party Of India*, Delhi

Articles and Speeches, Moscow, 1962

Gokhale, G. K. "The School of Coordination", *The Indian World*

-- *Speeches and Writings*, 2nd ed, Madras, 1918

Gopalan, A. K & Hiren Mukherjee, *Communists in Parliament*, New Delhi, 1957

Iqbal, Muhammad, *Speeches and Statements* of, Lahore, 1944

Jinnah, M., Speeches and Writings of, ed. Jamil-ud-din

Joshi, P. C., *Indian Communist Party : Its Policy and Work in the War of Liberation*, Introduction by Harry Pollitt, Communist Party of Great Britain, 1942

Khan, Syed Ahmed, *The Present State of Indian Politics*. Allahabad, 1888
Lenin, V. I., *Selected Works*, 12 Vols.
- *Complete Works*, 18 Vols.
Lohia, Ram Manohar, *Marx, Gandhi and Socialism*, Hyderabad, 1963
Macaulay, *Speeches with His Minute on Indian Education*. Selected by G. M Young, London, 1935
Masani, M R, *Socialism Reconsidered*, Bombay, 1944
—*Congress Misrule and the Swatantra Alternative*, Bombay, 1966
Marx, Karl, *Articles on India*, Bombay, 1943
--*Selected Works*, 2 Vols, Moscow, 1955
Mehta, Ashoka, *Democratic Socialism*, Bharatiya Vidya Bhavan, 1959
Minto, Lady, *India Minto and Morley*. London, 1935
Morley, John, *Recollections*, London, 1917
Mukherjee, Hiren, *India and Parliament*, New Delhi, 1962
Namboodiripad, E M S, *The Mahatma and the Ism*, New Delhi, 1959
Naoroji, Dadabhai, *Poverty and Un-British Rule in India*, London, 1901
-*Speeches and Writings*, Madras, 1910
Narayan, Jayaprakash, *Why Socialism*, Benares, 1936
- *Towards Struggle*, Bombay, 1946
-- *From Socialism to Sarvodaya*, 1959
- *Socialism, Sarvodaya and Democracy*, ed Bimla Prasad, 1964
Nehru, Jawaharlal, *Autobiography*, 1936
---*A Bunch of Old Letters*, 2nd ed, 1960
-*Conversations with Nehru*, ed Tiber Mende, 1956
--*Eighteen Months in India*, Allahabad, 1938
-*India and the World*, London, 1936
—*Jawaharalal Nehru's Speeches*, 1935-57, Publications Division, Government of India, New Delhi, 1958
—*Nehru on Socialism* : Selected Speeches and Writings, Delhi, 1964
---*Quintessence of Nehru*, Selected and with an introduction by K. T. Narasimha Char, London, 1961
—*Recent Essays and Writings*, Allahabad, 1937

—Nehru Jawaharlal, *Selected Writings* (1915-50), ed. J. S. Bright, New Delhi
—*Soviet Russia*, Bombay, 1928
—*The Unity of India*, 1944
—*The Discovery of India*, 2nd ed., London, 1947
—"The Solidarity of Islam", *Modern Review*, November, 1935.
—*Whither India*, Allahabad, 2nd ed., 1933
Pal, B. C., *Nationality and British Empire*, Calcutta, 1916
—*Memories of My Life and Times*, Calcutta, 1932
—*The World Situation and Ourselves*, Calcutta, 1919
—*The New Spirit*, Calcutta, 1907
The Spirit of Indian Nationalism, London, 1910
—*The New Policy*, Madras, 1918
—*Swadeshi and Swaraj* : The Rise of New Patriotism, Calcutta, 1954
Radhakrishnan, S., *The Hindu View of Life*, 1928
Raj, Lajpat, *The Political Future of India*, New York, 1919
—*Reflections on the Political Situation in India*, Lahore, 1915
—*India's Will to Freedom*, Madras, 1921
—*Autobiographical Writings*, ed V S. Joshi
—*The Arya Samaj*, London, 1915
Ranadive, B. T., *The Two Programmes—Marxist and Revisionist*, Calcutta, December, 1966
—*On People's Democracy*
Roy, M. N. *India in Transition*, Geneva, 1922
—*Memoirs*, 1964
—*Nationalism and Democracy*, 1942
—*Politics, Power and Parties*, Calcutta, 1960
—*Fragments of a Prisoner's Diary*, Calcutta, 2nd ed , 1957
—*Radical Humanism*, 1952
—*Reason, Romanticism and Revolution*, Calcutta, 1952
—*One Year of Non-Cooperation*, Calcutta, 1923
—*The Future of Indian Politics*, London, 1926
—*The Aftermath of Non-cooperation*, London, 1926
—*New Humanism : A Menifesto*, Calcutta, 1947
—*War and Revolution*, 1942
Roy, Raja Ram Mohan, *English Works*, ed , J. C. Ghose, 2 vols., Calcutta, 1885
Sardesai, S. G., *India and the Russian Revolution*, Communist

Party Publication, New Delhi, 1967
Savarkar, V. D., *Hindutva*. 4th ed , Poona, 1949
—*The Indian War of Independence of 1857*
Spratt, Philip, *Blowing Up India*, Calcutta, 1955
Tagore, Rabindranath, *Swadeshi Samaj. Samuha*, Calcutta. B S. 1335
—*Letters from Russia*, Calcutta, 1960
—*Nationalism*, London, 1917
—"The Call to Truth", *The Modern Review*
Tilak, Bal Gangadhar, *Writings and Speeches* (with an appreciation by Aurobindo Ghose), Madras, 1919
Tse-Tung, Mao, *New Democracy and Other Articles*, National Book Agency, Calcutta, 1966
—*Selected Writings*, National Book Agency, Calcutta, 1967
Vivekananda, Swami, *From Colombo to Almora* : Lectures, Madras, 1904
—*Speeches and Writings*, 5th ed., Madras
—*The Complete Works of Swami Vivekananda*, Almora
—*India and Her Problems*, 4th ed , Almora
Epistles of Swami Vivekananda, 2nd Series, Mayavati, 1920

B PARTY REPORTS STATEMENTS, RESOLUTIONS AND OTHER DOCUMENTS

Indian Constitutional Documents (1858-1945), ed A C Banerjee, 2 vols , Calcutta 1946
Indian Speeches and Documents on British Rule (1821-1918), ed , J. K Mazumdar, Calcutta, 1937
Speeches and Documents on Indian Policy, ed , A. B. Keith 2 vols , London, 1922
Speeches and Documents on the Indian Constitution, 1921 1947, eds, Sir Maurice Gwyer and A. Appadorai, 2 vols., London, 1957
Indian National Congress, Annual Reports
Congress Presidential Address, First Series, Madras, 1915
Congress Presidential Address, Second Series, Madras, 1934
Congress Presidential Speeches, ed. Sankar Ghose, Calcutta. 1972
Parliamentary Debates on Indian Affairs
Constituent Assembly Debates

Report of the Sedition Committee
White Paper on Communist Violence in India, 1949
Election Manifestoes of the Indian National Congress, the CPI, the Hindu Mahasabha, the Jana Sangh, the Swatantra Party and the CPI(M)
Communist Statement of Policy : For the Struggle for Full Independence and people's Democracy, Resolution passed by the Central Executive Committee of the Communist Party of India held in Bombay on December 7-16, 1947, Bombay, 1947.
Resolutions Passed at the Sixth Annual Conference of the Socialist Party held at Nasik, March, 1949, Bombay, 1948
Statement of Policy adopted by the All India Conference of the Communist Party of India. October, 1951, Calcutta
Political Resolution adopted at the Fourth Congress of the Communist Party of India held in Palghat from April 19 to 29, 1956, New Delhi, 1958
Constitution of the Communist Party of India adopted at the Extraordinary Party Congress, Amritsar, April 1958, New Delhi, 1958
Resolutions of the Communist Party of India adopted at the Extraordinary Party Congress, held in Amritsar in 1958, Communist Party of India, New Delhi, 1958
Resolutions of the Meeting of the Communist and Workers' Parties of Socialist Countries (1957) and Statement of the Conference of the 81 Communist and Workers' Parties (1960), National Book Agency, Calcutta, 1960
Fight Against Revisionism . Political Organizational Report adopted at the Seventh Congress of the Communist Party of India (Marxist), 31 October to 7 October 1964, Calcutta, December, 1965
Resolutions adopted at the Seventh Congress, 31 October to 7 November 1964, Communist, Party Publication
Programme of the Communist Party of India adopted by the Seventh Congress of the Communist Party of India, Calcutta, 31 October to 7 November, 1964
On the Left Deviation, Resolution of the Central Committee, Communist Party of India (Marxist), Madurai, 18 to 27 Auqust, 1967 and Other Information Documents, Calcutta

A Course of Party Education, Second Stage (For Branch Secretaries), Communist Party Publication, 1968
Documents adopted by the Eighth Congress of the Communist Party of India, 1968, Communist Party Publication
Central Committee Statement on Moscow Conference Adopted by the Central Committee of the Communist Party of India (Marxist) at its session in Calcutta 15 to 20 July, 1969, Calcutta, 1969

C PERIODICALS AND JOURNALS

Communist International
Harijan
Indian Quarterly Register
Labour Monthly
Liberation
New Age
People's War
People's Age
Radical Humanist
Socialist India
The Masses of India
The Bengalee
The Modern Review
Young India

SECONDARY AUTHORITIES

Andrews, C. F., *The Rise and Growth of the Congress in India*, 1938
Ambedkar, B. R., *Pakistan*
Austin, Granville, *The Indian Constitution* : Cornerstone of a Nation, London, 1966
Balabushevich, V. V. & Prasad, Bimla, *India and the Soviet Union* : A Symposium, New Delhi, 1969
Bary, Wm. Theodore De & Others (ed.), *Sources of Indian Tradition*, New York, 1958
Bondurant, Joan, *Conquest of Violence*, 1958
Bose, Nirmal, *Studies in Gandhism*, Calcutta, 1947
Brecher, Michael, *Nehru : A Political Biography*, London, 1961

Buchanan, D. H., *The Development of Capitalist Enterprise in India*, 1934
Chand, Tara, *History of the Freedom Movement in India*, Publications Division, Government of India, 1961
Chirol, Valentine, *Indian Unrest*, London, 1910
Desai, A. R., *Social Background of Indian Nationalism*, Bombay, 4th ed., 1966
Fic, Victor M., *Peaceful Transition to Communism in India. Strategy of the Communist Party*, Bombay, 1969
Ghose, Sankar, *The Renaissance to Militant Nationalism in India*, Calcutta, 1969
— *Socialism and Communism in India*, Calcutta, 1971
-- *Socialism, Democracy And Nationalism In India*, Calcutta, 1973
Goyal, O. P., *Contemporary Indian Political Thought*, Allahabad, 1965
Griffiths, Sir Percival, *Modern India*, 4th ed , London, 1965
Hangen, Welles, *After Nehru, Who ?* London. 1965
Kaushik, P D, *The Congress Ideology and Programmes 1920-47*, Bombay, 1964
Mazumdar, B , *History of Political Thought from Rammohun to Dayananda*, 1934
Majumdar, R C , *History of the Freedom Movement in India*, 3 vols , Calcutta, 1963
Majumdar, R. C. (ed), *The History and Culture of the Indian People Struggle for Freedom*, Bombay, 1969
Montagu, Edwin *An Indian Diary*, London, 1930
Morris-Jones, W. H., *Parliament in India*, London, 1957
-- *The Government and Politics of India*, London, 2nd ed., 1967
Mosley, Leonard, *The Last Days of British Raj*
Mukherjee, Hiren, *Gandhi · A Study*, 2nd ed , 1960
-- *The Gentle Colossus : A Study of Jawaharlal Nehru*, Calcutta, 1964
Overstreet, Gene D. & Windmiller, Marshall, *Communism in India*, Bombay, 1960
Panikkar, K. M., *Asia and Western Dominance* London, 1965
Pattabhirami, M. (ed.), *General Election in India*, 1967
Prabhu, R. K. (ed.), *Tagore : Gandhi Controversy*.
Ram, Mohan, *Indian Communism : Split within a Split*, New Delhi, 1969

Ronaldshay, Lord, *The Heart of Aryavarta*, 1925
Riencourt, Amaury, De, *The Soul of India*, London, 1961
Roy, D. K , *The Subhas I Knew*
Schuster, G , and Wint, G , *India and Democracy*, London, 1941
Seeley, Sir John, *The Expansion of England*, 1883
Sharma, D S. , *Studies in the Renaissance of Hinduism in the 19th and 20th Centuries*, 1944
Shelvankar, K. S , *The Problem of India*, 1943
Spratt, Philip, *Communism in India*, New Delhi, 1952
Sridharani, K., *My India, My West*, London, 1942
Tahmankar, D V., *Lokmanya Tilak*, London, 1956
Tendulkar, D. G , *The Mahatma . The Life of Mohandas Karamchand*
Thompson, E. J , and Garratt, G T., *Rise and Fulfilment of British Rule in India*, London 1934
Toye, Hugh, *The Springing Tiger*, London, 1959
Varma, V. P , *Modern Indian Political Thought*, 3rd ed , Agra, 1967

বাঙলা গ্রন্থপঞ্জী

অসিতকুমার ভট্টাচার্য —বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা, ১৯৬৪

এস. পাকড়াশী —অগ্নিদিনের কথা, কলিকাতা, ১৯৪৭

কাজী আবদুল ওদুদ্ —বাংলার জাগরণ, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ

গৌতম চট্টোপাধ্যায় —রুশ বিপ্লব ও বাংলার মুক্তি আন্দোলন, ১৯৬৭

নরহরি কবিরাজ —স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা, ১৯৬১

প্রমথ চৌধুরী —বীরবলের হালখাতা, কলিকাতা, ১৯১৭

বসুধা চক্রবর্তী —মানবতাবাদ, ১৯৬১

বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় —বঙ্কিম গ্রন্থাবলী—১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯১৫

—আনন্দমঠ, কলিকাতা, ১ম সংস্করণ

—বঙ্গদর্শন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (২য় খণ্ড, পুনর্মুদ্রিত—১৩৪৬ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা)

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ —আত্মকাহিনী, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ

বিনয় ঘোষ —বিদ্রোহী ডিরোজীও : নব্য বঙ্গের দীক্ষাগুরু ডিরোজীওর জীবনচরিত : ১৮০৯-১৮৩১, ১৯৬১

বিপিন পাল —নব যুগের বাংলা, কলিকাতা, ১৯৫৪

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় —সমাজ, কলিকাতা, ১৯৫৪

ভূদেব মুখোপাধ্যায় —সামাজিক প্রবন্ধ, চুঁচুড়া, ১৯১৬

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত —অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস, ১৯৫৩

যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় —বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ

যোগেশ চন্দ্র বাগল —মুক্তির সন্ধানে ভারত, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর —গোরা

—ঘরে বাইরে

—সমূহ, কলিকাতা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ

—স্বদেশ, কলিকাতা, ১৩১২ বঙ্গাব্দ

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় --নানা প্রবন্ধ, কলিকাতা, ১৯৩৭
রাজনারায়ণ বসু --সে-কাল ও এ-কাল, কলিকাতা, ১৯০৯
শিবনাথ শাস্ত্রী --আত্মচরিত, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ
সৌরীন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় --বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচিন্তা, ১৯৬৮
স্বদেশরঞ্জন দাশ --মানবেন্দ্রনাথ ঃ জীবন দর্শন, ১৯৬৫
স্বামী বিবেকানন্দ --প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, কলিকাতা, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ
--ভাববার কথা, কলিকাতা, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ
হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় --উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, ১৯৬১
হেমচন্দ্র কাননগো --বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, কলিকাতা, ১৯২৮

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত---শ্রীম সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ

ভারতে বিবেকানন্দ, কলিকাতা, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ

শব্দসূচী

সংকলক: বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়